প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

মানচিত্র : রথীন্দ্র সরকার

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

পত্রপুট

প্রকাশিকা / আরতি চক্রবর্তী, পত্রপুট, ৩৭/৯ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭ ০০০৯

মুদ্রক / প্রিন্টিং সেণ্টার, ১৮/বি ভুবন ধর লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২

ভূমিকা

জ্যাক লণ্ডন এমন এক ক্ষণজন্মা লেখক, অ্যাডভেঞ্চার যাঁর রক্তে রক্তে। "ঘোড়সওয়ার নাবিক" আখ্যা দিয়েছিলেন প্রখ্যাত জীবনীসাহিত্যকার আরভিং স্টোন। রবার্ট লুই স্টিভেনসনের মতোই অভিযানের নেশা জ্যাক লণ্ডনের, গিয়েছেন তাঁরই যাত্রাপথ ধরে।

সত্যি সত্যিই তিরাশি বছর আগে, জ্যাক লণ্ডন তাঁর স্ত্রী চার্মিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে স্বোপার্জিত অর্থে একটা তেতাল্লিশ ফুট লম্বা পাল জাহাজে সত্তর অশ্বশক্তির ইঞ্জিন চাপিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন দীর্ঘ প্রশান্ত মহাসাগর পরিক্রমায়। সান ফ্রান্সিসকো থেকে হাওয়াই, মার্কোয়েসাস্ হয়ে দক্ষিণ মহাসাগর ঘুরে পৌঁছুলেন সলোমন দ্বীপপুঞ্জে—পথের নানা বিচিত্র ঘটনা, দেশ আর মানুষ নিয়ে লিখে চললেন বহু কাহিনী; সাংবাদিক সাহিত্য তো অতুলনীয় বটেই; যা উপন্যাসের চেয়েও চমকপ্রদ। 'স্নার্কে'র বর্ণাঢ্য বিপদসঙ্কুল ভ্রমণ-কাহিনী-সমন্বয় যেমন তাঁর স্বকীয় ঢঙে ঘরোয়া মনমাতানো ভঙ্গিতে লেখা, তেমনি বেপরোয়া সাংবাদিকতার নমুনা স্বরূপ।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, আনাড়ি জাহাজ চালনায় পথবিভ্রান্তি, ঝঞ্ঝাবাত্যা, শত্রুতাচরণ, প্রচণ্ড ব্যাধি ইত্যাদির মধ্যেও এই 'স্নার্ক' জলযানটিতে বসেই তিনি লিখেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মার্টিন ইডেন', 'বিফোর স্যাডাম', প্রকাশ করেছেন 'আয়রন হীল'। জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন 'কল অব দি ওয়াইল্ডে'র লেখক হিসেবে। তাই পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার খরচ করে বসেছেন 'স্নার্ক' তৈরি করতে; অথচ তাহিতিতে এসে দেখলেন তাঁর সম্বল মাত্র ৬৬ ডলার। অতএব আবার তুমুল বিক্রমে লেখা, আবার উপার্জন, আবার প্রতিষ্ঠা। এমনই এক আশ্চর্য লেখক জ্যাক লণ্ডন।

ব্যাপারটার শুরু গ্রেন এলেনের সুইমিঙ পুলে।

সাঁতারের ফাঁকে এক সময় বালিতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছিলাম রস্কো আর আমি। আমার বন্ধু রস্কোকে বলা হয় 'ইয়টম্যান'। সমুদ্র ভ্রমণের কিছু অভিজ্ঞতা আমারও আছে। তাই অনিবার্যভাবে দু'জনের কথাবার্তা নৌকো, জাহাজ ইত্যাদির দিকেই মোড় নেয়। উঠল ছোট জাহাজ এবং তাদের সমুদ্রে চলার যোগ্যতা নিয়ে কথা। 'স্প্রে' নামে ক্ষুদে জাহাজটার কথা আমরা জানতাম। ক্যাপ্টেন স্লোকাম এই ক্ষুদে 'স্প্রে'-তে চেপে তিন বছরে পৃথিবী চক্কর দিয়েছিলেন।

কথায় কথায় বলি, চল্লিশ ফুট লম্বা একটা জাহাজে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে আমাদেরও ভয় লাগে না। এমন এক জাহাজে সমুদ্র ভ্রমণের পরিকল্পনা—এর থেকে কাম্য আর কী থাকতে পারে? শেষ পর্যন্ত আমরা স্থির করে ফেলি এমন একটা সুযোগ আমাদের কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না। অতএব, মজার ছলেই এসে গেল কথাটা—তাহলে কাজটা করাই যাক! স্ত্রী চার্মিয়ানকে আড়ালে এ বিষয়ে বলতেই এক কথায় রাজি হয়ে গেল সে। পরদিন সকালে সাঁতার পুলের ধারে বসে কথাটা তুলতেই গভীর আগ্রহে রস্কো জানতে চাইল—'কবে ভেসে পড়তে চাও?'

সামান্য একটু মুশকিল ছিল। আমার র‍্যাঞ্চে একটা বাড়ি বানাবো বলে ভেবে রেখেছিলাম। বাড়ির সঙ্গে একটা ফলের বাগান থাকবে। বাগানে থাকবে আঙুরকুঞ্জ, বেশ কিছু বেড়াগাছ পুঁততে হবে, এ ছাড়াও নানান কাজ। প্রথমে ভাবা হল চার-পাঁচ বছর বাদেই না হয় যাত্রা শুরু করা যাবে, কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের লোভটা তো রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই মাথায়। এখুনি যাত্রা শুরু নয় কেন? কারুর যৌবনই কোনোদিন ফিরে আসবে না। যতোদিনে আমরা বাইরে ঘুরে আসব ততোদিনে বাগান, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, বেড়াগাছ গজিয়ে উঠুক। ফিরে এসে দেখব তারা তৈরি, আর আমরাও তখন বাড়িটা বানিয়ে ফেলব।

আমরা যে সমুদ্রে ভেসে পড়বই—এমন কথা পাকা হতেই 'স্নার্ক' বানাবার কাজ শুরু হল। আমাদের ক্ষুদে জাহাজটির নাম দেওয়া হয়েছে 'স্নার্ক'*। বলে রাখি—এই

---

* এই নামে একটা বিদ্‌ঘুটে জানোয়ারের কথা কল্পনা করেছিলেন প্রখ্যাত লেখক লিউইস্ ক্যারল (১৮৭৬ সালে)।

নামকরণের পিছনে কোন অলৌকিক কারণ নেই। নেহাতই অন্য নাম খুঁজে না পেয়ে এই নাম দিয়েছি।

আমার বন্ধুরা আমাদের দারুণ পরিকল্পনাটাকে নস্যাৎ করে দিতে চায়। তাদের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না—এমন একটা বিপদসঙ্কুল অভিযানের প্রয়োজনটা কী? তারা আতঙ্কিত হলেও আমরা তাদের হাজার চেষ্টা করে বোঝাতে পারি না যে এইটেই আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য। আমাদের পক্ষে ডাঙার চেয়ে একটা ছোট তরী নিয়ে জলে নামাই অনায়াসের কাজ, যেমন ওদের কাছে জলের চেয়ে ডাঙা সহজ। আসলে ওদের এসব মনোভাব অতিরিক্ত অহংবোধের থেকে—নিজেদের বদ্ধ ধারণার বাইরে একটুও বেরুতে চায় না। নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠিটাকেই ওরা সেরা জিনিস বলে ধরে নিয়েছে, অন্যেরও যে তা থাকতে পারে সে বোধটুকু নেই।

আমি ওদের অনেকভাবে বোঝালাম—কিন্তু ওরা আমাদের কথায় কান দিতে প্রস্তুত নয়। আমাকে পাগল বলে সন্দেহ করল বন্ধুরা। প্রতিবাদে আমি তাদের জন্য সমবেদনাই বোধ করি। মতের অমিল হলে একজন আরেকজনকে পাগলই ভাবে। আসলে, আমার ইচ্ছাটাই বড় কথা। এই 'ইচ্ছা'র জন্য পৃথিবীতে কত না কাণ্ড হয়। দর্শনের অন্তরালেও এই, জীবনের অন্তরতম বাণীও এই। এই 'আমার ইচ্ছা'র তাগিদেই কেউ খ্যাতি, কেউ অর্থ, কেউ ভালোবাসা, কেউ ঈশ্বরের সন্ধান করে। কিন্তু আমার নিজের কথাই বলি, কেন বিশ্ব পর্যটনে বেরুতে চাই? আমি নিজে কিছু করে দেখতে চাই—এতেই আমার আনন্দ, পৃথিবীর কাছে হাততালি পাবার জন্য নয়। একটা মহান উপন্যাস লেখার চেয়েও সমুদ্রে ভেসে পড়বার ইচ্ছেটাই এখন আমার প্রবল।

সতের বছর বয়সে একটা তিন-পালতোলা স্কুনারের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পরম গৌরব হয়ে রয়েছে। জাপান থেকে যাত্রা-করা স্কুনারের অন্যতম যাত্রী ছিলাম আমি। পড়েছিলাম প্রবল টাইফুনের খপ্পরে। সকাল সাতটায় আমাকে ঘুম থেকে তুলে জাহাজের মাল্লারা প্রাতরাশ করতে চলে গেল। আমাকে হুইলে বসিয়ে দিয়ে স্কুনারের ক্যাপ্টেন প্রথমে ভেবেছিলেন অল্পবয়স্ক বলে আমি হয়ত ঘাবড়েটাবড়ে যাব। সত্যি বলতে কি, স্কুনারের তিন-তিনটে পালের একটাও আস্ত ছিল না। সবগুলো মাস্তুলই ফাঁকা, তার ওপর স্কুনার প্রায় বেসামাল হয়ে দু'দিকের প্রকাণ্ড উঁচু ঢেউয়ের মাঝখানে পড়ে খাবি খাচ্ছে। তবু আমায় হাল ধরে বসে থাকতে দেখে ক্যাপ্টেন চলে গেলেন প্রাতরাশ সারতে। এবার বাইশজন মানুষের প্রাণ হাতে নিয়ে লড়ে যাচ্ছি চল্লিশ মিনিট ধরে—আমি একা। কিছুতেই বশে থাকছিল না স্কুনারটা। বিশাল বিশাল ঢেউ ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন গড়ান দিচ্ছিল যে যখন-তখন কাত হয়ে যাবার অবস্থা।

একবার কাত হয়ে ভেঙে পড়লে বাইশটি প্রাণীর একটিকেও আর বাঁচতে হত না। দমকা প্রবল হাওয়ার মধ্যে, দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সেদিন আমি স্কুনারটাকে সামলে নিয়েছিলাম শেষ অবধি। এক ঘণ্টা পর ঘর্মাক্ত কলেবর ও নিঃশেষিত অবস্থায় আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন। হ্যাঁ, আমি সফল হয়েছিলাম। কাঠ ও লোহার তৈরি একশো টনের জাহাজটাকে কয়েক লক্ষ টন বাতাস আর জলের বিরুদ্ধে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এবং আবারও বলছি—চল্লিশ মিনিটের জন্য হলেও একাই কাজটি সম্পন্ন করেছিলাম সেদিন। সেইটিই ছিল আমার আনন্দ। বাইশজন মানুষ আমার এ কাজের খবর পেয়েছিল কিনা সেটা কোনো কথা নয়। তারা পরে বেঁচেবর্তেই হয়তো ছিল না। কিন্তু সেই যে আমার গর্ব তা তো একচুলও কমেনি। তবে একথা বলতে বাধা নেই যে বুঝমান অল্প কিছু শ্রোতা থাকলে আমার আপত্তি নেই। মাত্র কয়েকজন যারা আমায় ভালোবাসে, যাদের আমিও ভালোবাসি, তাদের ব্যক্তিগত কীর্তি দেখিয়ে কৃতজ্ঞতার সুখ পাই। কিন্তু নিছক কৃতিত্বের আনন্দটাই আমার কাছে আসল জিনিস। এ আমার একান্ত আপনার, কিছু সাক্ষীর ওপর তা নির্ভর করে না।

আমার নিজস্ব কীর্তির ফলে আমার দেহের প্রতিটি তন্তুতে যে উত্তেজনার আগুন জ্বলে, যে সফলতার জন্য আমি ব্যাকুল হই, সে সফলতা কী? প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারার তুষ্টিই সেই সফলতা, জীবনের সফলতা, বিশেষ করে পরিবেশ যদি কঠোর রূপ নিয়ে আসে। যতো কঠোর, সফলতার আনন্দও ততো বেশি। বিপদের প্রত্যেক ফলাফল যাচাই করতে চায় এ ধরনের মানুষ। যারা সেটা চায় না তারা ঘরেই বসে থাকুক না। তারা এ কাজের জন্য নয়। তাদের জন্য শান্ত পরিবেশ, নিরাপত্তা। আমি তাদের কেউ নই। আমি, জ্যাক লণ্ডন নামধারী মনুষ্যরূপী ক্ষুদে এক জন্তু। আমার রক্ত, মাংস, হৃৎপিণ্ড, হাড়, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে একশো ষাট পাউণ্ড ওজন। ভঙ্গুর নশ্বর একতাল জেলি—প্রাণের সামান্য পরশে অভিষিক্ত। সামান্য কয়েক ডিগ্রির তাপ, সামান্য উচ্চতা, সামান্য পরিবেশের পরিবর্তন আমার অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে পারে। আমার চারপাশে ছড়িয়ে আছে দানবীয় প্রাকৃতিক শক্তি। সাইক্লোন, টর্নেডো, বজ্রপাত, সামুদ্রিক বানের বিক্ষুব্ধ ঢেউ, জলস্তম্ভ কিংবা জলের ঘূর্ণি, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত—সবকিছু থাকা সত্ত্বেও এই অনুভূতিহীন দানবেরা জানে না আমি জ্যাক লণ্ডন—মৃত্যুকে পরোয়া করি না, জীবনের সামান্য স্পন্দনটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই গৌরবের ছায়ায়। বিপদকে রাখি পায়ের তলায়। আমি 'ঈশ্বর' হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না, সামান্য জেলি-জীবনের সার্থকতাই আমায় ঐশ্বরিক অনুভূতি দেয়। এটাই বড় কথা। হ্যাঁ, এই আমার অহংকার।

স্নার্ক নিয়ে ভেসে পড়বার আর একটা উদ্দেশ্যও আছে আমার। জীবিত থাকতে থাকতে আমি দেখে যেতে চাই এই পৃথিবী একটা শহর বা একটা উপত্যকার থেকেও অনেক, অনেক বড়। এই সমুদ্রযাত্রার একটা ছক কেটেছি আমি। এটা নিশ্চিত যে, আমাদের যাত্রাপথে প্রথম নোঙর ফেলা হবে হনলুলুতে। হাওয়াই দ্বীপের এই বন্দরের পর কোথায় থামব এখনও ঠিক করিনি। পরে ভাবা যাবে। সাধারণভাবে আমরা ভ্রমণ করব দক্ষিণ সমুদ্রে, সামোয়াতে, নিউজীল্যাণ্ডে, টাসমানিয়াতে, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউগিনি, বোর্নিও, সুমাত্রায়। তারপর ফিলিপাইন হয়ে জাপানে। সেখান থেকে কোরিয়া, চীন, ভারত হয়ে পড়ব লোহিত সাগরে ও ভূমধ্যসাগরে। তারপরের পরিকল্পনা অস্পষ্ট। তবে একথা নিশ্চিত যে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে মাসের পর মাস আমরা ঘুরে বেড়াব।

শুরু হল আমাদের জলযান 'স্নার্ক' তৈরির কাজ।

একটা পেট্রোল-চালিত ইঞ্জিন বসাবার ব্যবস্থা হল জাহাজে। কিন্তু ইঞ্জিনের ব্যবহার হবে শুধু আপৎকালীন অবস্থায়। যেমন অল্প-জল বা খাড়ির ভেতর, যেখানে খারাপ আবহাওয়ায় হঠাৎ চড়া স্রোতের টানে স্থির জলের মধ্যে এসে পড়লে জলযান অসহায় হয়ে পড়তে পারে। 'কেচ' জলযানে যে ধরনের রিগ্ ব্যবহার হয়, সেই ধরনের রিগ্ বসাব স্নার্কে। অবশ্য 'কেচ' আমি চোখেই দেখিনি। শুনেছি ওটার রিগ্ ব্যবস্থা খুব ভাল (দু'মাস্তুলওয়ালা স্কুনার আর জেলে-নৌকো 'ইয়ল্'-এর মাঝামাঝি এক জাহাজ)। কেচ-এর পাল খাটানো আর ছুটে চলার ব্যবস্থাও নাকি ভাল। অতএব আমার এই সিদ্ধান্ত (যা একান্তই আমার নিজস্ব) দিয়ে প্রমাণিত হবে সব কিছুই। আমাকে একবার জলে ভেসে পড়তে দিন। ফিরে এসে বলব, কেচ-এর মত জলযানের কী কী গুণ।

প্রথম ঠিক হয়েছিল—জলযানের জলরেখা বরাবর স্নার্কের লম্বাই হবে চল্লিশ ফুট। কিন্তু এই মাপে স্নার্কে বাথরুম করা যাচ্ছে না। তাই লম্বায় বাড়ানো হল পঁয়তাল্লিশ ফুট। সব থেকে বড় কড়িকাঠ (বীম) করা হল পনের ফুটের। ডেক-এ কোনো ঘর করা হবে না। ফলে সমুদ্রের বড় বড় ঢেউগুলো ডেকের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে চলে যেতে পারবে। ডেকের ঠিক নিচেই বড়সড় কক্‌পিট করা হল। তার চার পাশে উঁচু শক্ত লোহার বেড়া। ফলে ঝোড়ো আবহাওয়ার দিনে আর রাতেও নিশ্চিন্ত আরামেই কাটানো যাবে।

বলে রাখা ভাল—জলযানে কোন নাবিক থাকছে না। চার্মিয়ান, রস্‌কো আর

আমিই হব নাবিক। নিজেরাই জলযান পরিচালনা করে চক্কর দেব পৃথিবীটাকে। তাতে আমরা ডুবি বা ভেসে থাকি—যা হবার আমাদের নিজের হাতেই হবে। তবে একজন রাঁধুনি ও একজন কেবিন-বয় অবশ্যই থাকবে। ওসব কাজ আমরা করব নাকি? সময়ই বা পাব কোথায়? তাছাড়া, এ সব করতে গেলে ডাঙায় থাকলেই হয়। তারপর আছে আমার লেখা। এই লেখা লিখেই আমাদের খাওয়া জুটবে, নিয়মিত নতুন পাল, রশারশি কিনে স্নার্ককে ভালভাবে চালু রাখার জন্য রোজগার করতে হবে আমাকে। শুধু তাই নয়, আমার র‍্যাঞ্চ, বাড়ি, বাগান—সব কিছুর জন্যই লিখতে হবে আমাকে।

বাথরুমের জন্য জলযানের আকার বড় করতে গিয়ে দেখা গেল—অনেকটা জায়গা ফালতু হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে ইঞ্জিনের সাইজটাও বড় করতে হল। সত্তর অশ্বশক্তির এই ইঞ্জিনটা যখন নয়-নট সামুদ্রিক গতিবেগে চলে স্নার্কের সব বাধাবিপত্তি দূর করবে, তখনকার কথা ভেবে আমরা পুলকিত হলাম। এমন কোনো স্রোতবহুল নদীর নাম আমাদের জানা নেই যেখানে আমরা বাধা পেতে পারি। আশা রাখি, অনেক অন্তর্দেশীয় জলপথে এবার আমরা প্রবেশ করব। স্নার্কের ক্ষুদ্র আয়তনই তা সম্ভব করতে পারবে। যদি অবশ্য স্থানীয় সরকার অনুমতি দেয়। ইঞ্জিনের বহুল ব্যবহার হবে তখন, মাস্তুলের দরকার হবে না। চীনের ইয়াংসী নদীর খালগুলোতে ঢুকে মাসের পর মাস কাটাতে পারব। তারপর ঢুকতে পারব নীল নদের অভ্যন্তরে, দানিয়ুব নদী ধরে ভিয়েনায়, টেমস্ নদী ধরে লণ্ডন, সীন নদী বয়ে একেবারে প্যারিসের নোতর-দাঁর সামনে! তারপর আরও কত, কত নদী-ঘেরা শহর, দেশ, রাজ্য। ইউরোপে ফ্রান্সের ভেতর দিয়ে পৌঁছোব উত্তরে, আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে উঠব উত্তর-আমেরিকার হাডসন নদীমুখে, সেখান থেকে নদী খাল ধরে ধরে মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা। তারপর ভূগোলের পুরো জ্ঞান নিয়ে ফিরে আসব সানফ্রান্সিস্কো!

ইঞ্জিনটা চালু রাখতে, অর্থাৎ ইগ্নিশন দেবার জন্য, ব্যাটারীর দরকার। ব্যাটারীর শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে গেলে একটা শক্তিশালী ডায়নামো চাই। আর ডায়নামোই যদি হল, তবে জাহাজে আলো জ্বালাতেই বা বাধা কোথায়? এসব নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মনে হয়, যাঁরা বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন, তাঁরা স্নার্কের মতো একটা জাহাজ তৈরি করতে গিয়েও একই রকম আনন্দ লাভ করতেন!

ইঞ্জিনের ব্যাপারটা এখনো শেষ হয়নি। নাবিক হিসেবে আমরা থাকব তিনজন নগণ্য মানুষ। তার মধ্যে একজন আবার মহিলা। অতএব নোঙর তোলা-নামার কাজও করুক শক্তিশালী ইঞ্জিনটা। ইঞ্জিন থেকে নোঙর-কল অবধি কীভাবে বিদ্যুৎ

পৌঁছোবে সেটাও ভাবনার কথা। এই কাজের জন্য ইঞ্জিনটার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দরকার। হ-য-ব-র-ল করে একটা টেলিগ্রাম পাঠানো হল নিউইয়র্কে, ইঞ্জিন প্রস্তুত-কারকের কাছে।

উপরোক্ত প্রয়োজনগুলোর সঙ্গে আরও কয়েকটি সমস্যা দেখা দিল। স্টীয়ারিং ও তার হালের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা কি পুরনো ঢঙেই চলবে? না গীয়ার-সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত হবে? কম্পাস-বাক্সটা বসবে কোথায়? বীমের নিচে চক্রের সামনে, না এক পাশে? তারপর সমস্যার উদয় হল—ইঞ্জিনের জন্য পনেরশো গ্যালন তেল রাখবার ট্যাঙ্ক আর পাইপ লাইন বসবে কোথায়? ওগুলোর জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা চাই। আগুন যদি লেগেই যায় তবে কোন্ কোম্পানীর অগ্নিনিরোধক যন্ত্র সব থেকে ভাল কাজ দেবে? লাইফবোট থাকবে কোথায়? এই ছোট্ট জলযানে রাঁধুনি আর কেবিন-বয় সমেত এতগুলো লোককে গাদাগাদি করে থাকতে হবে। এ সমস্যার কাছে ডাঙার মানুষদের ঝিয়ের সমস্যা তো কিছুই নয়! এর মধ্যে আবার আরেক ঘটনা, যে-ছেলেটিকে আমরা কেবিন-বয় বলে বেছে নিয়েছিলাম—ভেবেছিলাম এবার ঝামেলা মিটল—সে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে চাকরি ছেড়ে দিল।

এদিকে আমরা জাহাজ চালানোর বিষয়ে কিছুই জানি না। বই পড়ে বিদ্যা আয়ত্ত করার সময় কোথায় এ বান্দার? অর্থ রোজগারের জন্য সাহিত্য-কর্মও তো করতে হচ্ছে? আমাদের যাত্রার সময় আগতপ্রায়। সমস্যার পর সমস্যা জমতে লাগল। এখন সময় না পেলাম তো জলযান পরিচালনার কাজটা না-হয় সানফ্রান্সিস্কো আর হাওয়াইয়ের মধ্যপথেই শিখে নেব। কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যে শূন্য হতে চলল!

আবার এক সমস্যা। সেটা রস্‌কোকে নিয়ে। রস্‌কো আমার বন্ধু, আমার সহ-যাত্রী—সে আবার সাইরাস্ আর. টীড্ নামে এক বিশ্ব সৃষ্টি-তাত্ত্বিক বা কসমোলজিস্টের শিষ্য। টীড্-এর বৈজ্ঞানিক মতবাদ হল এই রকম: এই পৃথিবী এক অবতলপৃষ্ঠ (মানে মাঝখানটা নিচু) ক্ষেত্র। এক বিশ্ব-গর্তের মধ্যে আমরা বাস করি। এই মতবাদ অনুযায়ী—আমাদের জলযান চলবে গর্তের ভেতর দিক দিয়ে। তা হলে ব্যাপারটা এই রকম হবে: একই জাহাজে বসেও রস্‌কো চলবে গর্তের ভেতর আর আমি চলব গর্তের বাইরে দিয়ে। মানে একই জলযানে চলতে চলতে আমাদের দু'-জনের দু'রকম অনুভূতি হবে, ইত্যাদি।

ভয় পাই এই নিয়ে আমাদের দু'জনের মতান্তর পীড়াদায়ক না হয়ে ওঠে। যাই হোক, রস্‌কোর মতবাদ আমি বদলে দিতে পারব বলেই বিশ্বাস করি। অবশ্য তারও খুব দৃঢ় ধারণা সানফ্রান্সিস্কো পৌঁছোবার আগেই সে আমাকে পৃথিবীর পেটের দিকে

নিয়ে যেতে পারবে—পৃথিবীর খোলার ভেতর দিয়ে সে যে কেমন করে আমাকে টেনে বের করবে তা আমার জানা নেই। তবে রস্কো একজন পণ্ডিত মানুষ এতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে ইঞ্জিনটা ? তৈরি হয়ে এল গীয়ার সিস্টেম, ডায়নামো, ব্যাটারী নিয়ে। এতই যদি হল, তবে একটা সার্চলাইট আর একটা ঠাণ্ডা মেশিনই বা বাদ যায় কেন ? ক্রান্তীয় গ্রীষ্ম অঞ্চলে বরফ! রুটির থেকেও বেশি দরকারি জিনিস যে! এদিকে সার্চলাইট খুব কাজের জিনিস হলেও প্রচণ্ড বিদ্যুৎ টেনে নেবে, অন্য বাতিগুলোর না. বারোটা বাজিয়ে দেয়! ডায়নামো আর মজুত ব্যাটারীর জন্য যখন আরো জোরালো শক্তির দরকার হবে বলে মনে করছি তখন কেউ প্রশ্ন তুলল, 'যদি হঠাৎ ইঞ্জিনটা বিকল হয় তাহলে ?' চুপসে গেলাম কথাটা চিন্তা করে। পাশের আলো, কম্পাসের বাতি, নোঙরের বাতি সবকিছুর ওপর তো আমাদের জীবন নির্ভর করছে। অতএব জাহাজের সবদিকে আবার বাড়তি তেলের কুপি বসাতে হল।

সবই তো হচ্ছে অথবা হতে যাচ্ছে। কিন্তু কখন আমি জাহাজ চালানোর বিদ্যে শিখব ?

দুই অভাবনীয় সৃষ্টিছাড়া ঘটনা

'খরচ যা হবার হোক', রস্কোকে বললাম আমি, 'স্নার্কের প্রতিটি জিনিসই যেন একেবারে সেরা হয়। সাজসজ্জার দিকটা কিছু ভাবনার ব্যাপার নয়। টাকা খরচা কর মজবুত গড়নের ওপর। যে কোনো ভাসমান জলযানের মতো স্নার্ক যেন টেঁকসই আর শক্তপোক্ত হয়। যা খরচা হয় হোক, তুমি কার্পণ্য কোরো না। এর জন্য আমি দিন-রাত লিখব।'

হ্যাঁ, আমার সাধ্যমত লিখে চললাম স্নার্কের জন্যে। কিন্তু আমার রোজগার স্নার্কের বাবদ ব্যয়ের সঙ্গে সমতা রাখতে পারে না। উপরন্তু আমাকে দেনা করতে হচ্ছে। এই হাজার ডলার ধার করলাম, পরক্ষণেই আবার দু'হাজার। তারপরই দেনার ধাক্কা পাঁচ হাজারে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উবে যেতে লাগল আমার লেখার রোজগার। তবে স্নার্কের জন্য এত খাটুনিতেও আমার আনন্দ ঠিকই ছিল।

প্রিয় পাঠক, স্নার্কের মজবুতি সম্পর্কে একটু ধারণা করুন। বোঝাই থাকলে জলের

সর্বোচ্চ রেখা বরাবর তার লম্বাই পঁয়তাল্লিশ ফুট। এক এক অংশের তক্তা কমপক্ষে দেড় থেকে দু' ইঞ্চি পুরু। গলুইয়ের ওপরে বসানো তক্তা তিন ইঞ্চি মোটা। প্রত্যেক তক্তায় পেরেকবিহীন জোড় লাগানো মুখে মুখে। তক্তাগুলো বিশেষ অর্ডার দিয়ে আনা হয়েছে 'পাজেট সাউণ্ড' থেকে। চারটে জলনিরোধক কামরায় ভাগ করা হয়েছে স্নার্ককে। ফলে হঠাৎ প্রকাণ্ড কোনো ফুটো হয়ে গেলেও স্নার্কের একটা কামরাই জলে ভরে যাবে। অন্য তিনটি কামরা স্নার্ককে ভাসিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। ততক্ষণে ফুটো অংশটা সারিয়ে নিতে পারব। জলযানের পেছন ভাগের শেষ চওড়া কামরাটিতে থাকছে ছ'টি ট্যাঙ্ক যাতে এর হাজার গ্যালন গ্যাসোলিন থাকবে। যদিও একটা ছোট জাহাজে এতটা পরিমাণে গ্যাসোলিন বয়ে নিয়ে যাবার বিপদ আছে, আগুন ধরে যেতে পারে। কিন্তু ছ'টি ট্যাঙ্ক ছিদ্রনিরোধক, তার ওপর এমনভাবে নিরুদ্ধ কামরার মধ্যে থাকবে, যার সঙ্গে জাহাজের বাকি অংশের কোনো যোগই নেই। সুতরাং বিপদের সম্ভাবনা খুবই অল্প।

স্নার্ক তো আসলে পালতোলা জাহাজই, তবে সত্তর ঘোড়ার ইঞ্জিনটা বসানো হয়েছে বাড়তি কাজে—অন্য প্রয়োজনে। ভাল শক্তিশালী ইঞ্জিন। নিউইয়র্ক থেকে বেশ খরচ করেই এটাকে আনা হয়েছে। সেটা আমার হাড়ে হাড়ে জানা। ডেকের ওপর ইঞ্জিনটার ঠিক ওপরেই কয়েকশো পাউণ্ড ওজনের একটা 'উইণ্ডল্যাস' বসানো হয়েছে (চরকি-কল)। বড়ো চমৎকার জিনিস অথচ ডেক-রুমের জায়গা দখল করেনি। গীয়ারের মারফত ইঞ্জিনের সঙ্গে যোগ রেখেছে এই চরকি-কল যাতে এর সহায়তায় নোঙর ওঠানো-নামানো যাবে। সানফ্রান্সিস্কোর একটা ঢালাই কারখানা স্নার্কের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করেছে এগুলো।

স্নার্ককে আরামদায়ক করা ছিল আমাদের লক্ষ্য, তাই খরচার ত্রুটি করিনি। বাথরুমটা ছোটখাটো হলে কি হবে—ডাঙার যে কোনো ভাল বাথরুমের সমস্ত রকম সুবিধাই এতে আছে। দিন রাত আমি এর পরিকল্পনায় মগ্ন থেকেছি। পাম্প, লিভার, সী-ভালভ—সব উপকরণ মজুত। বাথরুমের পরই ধরুন লাইফবোটের কথা। যদিও এটা স্নার্কের ডেকের অনেকটা জায়গা দখল করল, তবুও জেনে রাখা ভাল, মজবুতিতে এটি স্নার্কের থেকে কোনো অংশে কম নয়। লাইফবোটের অর্ডার দেবার সময় দাম ধরা হয়েছিল দেড়শো ডলার। কিন্তু তাকে স্নার্কে বসাবার পর, আমাকে দাম দিতে হল তিনশো পঁচানব্বই ডলার। তা হলেই বুঝুন—কত ভালভাবে তৈরি হয়েছে এটি।

স্নার্কের গুণাবলীর কথা এবারে একটু থামাচ্ছি। এই পরিচ্ছেদের শিরোনাম আপনারা দেখেছেন—'অভাবনীয় সৃষ্টিছাড়া ঘটনা'। গর্ব করে অনেক কথাই বলেছি

কিন্তু তা এক বিশেষ উদ্দেশ্যেই—তাই আমার কাহিনীর শেষ অবধি একটু শুনুন।

ঠিক ছিল স্নার্কের শুভযাত্রা হবে পয়লা অক্টোবর ১৯০৬ সালে। কিন্তু এই তারিখে স্নার্ক জলে ভাসতে পারল না। এটাই এক অভাবনীয় সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। জলে ভাসতে না পারার একমাত্র কারণ—সেদিন পর্যন্ত জলে নামবার জন্য তৈরিই হয়নি স্নার্ক। কিন্তু কেন সে তৈরি হল না? সেটার কোনো বিশ্বাসযোগ্য কারণ নেই। তারপর যাত্রার তারিখ পড়ল পয়লা নভেম্বর। এর পর ১৫ই নভেম্বর। ডিসেম্বরের পয়লা তারিখেও স্নার্ক প্রস্তুত হল না। রস্কোর উপদেশ মতো চার্মিয়ান ও আমি দু'সপ্তাহের জন্য শহরে ঘাঁটি করে বসলাম, এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে ঘিঞ্জি শহরের মধ্যে!

রস্কোর বুদ্ধিতেই আমরা শহরে এসে বসেছিলাম। তা দু'সপ্তাহের কথা হয়েছিল অথচ সে জায়গায় দেখতে-দেখতে আট সপ্তাহ কেটে গেল! স্নার্ক আদৌ যাত্রা করবে কি-না এমন সন্দেহ দেখা দিল। এই অবস্থার ব্যাখ্যা কে দেবে? আমি? আমার জানা থাকলে অবশ্যই দিতাম। আমি একজন সু-বক্তা। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার ভাষা ফুরিয়ে যায়। অক্ষমতা স্বীকার করেই বলছি কেন স্নার্ক এখনও সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত নয় তা আমি বোঝাতে পারব না। আবারও বলছি: ধারণাতীত সৃষ্টিছাড়া সব ঘটনা ঘটে চলেছে।

আট সপ্তাহ যখন ষোলো সপ্তাহে পৌঁছাল, একদিন উৎফুল্ল রস্কো আমাদের উৎসাহ দিয়ে বলল, 'পয়লা এপ্রিল যদি যাত্রা শুরু না হয়েছে তবে আমার মুণ্ডু দিয়ে ফুটবল খেলবে তোমরা।'

দু'সপ্তাহ পরে বিষণ্ণভাবে সে জানাল, 'মাথাটাকে তালিম দিচ্ছি যাতে ওটা নিয়ে ফুটবল খেলতে পার।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই!' চার্মিয়ান আর আমি পরস্পরকে আশ্বাস দিয়ে বলি, 'কাজ শেষ হলে জাহাজটা যা দারুণ হবে না!'

স্নার্কের নানা অজস্র গুণের তারিফ করে পরস্পরের উৎসাহবর্ধক কথাবার্তা বলেই কাটিয়ে দিচ্ছি আমরা। এদিকে এন্তার দেনাও করে চলেছি। লিখেই আমার রোজগার। এক মুহূর্ত লেখা থেকে বিশ্রাম নিচ্ছি না। সপ্তাহান্তে বন্ধুদের সঙ্গে অবসর বিনোদন অবধি করছি না। আমার এখন এক লক্ষ্য—একটা সত্যিকারের জাহাজের মতো জাহাজ হবে স্নার্ক। যতবার আমাদের যাত্রার তারিখ পিছিয়ে যাচ্ছে, ততবারই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে খরচ। তবুও স্নার্কের সদ্যসমাপ্ত গলুইটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি আমরা। মনে মনে শ্লাঘা অনুভব করি।

ছোট্ট জলযান স্নার্কের জন্য প্রাথমিক খরচের হিসেব ধরা হয়েছিল সাত হাজার

ডলার। এই ব্যয়ের হিসেব উদারতার সঙ্গেই করা হয়েছিল। বাড়ি আর খামার বানাবার সময়ও দেখেছি—প্রাথমিক ব্যয়ের হিসেবকে একেবারে পেছনে ফেলে এগোতে থাকে সত্য সত্য খরচাগুলো। একথা মনে রেখেই স্নার্কের তৈরি করবার খরচ ধরেছিলাম সাত হাজার ডলার। শুনে রাখুন—শেষ পর্যন্ত স্নার্ক তৈরি করতে ব্যয় দাঁড়াল তিরিশ হাজারে! কেন এবং কী ভাবে তা দয়া করে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না! এটাই সত্য। আমি নিজে চেক্ কেটেছি এবং নিজেই রোজগার করে খরচের টাকাটা তুলেছি—অতএব আমার অজুহাত দেবার নেই। তাহলেই বুঝলেন, ব্যাপারটা সেই অভাবনীয় সৃষ্টিছাড়া ঘটনাই—সব কাহিনীটুকু শুনলে আপনারাও তা মানবেন।

বিলম্বের ব্যাপারটা বলি এবার। সাতচল্লিশজন নানা দলের জাহাজী কারিগর এবং একশো পনেরটি কোম্পানীর সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে আমাকে। এই সাতচল্লিশ কারিগর আর এতগুলো কোম্পানীর একজন বা একটিও 'নির্দিষ্ট' সময়ে কাজ শেষ করেনি অথবা মাল ডেলিভারি দেয়নি। তবে হ্যাঁ, সাপ্তাহিক বেতন ও পাওনা আদায়ের জন্য তারা অবশ্যই 'নির্দিষ্ট' সময়ে এসে হাজির হয়েছে। কোনো একটা মাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জান হলপ করে ডেলিভারি দেবে কথা দিয়েও তারা কম করে তিন মাস পরে তা সরবরাহ করেছে। আর এই সময়ে স্নার্কের অপূর্ব গুণাবলীর কথা আলোচনা করে পরস্পরকে খুশি করেছি আমি আর চার্মিয়ান। স্নার্কের অবিশ্বাস্য সুন্দর গলুইটার দিকে তারিফের দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছি। চার্মিয়ানকে বলেছি, 'চীন সমুদ্রের প্রচণ্ড ঝড়েও এগিয়ে যাবে স্নার্ক। গলুইয়ের ভেতর এক ফোঁটা জল ঢুকবে না।' চার্মিয়ান জবাব দিয়েছে, 'হোক দেরি, হোক খরচা, তবু এ একটা সাচ্চা আশ্চর্য-সুন্দর জাহাজ তো হল!' তারপর জলনিরোধক কামরাগুলোর কথা ভেবে আমি উৎসাহে মশগুল হয়েছি।

ইতিমধ্যে আমার বন্ধুরা কিন্তু তেমন উৎসাহিত হয়নি। স্নার্কের যাত্রার তারিখের ওপর তারা বাজি ধরতে শুরু করেছে। প্রথম বাজি জিতল আমার র্যাঞ্চের কেয়ার-টেকার মিস্টার উইগেট। ১৯০৭ সালের নববর্ষের দিনে বাজির টাকা পকেটে পুরল সে। তারপরই বাজি ধরবার হুল্লোড় পড়ে গেল। প্রতিটি যাত্রার তারিখেই বাজি জিততে লাগল কেউ না কেউ। বাজি ধরবার শেষ আর হয় না। বাজির টাকা অবশ্য আমার পকেট থেকেই যাচ্ছে। এমনকি আমার বন্ধুদের স্ত্রীরা, চার্মিয়ানের বন্ধুরাও বাজির নেশায় মত্ত হয়ে গেল। যারা জীবনে কখনও বাজি ধরেনি, তেমন মহিলারাও বাজি ধরতে লাগল নির্ভয়ে। উদার হস্তে তাদের বাজি জেতার টাকা মিটিয়ে দিতে লাগলাম আমি।

আমাকে আশ্বাস দেয় চার্মিয়ান—'দুঃখ কোরো না। ওই গলুইটার দিকে তাকিয়ে দেখ। আহা! চীন সমুদ্রের আছাড়িপিছাড়ি ঢেউয়ের ভেতরেও যখন সে ছুটে চলবে! ভাবো একবারটি!' বন্ধুদের সর্বশেষ দলের বাজির টাকা মিটিয়ে দিতে গিয়ে বললাম, 'ছ্যাখো হে, ঝঞ্ঝাট এবং টাকার অভাব কোনোটাতেই স্নার্কের কাজ আটকাবে না। স্নার্ককে তৈরি করা হচ্ছে এমনভাবে যে এহেন জলযান আজ পর্যন্ত গোল্ডেন গেট পেরিয়ে যায়নি। দেরি হবার কারণ এটাই।'

ইতিমধ্যে যে সব প্রকাশক ও পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছিল ভ্রমণ-কাহিনীর জন্য—তারা দেরির জন্য কৈফিয়ত চাইতে লাগল। যে কৈফিয়ত আমি নিজে-কেই দিতে অক্ষম, সেই কৈফিয়ত অন্যকে কি করে দেব? খবরের কাগজগুলো আমাকে ব্যঙ্গ করে ছড়া লিখতে লাগল। একটি কাগজ লিখল—"এখনো হয়নি। তবে শীগ্‌গির হবে আশা করা যায়।" আমার উৎসাহ অনির্বাণ রাখবার জন্য চার্মিয়ান স্নার্কের গলুইয়ের প্রশংসা করেই চলল। আবার এক ব্যাঙ্ক থেকে দেনা করলাম পাঁচ হাজার ডলার।

অবশ্য এই দেরির জন্য আমার খানিকটা লাভ হল। আমার এক সমালোচক বন্ধু আমাকে ঝাঁঝরা করে দেবার জন্য আমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কার্যকলাপ নিয়ে লিখছিল। বলা হয়েছিল আমি সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া পর্যন্ত ও লেখা প্রকাশিত হবে না। কিন্তু আমি ডাঙায় থাকতে থাকতেই, আমাকে আগুনে সেঁকার মতো লেখাটা প্রকাশ হয়ে গেল। এখন সে এ কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতেই ব্যস্ত।

যতই দিন যেতে লাগল, আমার কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠল। সান-ফ্রান্সিস্‌কোতে স্নার্কের কাজ শেষ করা যাবে না। এতকাল ধরে ওটা তৈরি হচ্ছে যে ইতিমধ্যে জিনিসগুলো পুরনো হয়ে যাচ্ছে, ভাঙন ধরে যাচ্ছে। এমন পর্যায়ে এসেছে যে নতুন কিছু মেরামত করার আগেই তা দ্রুত ভেঙে পড়ছে, ক্ষয় ধরে যাচ্ছে। স্নার্ক যেন উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়াল। কেউই তাকে গুরুত্ব দিতে চায় না—বিশেষ করে কারিগরেরা। যখন ঠিক করলাম—যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই স্নার্ককে নিয়ে ভেসে পড়ব, জাহাজের বাকি কাজ যা করার তা হনলুলুতে করা যাবে। আর এ কথা শুনেই বুঝি একটা ফুটো দেখা দিল জাহাজে। পাড়ির আগে ফুটো সারানোর কাজটা করা চাই, তাই ওকে আমি চালিয়ে রওনা করলাম নৌকো-পথ ধরতে হবে বলে। সেদিকে কিছুদূর যাবার পরই দুটো বিশালাকৃতি বজরার মাঝে পড়ে ভীষণ চোট খেল স্নার্ক। তাকে যখন টেনে নৌকো-পথের দিকে খানিকটা নিয়ে আসা হল তখনই চওড়া জলপথে পড়ে তার পিছনের অংশ বসে গেল গভীর কাদার মধ্যে।

এবারে পড়া গেল বড়োরকম ফ্যাসাদে, কারণ কাদা থেকে ওকে উদ্ধার করবার কাজ

নৌকো-কারিগরদের নয়, এই কাজ করবে ভাঙা বা ডোবা জাহাজের উদ্ধারকারীরা। দু'সপ্তাহ ধরে দিনরাত দুটো বাষ্প-চালিত টাগ্ টানাটানি করে চলল কারণ প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় দুবার করে জোয়ার এলে তবেই এ কাজ করা যায়। কিন্তু দুটো জলপথের মাঝখানের চড়াতে অনড় হয়ে রইল স্নার্ক।

এমনি এক সংকটময় অবস্থায় আমরা গীয়ার আর স্থানীয় কারখানায় ঢালাই-করা যন্ত্রগুলোকে কাজে লাগাতে গেলাম। ইঞ্জিন থেকে চরকি-কলে এই প্রথম বিদ্যুৎ চালানোর চেষ্টা হল। কিন্তু ফলটা হল এই—খুঁতওয়ালা ঢালাই লোহাগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হল, দলামোচা পাকিয়ে গেল গীয়ারগুলো। আর চরকি-কলটা বিগড়ে গেল পুরোপুরি। তারপর তার সঙ্গে তাল রেখে ইঞ্জিনটাও প্রথমে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর হ্যাঁচকা টানে নানা গলদওয়ালা ঢালাই লোহার ভিত্তি-প্লেট (যেটা ওর সঙ্গে নিউইয়র্ক থেকেই এসেছিল), নাট বল্টু, সমস্ত কিছু নিয়ে শূন্যে উড়ল সত্তর অশ্বশক্তির ইঞ্জিন। যোগাযোগ-তার জোড় ছিন্ন করে আছড়ে পড়ল ডেকের এক পাশে। স্নার্কও আগের মতোই আটকে রইল জলপথের মাঝখানের চড়ার মধ্যে।

দুটো টাগ ক্রমাগত স্নার্ককে টেনেই চলেছে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। চার্মিয়ান আমাকে সান্ত্বনা দেয়—'দুঃখ কোরো না। মনে আছে তো কী দারুণ মজবুত আমাদের স্নার্ক!' আমিও বলি, 'হ্যাঁ—আর ওর গলুইটাও চমৎকার!' ইত্যাদি।

অতএব নতুন উদ্যমে আমরা আবার লেগে পড়ি। বিকল ইঞ্জিনটাকে তার বিধ্বস্ত ভিত্তি-প্লেটের সঙ্গে বাঁধা হল, বিদ্যুৎচালনার দাঁতচাকা আর যন্ত্রপাতির ভাঙা অংশগুলো স্নার্কের গুদামে জমা করে দিলাম। যা কিছু সারানো বা ঢালাইয়ের কাজ হনলুলুতেই করব। শেষ পর্যন্ত কাদা থেকে উদ্ধার হল স্নার্ক। কবে এক আস্তর শাদা রঙ দেওয়া হয়েছিল ওর গায়ে, ভাল করে না দেখলে বোঝাই যায় না। আর ভেতরে তো একেবারেই রঙ পড়েনি, বরং স্নার্কের সারা শরীরে কাদা, গ্রীজ আর মিস্ত্রীদের তামাকের থুথুতে থিকথিক করছে। ঠিক করলাম—সারাইয়ের কাজের সময় হনলুলুতেই স্নার্কে সুন্দর করে রং করব।

অনেক ঝামেলা করে স্নার্ককে নৌকো-পথ থেকে টেনে নিয়ে ওকল্যাণ্ড শহরের জাহাজঘাটায় বাঁধা হল। এবারে আমাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, বই, কম্বল ইত্যাদি নিয়ে আসা হল জলযানে। নানা হাবিজাবি জিনিসও উঠল এই সঙ্গে—কাঠ, কয়লা, জল, জলের ট্যাঙ্ক, শব্জি ও অন্যান্য খাবার, তেল, লাইফবোট। এরই মধ্যে এসে ভিড় জমাল আমাদের বন্ধুরা, বন্ধুদের বন্ধুরা, তাদেরও তথাকথিত বন্ধুরা, আর আমাদের খালাসিদের বন্ধুদের বন্ধুদের বন্ধু—এরা তো আছেই! রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার, অচেনা

মানুষ, ছিটগ্রস্ত ইত্যাদিতে জাহাজঘাট গিজগিজ করতে তো লাগলোই, সেই সঙ্গে পায়ে-পায়ে কয়লা ধুলোর ঝড় বয়ে গেল।

রবিবার সকাল এগারোটায় যাত্রা শুরু হবে—এটাই নির্ধারিত ছিল। শনিবার বিকেলে জাহাজঘাটায় লোক আর ধরে না, আর সেই রকম কয়লার ধুলো! আমি স্নার্কের এক কোণে বসে আছি চেকবই আর নগদ ডলার নিয়ে। কারো কোনো পাওনা শেষ পর্যন্ত মেটানো না হয়ে থাকলে, ছোট-বড় পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে যাব। রস্কো গেছে একশো পনেরটা কোম্পানির হিসাব আনতে, যদি কারো কোনো পাওনা বাকি থাকে। এরাই আমাকে এই ক'মাস দেরি করিয়েছে। রস্কোর ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছি—

আর ঠিক এমনি সময় ঘটল সেই 'অভাবনীয় সৃষ্টিছাড়া ঘটনা'র পুনরাবৃত্তি। রস্কোর বদলে দেখা গেল আর এক মানুষকে। স্নার্কে উঠে আসছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম একজন মার্শাল। জাহাজে উঠেই মার্শাল সাহেব স্নার্কের মাস্তুলে সেঁটে দিলেন এক নোটিস। নোটিস এমন জায়গায় যে জাহাজঘাটার দূর প্রান্ত থেকেও সবাই পড়তে পারে একটা অবমাননাকর অভিযোগ—স্নার্ক ঋণগ্রস্ত!

এই নোটিস সেঁটে মার্শাল নেমে গেলেন। রেখে গেলেন বাঁটুল এক বৃদ্ধকে। সেই বৃদ্ধই এখন স্নার্কের মালিক ও হর্তাকর্তা। এই জলযানের ওপর আমার কোনো খবরদারি চলবে না। শুধু তাই নয়, এই মালিকানার জন্য বৃদ্ধটিকে প্রতিদিন তিন ডলার করে নজরানা দিতে আমি বাধ্য।

এবারে জানা গেল—স্নার্কের বিরুদ্ধে মানহানিকর অভিযোগটা এনেছে কে। সেলার্স নামধারী এক ব্যক্তি। তার পাওনার পরিমাণ মাত্র দু'শো বত্রিশ ডলার। কে এই সেলার্স? হায় ভগবান, সেলার্স! কোথাকার বাসিন্দা ইনি? চেকবই উল্টেপাল্টে দেখলাম। দু'সপ্তাহ আগেই এই নামের এক ব্যক্তিকে পাঁচশো ডলার দিয়েছি। পুরনো চেক-বইগুলো ঘেঁটে দেখলাম। দীর্ঘ সময় ধরে স্নার্ক তৈরি হবার সময় এই লোকটি কয়েক হাজার ডলার নিয়েছে আমার কাছ থেকে। তবে এ কোন ভদ্রতা? এই সামান্য পাওনার জন্য আইন-আদালত করল লোকটা? আমি তো চেকবই আর নগদ নিয়ে বসেই আছি। ওর চেয়ে অনেকগুণ বেশি টাকা নিয়েই বসে আছি। এই লজ্জাজনক ও সামান্য অর্থের জন্য এমন ব্যবহার করল সে? আমাকে একটা সুযোগ পর্যন্ত দিলে না? এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। এ সেই 'অভাবনীয় সৃষ্টিছাড়া ঘটনা'রই আরেক নমুনা।

শনিবার বিকেলে ঋণগ্রস্ততার নোটিস টাঙানো হয়েছিল। ফলে ঘটনাটা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াল। চারদিকেই আইনজীবী আর প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু

ওকল্যাণ্ড ও সানফ্রান্সিস্কোর কোথাও যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মাননীয় বিচারপতি বা মার্শালদের পাওয়া গেল না। এমনকি সেই সেলার্স নামধারী ব্যক্তিটি অথবা তার উকিলকেও না। সাপ্তাহিক ছুটি উপভোগের জন্য তারা শহরছাড়া। অতএব রবিবার বেলা এগারোটায় স্নার্কের যাত্রা শুরু করা গেল না। স্নার্কের বর্তমান বেঁটে বুড়ো 'মালিক' গ্যাঁট হয়ে থেকে বললে, না!

অগত্যা চার্মিয়ান আর আমি স্নার্ক থেকে নেমে দূর থেকে বসে তার গলুইয়ের শোভা দেখতে লাগলাম। আর মনকে সান্ত্বনা দিলাম আগামী দিনের টাইফুন ঝড়ের মধ্যেও কীভাবে ঘুঁষি মেরে ছুটবে স্নার্ক সেই কথা ভেবে। চার্মিয়ানকে সেলার্স আর তার নোংরা অভিযোগের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম, 'এটা ব্যবসায়ীদের ভয় দেখানো কৌশল মাত্র। একটা বুর্জোয়া চালাকি! দুঃখ কোরো না! একবার উন্মুক্ত সমুদ্রে ভেসে পড়তে পারলে আমাদের সব ঝামেলা কেটে যাবে।'

শেষ পর্যন্ত, মঙ্গলবার ২০ এপ্রিল, ১৯০৭ সালের সকালে আমরা ভেসে পড়লাম।

হ্যাঁ, স্বীকার করছি, যাত্রার সময়েও নির্বিঘ্ন ছিলাম না আমরা। বিদ্যুৎ চালনার ব্যবস্থা একেবারে নষ্ট হবার ফলে হাতে টেনেই নোঙর তুলতে হল আমাদের। ইঞ্জিন থেকেও নেই, যতোটুকু আছে তা জাহাজের তলায় বাঁধা রয়েছে ভারসাম্য রক্ষা করতে। লাইফবোট ফুটো ঝাঁঝরা হয়ে গেলে কী হয়? এসবই মেরামত হবে হনলুলুতে পৌঁছে। স্নার্কের তো বিশ্রাম হল? সেইটেই আসল, বাদবাকি সব তো অলঙ্কার মাত্র। জল-নিরোধক কামরাগুলো আসল কাজের বস্তু। তাছাড়া জোড়বিহীন তক্তাগুলো আছে। বাথরুমের উপকরণগুলোও ঠিকমতো আছে—এদের নিয়েই তো স্নার্ক। সর্বোপরি আছে আমাদের মহান গলুইটি, যে বাতাস-ঝড়-ঝঞ্ঝাকে গুঁড়িয়ে পথ করে চলবে।

গোল্ডেন গেট পার হলাম আমরা। যাত্রাপথ ঠিক রাখা হল দক্ষিণমুখো—প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য-বায়ুকে যথাস্থানে ধরবার আশায়। স্নার্কের মতো জাহাজের যাত্রাপথে তরুণ যুবকদেরই প্রয়োজন—এই হিসেবটুকু করেই আমি তিনজন যুবককে সঙ্গে নিয়েছি কেবিন-বয় ও রাঁধুনি ছাড়াও একজন ইঞ্জিনীয়ার।

কিন্তু আমার হিসেবের অঙ্ক মিলল শুধু এক-তৃতীয়াংশ। সমুদ্রপীড়ায় বাঙ্কে আশ্রয় নিল কেবিন-বয় এবং রাঁধুনি। অন্তত সপ্তাহখানেক তাদের কোনো কাজেই লাগানো যাচ্ছে না। রান্না করা পরিবেশিত গরম খাবারের আশা চুলোয় গেল, না হল নিচের তলায় সাফসুতরোর কাজ। কাঁচা খাদ্য ও আনাজের সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল—কমলালেবু ও আপেল সরবরাহকারীরা পুরনো পচ-ধরা মাল গছিয়েছে।

বাঁধাকপির ঝুড়ি সমুদ্রে ফেলে দিতে হল, আগেই খারাপ হয়েছিল। গাজর ও বীট কাঠের মতো শক্ত, তায় কেরোসিনের গন্ধে ভরপুর। জ্বালানির কাঠগুলো জ্বলল না। ছেঁড়া বস্তায় কয়লা দেবার ফলে সেগুলো ডেকময় গড়াগড়ি দিচ্ছে, জলে ভিজছে।

কিন্তু এতেও আমাদের কিছু আসে যায় না। এ সব সামগ্রী চলার পথের উপকরণ মাত্র। আমাদের জলযান তো ঠিক আছে—তাই না?

একবার মাত্র ডেকে পায়চারি করেই আবিষ্কার করলাম—যে-তক্তাগুলোকে জোড়-বিহীন বলা হয়েছে, সেগুলোতে অসংখ্য পেরেক দৃশ্যমান, অথচ পাজেট সাউণ্ড থেকে বিশেষ অর্ডার দিয়ে আনা হয়েছিল, পেরেক থাকার কথাই নয়। এদিকে ডেক পর্যন্ত জল উঠে আসছে। নিচে রস্কোর বাক্সে জল উঠে তাকে প্রায় ডুবিয়ে দিচ্ছিল। জাহাজের দু'পাশ ও নিচে থেকে জল ঢুকছে। রোজই স্নার্ককে ভাসিয়ে রাখবার জন্য পাম্প চালাতে হচ্ছে অবিরাম। পাটাতনের তলা থেকে জল উঠছে। পাটাতন দু'ফুট উঁচুতে, তবু নিচে রান্নাঘরে কিছু খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে আমার হাঁটু পর্যন্ত জলে ভিজে গেল। শেষবার পাম্প করবার চার ঘণ্টার মধ্যেই অবস্থা হল এই। যে সব জল-নিরোধক গলুই-কামরার জন্য এত সময় আর অর্থ ব্যয় করেছি সেগুলো মোটেই জল-নিরোধক নয়। এক কামরা থেকে আরেক কামরায় জল ঢুকছে হাওয়ার মতোই অবাধে। তারপর নাকে এল গ্যাসোলিনের গন্ধ। নিশ্চয় কোনো একটা গ্যাসোলিনের ট্যাঙ্ক ফুটো হয়েছে কিংবা বেশ কয়েকটাই। তার মানে সেগুলোও বায়ুনিরোধক ভাবে শিল করা হয়নি। বাথরুমের কথাও একটু বলি। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টায় ওটার সী-ভাল্‌ভ খারাপ হয়ে গেল। পাম্প করবার সময় লোহার শক্ত লিভারও ভাঙল হাতের মুঠোতেই। স্নার্কের বাথরুমটাই সবার আগে ভেঙে চুরে গেল।

স্নার্কের জন্য বিশেষভাবে তৈরি লোহার অংশগুলোর কথা যদি বলি—তা এদের নির্মাতারা যেই হোক, প্রত্যেকটাই প্রমাণিত হল খেলো ছাইপাঁশ বলে। ইঞ্জিনের ভিত্তি-প্লেট এসেছিল নিউইয়র্ক থেকে। সানফ্রান্সিস্‌কো থেকে পেয়েছিলাম নোঙর-তোলা চরকি-কলের গীয়ার ও ঢালাই কাজের অংশ। সবগুলো রাবিশ বলে প্রমাণিত হল। যে মজবুত পেটা লোহায় রিগের কাজ হয়েছিল, প্রথমবারেই হাত লাগিয়ে কয়েকবার ঘোরাতে তা ঝরে পড়ল ম্যাকারোনির মতো। ঝড়ের সময় যে 'গুজ-নেক' লোহার আঁকশি-কাঁটা) একমাত্র ভরসা, প্রধান পালের ওপর চড়াতে তা পনের মিনিটেই আধখানা হয়ে ভেঙে গেল। এই মুহূর্তে স্নার্কের প্রধান পাল পাখির ভাঙা ডানার মতো ঝুলছে। কোনোরকমে গুজ-নেকটার বদলে রশারশি বাঁধা হয়েছে। দেখি, হনলুলুতে গিয়ে খাঁটি লোহার মাল পাই কিনা!

মানুষ আমাদের ঠকিয়েছে। একটা ঝাঁঝরিতে করে তারা আমাদের সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে আছেন। কেননা, এখনও আমরা শান্ত আবহাওয়ার ভেতর দিয়েই চলেছি। জলযানকে ভাসিয়ে রাখার জন্য দিনরাত জল ছেঁচে বের করছি, তবে পাম্পের লোহার হ্যাণ্ডেল থেকে এখন এক টুকরো কাঠের ওপরেই আমরা বরং বেশি ভরসা করতে পারি। স্নার্ক যতই এগিয়ে চলেছে, চার্মিয়ান আর আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে গলুইয়ের দিকে তাকিয়ে ভরসা রাখছি। আর কার ওপরই বা ভরসা রাখতে পারি আমরা? বাকি সব কিছুই 'অভাবনীয় সৃষ্টিছাড়া' হতে পারে, কিন্তু স্নার্কের গলুইটাই একমাত্র যা 'যুক্তিগ্রাহ্য' বাস্তব।

তারপর এক সন্ধ্যায় আমরা শুরু করলাম স্নার্ককে হাওয়ার মুখে ঠেলে এগিয়ে নিতে; জলযানটাকে এবার সুস্থির করে ঢেউয়ের ওপর দাঁড় করাতে হবে যাতে তার মাথার দিকটা থাকে খোলা মহাসাগর আর সমুদ্রবায়ুর দিকে। কীভাবে এর (হীভ্-টু) বর্ণনা দেব? আনাড়িদের সুবিধের জন্য বুঝিয়ে বলি। এ হল এমন এক জাহাজী কৌশল যাতে খাটো ধরনের টুকরো পালগুলো হিসেব করে খাটিয়ে গলুইয়ের মুখ সামনে রেখে জাহাজটাকে সমুদ্র আর হাওয়ার ওপর চড়িয়ে দিতে হয়। বাতাস যদি প্রখর থাকে অথবা সাগরের ঢেউ যদি খুব উঁচু থাকে তাহলে স্নার্কের মাপের ছোট জাহাজকে অনায়াসেই ঢেউয়ের ওপর চড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। এর পর আর কোনো কাজ করার থাকে না ডেকের ওপর। হাল ধরারও প্রয়োজন নেই, অকারণে বাইরে তাকিয়ে থেকেও লাভ নেই। তখন সবাই ডেকের নিচে গিয়ে হয় ঘুম, নয়তো তাস পেটাতে পারে।

যাক্, আগে থেকেই একটু চড়া হয়ে গ্রীষ্মের ঝোড়ো বাতাস বইছিল। রস্‌কোকে বললাম এখুনি জাহাজটাকে সমুদ্র-হাওয়ায় চড়িয়ে দেওয়া যাক। রাতও ঘনিয়ে আসছে। প্রায় সারাদিনই নিজে হাল ধরে আছি, আর রস্‌কো, বার্ট আর চার্মিয়ানও ক্লান্ত, বাকি দু'জন নিচের তলায় অসুস্থ। দুটো টুকরো-পাল আগেই তোলা হয়েছিল চৌকোনা প্রধান পালটার ওপর। বড়ো মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা তেকোনা পাল আর বাইরে-টাঙানো তেকোনা পাল গুটিয়ে ফেলে আমরা শুধু একটা টুকরো-পাল বেঁধে দিলাম সামনের মাস্তুলের সঙ্গে। একেবারে নিচের পেছনের (মিজেন্) পালটাও গুটিয়ে নিলাম। এর মধ্যে হল কি, বাইরের তেকোনা পালের সাগরমুখো দণ্ডটা জলের ঝাপটায় ভেঙে দু'টুকরো হল।

আমি হালের চাকা ঘুরিয়ে নামাতে লাগলাম যাতে জাহাজটাকে বাতাসের মুখে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর চড়িয়ে দেওয়া যায়। স্নার্ক সে-সময় পড়েছে দু'পাশের লম্বা

সমুদ্র-তরঙ্গের মাঝখানে একটা নিচু খোলার মধ্যে (ট্রফ্)—ওই নিচু জল-তলের মধ্যেই সে ক্রমাগত দুলুনি খাচ্ছে। হালের স্পোক ধরে সজোরে নামাতে চেষ্টা করি। তবু স্নার্ক এক চুল নড়ে না। (সমুদ্রের এই স্থির জলাটাই সবচাইতে বিপজ্জনক জায়গা, যে-কোনো জলযানের পক্ষে)। যতো জোর খাটিয়েই হালের চাকা চেপে ধরি না কেন, স্নার্ক আর নিচু 'ডহর' ছেড়ে ওঠে না, কেবলই উথালপাথাল করে। দোলানি এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে দু'দিকে কাত হয়ে রেলিঙ পর্যন্ত জলে চুবোনি খেতে লাগল। স্নার্ক এগোচ্ছে না। বাতাসের নাগাল পেতে বড়োজোর মাত্র আট পয়েন্ট এগিয়ে যেতে পেরেছি। আমি, রসকো আর বার্ট সব রকম চেষ্টা চালিয়েও স্নার্ককে এক ডিগ্রীর দশ ভাগের এক ভাগও ঘোরাতে পারলাম না। অবিশ্বাস্য? ডবল-ফালিওয়ালা বড়ো পাল, সামনের মাস্তুলের টুকরো পাল এবং যা শুধু ঝড়ের সময়েই ব্যবহার করা কর্তব্য, প্রধান পালের বদলে সেই জোরালো বাড়তি পাল পেছনের মাস্তুলে লাগিয়েও কোন ফল হল না। জানি, বিশ্বাস করতে আপনাদের কষ্ট হবে। কিন্তু এখনও চলছে সেই অকল্পনীয় সৃষ্টিছাড়া ঘটনার জের। এর পর, সামনের মাস্তুলের টুকরো পালটাও খুলে নিয়ে ভাবলাম পেছনে খাটানো ঝড়ের পালটাতেই (ট্রাইসেইল্) যা কাজ হবার হবে, নয়তো আর কিছুতে নয়—এতেই জাহাজ হাওয়ার মুখে ধরবে। কিন্তু আপনি বিশ্বাস না করলেও আমি বলব আমি এতেও ব্যর্থ হলাম। কারণ আপনি বিশ্বাস করুন চাই না-করুন আমি নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখেছি। একটা ছোট জাহাজের পেছন প্রান্তে ঝড়ের পাল লাগিয়েও গলুইয়ের মুখ বাতাসের দিকে উঁচিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না?

প্রিয় পাঠক, এই অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন? ভাসমান সমুদ্র-নোঙর ব্যবহার করতেন—তাই না? হ্যাঁ, আমরাও তাই করলাম। বিশেষ ভাবে প্রস্তুত এই নোঙর ডুবে যাবে না বলেই গ্যারান্টি দেওয়া ছিল। জিনিসটা হল শঙ্কু আকৃতির একটা মস্ত ক্যানভাসের থলির মুখে একটা ইস্পাতের বেড়, যা থলির মুখটাকে হাঁ করে খুলে রাখে। একটা লম্বা দড়িতে বেঁধে সমুদ্র-নোঙরটি জলে ফেলা হল গলুই থেকে। কী হল তাতে? ফেলা মাত্রই জলে ডুবে গেল ওটা। ভাগ্যিস টানারশিতে বাঁধা ছিল। তাই তুলে আনা গেল জল থেকে। ওটার সঙ্গে একটা কাঠের খুঁটির 'ফাতনা' বেঁধে জলে নামানো হল। এবারে সমুদ্র-নোঙর টান টান হয়ে জলে ভেসে রইল বটে, কিন্তু পেছনের পালে টান ধরলেও স্নার্কের জায়গা বদল হল না। গলুই যদিও হাওয়ার দিকে মুখ ঘোরাতে চাইছে, তা সত্ত্বেও স্নার্ক নির্বিবাদে সমুদ্র-নোঙরটাকে যেন দাঁতে কামড়ে পেছনে টানতে-টানতে সোজা এগিয়েই চলল সামনে—ডোঙার তলা থেকে সে আর

উঠবেই না। এবার ঝড়ের পালটাকেও নামিয়ে সে-জায়গায় পুরো মিজেন্ পাল চড়ানো হল, স্নার্ক তবু নিচু-ডহরে গড়াগড়িই খায়, আর নোঙরটাকে পিছে টেনে রাখে। বিশ্বাস করবেন না আপনারা। আমিও বিশ্বাস করছি না, কিন্তু বক্তব্যটা বলে যাচ্ছি।

এবার আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দি'। এমন পাল-তোলা জাহাজের কথা শুনেছেন যা ঢেউয়ের ওপর ঠেলে ওঠে না?—সমুদ্র-নোঙরের সাহায্য পেয়েও? আমার নিজস্ব খানিকটা অভিজ্ঞতায় আমি তো এমন শুনিনি। আর তাই আমি ডেকে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলাম অভাবনীয় সৃষ্টিছাড়া একটা কাণ্ডের দিকে—স্নার্ক ঢেউ আর হাওয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে জানে না। একটা রাত আসছে। আকাশে ছেঁড়া মেঘের আড়ালে ভাঙা চাঁদ। বাতাসে ভিজে ভাব। হাওয়াতে বৃষ্টি ঝড়ের সম্ভাবনা টের পাচ্ছি। এদিকে সমুদ্রের সেই ডহর যেন চাঁদের আলোয় শীতল আর নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দেয়। আর তারই মধ্যে নিশ্চিন্তে দুলছে স্নার্ক। সমুদ্র-নোঙর তুলে নিয়ে, পেছনের মিজেন পাল গুটিয়ে, শুধু মাস্তলের টুকরো পাল রেখে আমরা নিচে চলে গেলাম। যাবার আগে স্নার্ককে সোজা চালিয়ে দিলাম সামনে। না, গরম গরম খাবারের জন্য নিচে নামিনি। রাঁধুনি আর কেবিন-বয় মড়ার মতো বাঙ্কে পড়ে আছে। আমরাও যে-যার মতো পোশাক পরে তৈরি হয়েই বাঙ্কে শুয়ে পড়লাম। রান্নাঘরে হাঁটু পর্যন্ত জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ কানে ভেসে আসছে।

সানফ্রান্সিসকোর বোহেমিয়ান ক্লাবের সেই মাতাল জাহাজীদের কথা মনে পড়ছে। স্নার্ক তৈরি হবার সময় ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত আর কতরকমের উক্তি করত। তাদের সকলেরই একটা মাত্র বক্তব্য ছিল—স্নার্ক চলবে না। হেঁয়ালি করে আরও বলতো—স্নার্কের সব কিছু ভাল, কিন্তু ওর গোড়াতেই গলদ। কড়া হাওয়া আর সমুদ্রে ও ছুটতে পারবে না। কিন্তু আজ রাতে যদি ওদের সামনে পেতাম, তবে বলতাম—দেখে যাও, তোমাদের একমাত্র গুরুগম্ভীর, সর্বসম্মত রায় বেমালুম উলটে গেছে। স্নার্ক ছুটছে। ছুটবে না মানে? সমুদ্র-নোঙর সামনে রেখে, পেছনের মিজেন্ পাল পুরো সেঁটে ধরে তবু তো চলেছিল স্নার্ক। আর এখন, যখন বসে এটা লিখছি, স্নার্কের ছুটের ধাক্কায় আমরা সামনে উলটে পড়ছি ছ-নট্ গতিবেগের তোড়ে—উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য-বায়ুর মধ্যে। বেশ শান্ত সমুদ্রই পাশ কাটিয়ে ছুটছে। হালের চাকা ধরেনি কেউ, এমনকি চাকা বেঁধে রাখা অবধি হয়নি। আবহাওয়ার হালটা সামান্যই নড়েছে, তার মানে সংক্ষেপে, বাতাস সম্পূর্ণ অনুকূল অর্থাৎ তা উত্তরপূর্বই; স্নার্কের মিজেন্ পাল (পেছনের) গোটানো, প্রধান পাল ডান পাশে, আর স্নার্কের যাত্রাপথ দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব! অথচ তবু এমন নাবিক যাঁরা চল্লিশ বছর ধরে সাগর চষেছেন, তাঁরা বলবেন, এ সম্ভব

নয়। বিনা স্টিয়ারিং চালনায় কোনো জাহাজ সামনে ছুটতে পারে না। আমাকে তাঁরা মিথ্যেবাদী বলতে পারেন। ক্যাপ্টেন স্লোকাম যখন তাঁর 'স্প্রে' জাহাজ নিয়ে এ-কথাই বলেছিলেন তখনও বহু লোকে তাঁকে মিথ্যেবাদী বলেছে।

স্নার্কের ভবিষ্যৎ ভেবে আমরা কূলকিনারা পাই না। কী করব জানি না। যদি টাকাপয়সা পাই, ধার করতে পারি, তাহলে হয়তো আরেকটা স্নার্ক বানাব যা যথাযথ-ভাবে ঢেউয়ের মাথায় ঠেলে উঠবে। কিন্তু টাকা আমার ফুরিয়ে গেছে। এই স্নার্ককে আমরা ছেড়ে যেতে পারি না, যাবও না। অতএব, এখন থেকে হয়তো স্নার্কের পেছন দিকটাই আগে রেখে ঢেউয়ের ওপর ভেসে ওঠার অভ্যেস করতে হবে। পরবর্তী চড়া ঝোড়ো হাওয়াটার জন্য অপেক্ষা করছি, দেখব কেমন করে তা করা যেতে পারে। মনে হয় পারা যাবে। সব নির্ভর করে কেমন করে স্নার্কের স্টার্ন্ (পশ্চাৎভাগ) সমুদ্রের সঙ্গে বোঝাপড়া করে, তার ওপর। তারপর কে জানে—এই স্নার্ক নিয়ে যেদিন চীন সমুদ্রে পৌছবো, তখন, কোনো এক ভয়ঙ্কর সকালে, পাকা দাড়িওলা কোন এক জাহাজের ক্যাপ্টেন চোখ কচ্‌লে, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে এই ছোট্ট ভূতুড়ে জলযানটির দিকে—কী করে পেছন দিকটা আগে, উঁচু ঢেউয়ের ওপর তুলে হাওয়ার মুখে চলছে এটি?

পুনশ্চ: যাত্রাশেষে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে আমি একটা সংবাদ জানতে পারি। তা হল এই: জলরেখার বরাবর স্নার্কের লম্বাই মাপ ছিল তেতাল্লিশ ফুট। বর্ধিত করবার কথা অনুসারে পঁয়তাল্লিশ ফুট করাই হয়নি আদৌ। প্রস্তুতকারকের মাপবার ফিতের অভাবেই নাকি এই ত্রুটি ঘটেছিল!

তিন দুঃসাহসিক অভিযানের নেশা

অ্যাডভেঞ্চার যে কী বস্তু তা এবার একটু বলার সময় হয়েছে। সানফ্রান্সিসকো ছেড়ে রওনা হবার আগেই এত অসংখ্য চিঠি পেয়েছিলাম যা পড়ে শেষ করতে পারিনি। আমি আর চার্মিয়ান মিলে এখন সেগুলো ঘাঁটছি। আর ভাবছি অ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁক, বা নেশা, বা শখ কোনোটিরই অভাব নেই আমেরিকায়।

না, অ্যাডভেঞ্চার মরেনি—স্টীম ইঞ্জিন আর টমাস্ কুকের মতো ট্রাভেল এজেন্ট থাকতেও ব্যক্তিগত অভিযানের ঝোঁক কিছুমাত্র কমেনি এ দেশে। স্নার্কের অভিযান-পরিকল্পনা ঘোষিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে হাজার-হাজার লোক আবেদন জানিয়েছিল পৃথিবী

পরিক্রমায় শরিক হবার ইচ্ছা জানিয়ে। এদের মধ্যে বয়স্ক-বয়স্কারা তো আছেনই, আছে ভ্রমণের ঝোঁকওয়ালা যুবক, এমনকি তরুণীও। আমাদের বন্ধুদের মধ্যেই তো অন্তত ছ'জন আপসোস জানাল হঠাৎ বিয়ে করে বসেছে বা বিয়ে করতে যাচ্ছে বলে—না হলে তারা নিশ্চয়ই স্নার্কের পাড়িতে যোগ দিত।

'মানুষ-ঠাসা শহরে' নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, ছুটে বেরুতে মন চায়—এই হল মোটা-মুটি প্রত্যেকটা চিঠির বক্তব্য। না, অ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁক নিশ্চয়ই মরে যায়নি, বিশেষ করে এই ধরনের চিঠি পেলে তাই মনে হয়: "নিউ-ইয়র্ক শহরের মতো জায়গায় আমি এক আগন্তুক অচেনা মেয়ে। আমার হৃদয়ভাঙা আবেদন এই যে..." মাত্র নব্বই পাউণ্ড ওজনের পাতলাসাতলা মেয়ে, হতে চায় কেবিন-বয়, আর চায় "গোটা পৃথিবীর দেশ-গুলোকে ঘুরে ঘুরে দেখতে।"

কেউ-কেউ "ভূগোলের বিষয়ে তীব্র কৌতূহলী", কেউ বলে, "একটা প্রচণ্ড আবেগ যেন আমাকে তাড়া করে বেড়ায়, কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারি না।" কেউ সোজা-সুজিই লিখেছে, তার নাকি পা সুড়সুড় করে। দু-তিনজন ছাড়া বেশির ভাগ স্বেচ্ছা-ব্রতীরই যে সত্যিকারের আন্তরিকতা রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। অনেকে ছবি পাঠিয়েছে। শতকরা নব্বুইজনই জাহাজে যে কোনো ধরনের কাজ করতে রাজি, আর শতকরা নিরানব্বুইজন চায় বিনে মাইনেতে কাজ। "স্নার্কের যাত্রায় যতো বিপত্তিই আসুক, আপনাদের সঙ্গী হতে পারব এই আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা"—লিখেছে একজন।

স্নার্কের মতো ছোটো জাহাজে ঠিক কী কাজটি করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত ধারণা না থাকায় অনেকেই আবার বিভ্রান্ত। যেমন কেউ লিখেছে: "আমার দ্বারা কোন্ কাজ সম্ভব জানি না, তবে ছবি-টবি খুব আঁকতে পারি।" আবার বেশ কয়েকজন জানিয়েছেন, "বইপত্র উপন্যাস ইত্যাদি ফাইল করার কাজে সহকারী হতে পারি।" জ্যাক লণ্ডন যে লেখক, সে তো কারুর অজানা নেই!

"অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় যার রক্ত গরম হয়ে ওঠে না, সে একটা বাসন-পোঁছা জ্যান্ত নেকড়া ছাড়া আর কী!—বলেন আমার বিপ্লবী কাকা। আমি তাঁর অনাথ ভাইপো, এই আমার একমাত্র গুণের সুপারিশ।" "সাঁতার ভালো জানি না বটে, কিন্তু তাতে কী, জল আমার বন্ধু।" এ হল দু'জনের চিঠি। এর চেয়ে ভালো আরেকজনের যোগ্যতার বিবরণ: "জেলে-নৌকোর মাছ খালাস—এ তো আমার হরদম চোখে দেখা!" সুতরাং জাহাজ চালাতে আর বাকি রইল কী?

তারপর আছে এমন সব সরল, ঘরোয়া, সহজ মনের প্রকাশ, বেশির ভাগই প্রায়

বালক বা তরুণদের, যা নাকচ করে দিতে মন চায় না। এদের চিঠিগুলো বাতিল করতে গেলে মনে হয় যেন তারুণ্যের গালেই চাপড় মেরে বসলাম। এই ছেলেগুলো যেমন আন্তরিক, তেমনি নানান কাজ করবার জন্য প্রস্তুত! সতেরো বছর বয়েস, কোনো কাজে ভয় পাই না, পয়সার ধার ধারি না, শুধু একটাই কাম্য—সারা পৃথিবী ঘুরে দেখা। এই ধরনের সব চিঠি। চার্মিয়ান আর আমার মন খারাপ হয়ে গেল একটি তেরো বছরের ছেলেকে নাকচ করতে—সে বলেছে: "আমি ছোটখাটো মানুষ, জাহাজের কতোটুকুই বা জায়গা দখল করতে পারি? কিন্তু গায়ে গুণ্ডার মতো জোর।"

কিন্তু সবাই বালক বা তরুণ নয়। সব রকম স্তরের মানুষ, তাদের পেশা অবধি বিসর্জন দিয়ে যে-কোনো কাজের ভার নিয়ে অভিযানে যাবার জন্য তৈরি—ডাক্তার, সার্জন, দাঁতের ডাক্তার, ছাপাখানার কম্পোজিটর, কাগজের রিপোর্টার তো আছেই, অভিজ্ঞ বাবুর্চি খানসামা, এমনকি সিভিল ইঞ্জিনীয়রও আছেন এঁদের মধ্যে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শুধু নয়, যথেষ্ট রোজগার করেন এমন লোকও পাগল হয়ে উঠেছেন অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। বাপ ছেলে একসঙ্গে, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গেও জাহাজে কাজ করতে চেয়েছেন। কেউ লজ্জায় নিজের সব গুণের কথা খুলে বলেননি, কেউ আবার জাঁক করে নিজের গুণ বেশি গেয়েছেন—চিঠিগুলো ভালো করে পড়লেই এসব ধরা পড়ে যায়। আমার বউ চার্মিয়ানের সঙ্গিনী হবার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন অনেক মহিলা, আমার 'প্রাইভেট-সেক্রেটারি' পদপ্রার্থিনীর তো সীমাসংখ্যা নেই।

কেউ লিখেছেন—"আমার বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই আছে, মোটা মাইনের চাকরিও করি। কিন্তু এসব ত্যাগ করে আমি আপনার নাবিকদলে যোগ দিতে চাই।" কারুর মেজাজ আবার দেখার মতো—"দেখুন, একটা যেমন-তেমন সাধারণ জাহাজ বা স্কুনারে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ তাহলে সাধারণ টাইপের জাহাজী খালাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, ওরা সাফ-সুতরোভাবে জীবন কাটায় না!"

ঠিক আমারই মতো মানসিকতার অধিকারী যাঁরা, আমারই মতো রাজনীতিক মতামত যাঁদের, অনেক সময় এমন ধরনের লোকের চিঠি পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসি—বেশ বুঝতে পারি একটা বুদ্ধিগত আত্মীয়তাসূত্র—যা অস্বীকার করা শক্ত। তবে তাঁদের কেউ-কেউ আবার এই অভিযান সম্পর্কেই গুরুতর আপত্তি জানিয়েছেন। নমুনা: "সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে আর সমাজের শত-শত অত্যাচারিত মানুষের পক্ষ থেকে তোমার জীবন ও কাজের ওপর অধিকার বজায় রাখার দাবি জানানো হচ্ছে —এ অভিযান বন্ধ রাখো। তবে হ্যাঁ, এর পরেও গোঁয়ার্তুমি করে যদি ডুবে মর, তবে

শেষ ঢোঁক নোনাজল গেলবার আগে শুধু একবার স্মরণ কোর যে আমরা অন্তত প্রতিবাদ করেছিলাম।"

যখন বসে এটা লিখছি, চার্মিয়ান তার শোবার ঘরে টাইপরাইটার নিয়ে বসেছে, মার্টিন রাতের জন্য রান্নায় ব্যস্ত, তোচিগি টেবিল সাজাচ্ছে, রসকো আর বার্ট ডেকটাকে গোছগাছ করছে। আর স্নার্ক এখন ঘণ্টায় পাঁচ-নট্ বেগে একাই নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তরতরে সমুদ্রের ওপর দিয়ে।

"কাগজে আপনার অভিলষিত যাত্রার কথা পড়ে জানতে চাই, আপনি একদল ভালো নাবিক সঙ্গে নিতে রাজি কিনা—আমরা ছ'জন ছেলে, সবাই নৌসেনা আর সওদাগরী জাহাজ থেকে ছাড়া পেয়েছি, সবাই খাঁটি আমেরিকান, বয়েস কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে।"—ঠিক এই ধরনের চিঠিগুলোই আমার মনকে বিষণ্ণ করে, ভাবি আমাদের জাহাজটা আরো বড়ো হল না কেন।

একদিন যখন আমার অনেক টাকা হবে, একটা মস্ত জাহাজ বানাব, তাতে এক হাজার স্বেচ্ছাসেবীর জায়গা থাকবে। শর্ত থাকবে হয় জাহাজের পৃথিবী-পরিক্রমার সময় সমস্ত রকমের কাজ করতে হবে, নয়তো বিদেয় হয়ে বাড়ি বসে থাকো! আমার বিশ্বাস তারা সবাই খাটবে, কারণ আমি জানি অ্যাডভেঞ্চার মরে যায়নি। আমি যে 'অ্যাডভেঞ্চারে'র সঙ্গে অনেক দীর্ঘ, পরমঘনিষ্ঠ পত্রালাপ করেছি!

চার

পথ খুঁজে পাওয়া

এপ্রিলের ২৩ তারিখে আমরা সানফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট ছেড়েছি। সোজা নাক বরাবর রাস্তায় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এখান থেকে ২১০০ সমুদ্র-মাইল। নৌ-চালনা বিদ্যার একটা বড়ো অঙ্গ হল নেভিগেশন-জ্ঞান (দিক-নির্ণয় আর জাহাজের অবস্থান—যা অক্ষাংশ-দ্রাঘিমা জ্ঞাপক সেক্সটান্ট যন্ত্র আর মানচিত্রের সাহায্যে জানা যায়।) এ জ্ঞান আমাদের কারুরই তেমন ছিল না। তবু তো এখন ভেসে চলেছি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জেরই দিকে, আমাদের মতো আনাড়ি নাবিকদের পক্ষে যতটা সম্ভব দিক্‌ভ্রান্ত না হয়েই। বন্ধুরা আপত্তি জানিয়েছিল, "নেভিগেশনের তো কিছুই জানো না, তবু কোন্ সাহসে সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছ?" তা আমি যে নেভিগেশনের অ-আ-ক-খও জানি না স্বীকার করি। প্রথমে ঠিক ছিল, স্নার্ক ভেসে পড়বার আগেই সে বিদ্যা আমরা অর্জন করে

নেব। অন্তত তথ্যগতভাবে। আমার হাজারো কাজ। তাই রসকোকে ভার দেওয়া হল জাহাজ পরিচালনার। সে নেহাতই একজন ইয়টম্যান। তার ইয়ট চালানো সমুদ্রের তীর ঘেঁষেই। যাকে বলা হয় 'অকূল পাথার'—যেখানে চিহ্নজ্ঞাপক ডাঙার অস্তিত্ব নেই, মাথার ওপর একঘেয়ে গোল আকাশ, সেখানে কীভাবে জাহাজের অবস্থান আর সঠিক দিক্‌নির্ণয় করতে হয় সে অভিজ্ঞতা তো তার নেই। প্রথম ক'দিন স্নার্ককে পরিচালনার সময় সে কিছু ছদ্ম পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে লাগল বটে। আমিও হাঁ হয়ে গেলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম রসকোর কাছ থেকে আমরা একটু বেশি আশা করে বসেছিলাম। স্নার্কের স্বাভাবিক পাগলাটেপনার ওপরেও মাঝে-মাঝে এমন বেশি গরমিল নজরে পড়তে লাগল যা আমাদের কাছে হেঁয়ালির মতো। যেমন চব্বিশ ঘণ্টা একটানা ৬ নট্ বেগে ছুটেও পরে চার্ট অনুযায়ী দেখা গেল সে যৎসামান্যই সরেছে। সমুদ্র শান্ত, জাহাজের গতি তো নিজের চোখেই দেখছি, তবু গলদটা কোথায় হল? আসলে রসকো বইপত্র, যন্ত্র, সবকিছু জাহাজে যোগাড় করে রাখলেও তাদের ব্যবহার তো জানে না। অবশেষে আমার নিজেরই গোঁ চাপল, যেমন করে হোক্ এ-বিদ্যা আমাকেই খানিকটা আয়ত্ত করতে হবে। তাই অভিযান করলাম রসকোর রহস্য কক্ষে—টেবিল, চার্ট, মানচিত্র ছাড়াও সেক্সটাণ্ট যন্ত্রটা আমার চাই। শুধু সূর্য দেখে নয়, রাতের নক্ষত্রও অধ্যয়ন করতে হবে। দু'দিনের মধ্যে বই পড়ে, অভিজ্ঞতায় ও অভিজ্ঞ নাবিকদের চার্ট দেখে অক্ষাংশ দ্রাঘিমা, জাহাজের অবস্থান ইত্যাদি আমিও সড়গড় করে ফেললাম। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাতে বই নিয়ে অনেক মাপজোক হিসেব করে অবশেষে ধ্রুবতারা ছাড়াও আবিষ্কার করেছি দক্ষিণ গোলার্ধের তারামণ্ডলী 'সাদার্ন ক্রস'—অবাক হয়ে গিয়েছি ১৯° অক্ষাংশে এসে পড়েও এটুকু আমরা জানতেই পারিনি! নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস এল, গর্ববোধ হল। বুঝলাম দিক্‌নির্ণয় বিদ্যা আর নৌ-চালনা—দুটো আলাদা জিনিস। দ্বিতীয়টায় বহু বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, হেলাফেলার কথা নয়। কিন্তু প্রথম বিষয়টায় চলনসই বিদ্যা আয়ত্ত করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। আমাকে ভুল বুঝবেন না। বিশাল জাহাজ নিয়ে প্রচণ্ড ঝড়জল, মেঘলা আকাশের মধ্যে 'সঠিক' অবস্থান বুঝে ডাঙায় জাহাজ ভেড়ানো, এ সব কঠিন ব্যাপার নিঃসন্দেহে। তবে একটা ছোট পাল-তোলা নৌকো নিয়ে ধীরেসুস্থে (আমাদের তো তাড়া নেই) অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ মেপে, আকস্মিক ডাঙার আবির্ভাব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে যথাস্থানে পৌছনো কিছু অসম্ভব কাজ নয়। একটু-আধটু গোলমাল? ভুল? তা যে হবে না বা হয়নি এমন কথা বলব কোন্ মুখে। কিন্তু শুনুন আপনারা। সামান্য হিসেবের গণ্ডগোলে কী হয় বা হতে পারে। দুটি দিনের দুপুর বেলার হিসেব দিচ্ছি আমি।

১৬ই মে, বৃহস্পতিবার— ২০°৫৭´৯´´ উঃ (অক্ষরেখা)
১৫২°৪০´৩০´´ পঃ (দ্রাঘিমা)

১৭ই মে, শুক্রবার— ২১°১৫´৩৩´´ উঃ
১৫৪° ১২´— পঃ

দু'দিনের উপরোক্ত হিসেবে দূরত্বের পার্থক্য হয়ে গেল আশি মাইলের মতো! অথচ আমরা জানতাম কুড়ি মাইলের বেশি চলেইনি আমাদের জাহাজ। আসলে সূর্যের, নক্ষত্রের অবস্থান গণনায় সঠিক হিসেব চাই। এই সঠিক হিসেবে আমরা পটু নই। তা ছাড়া বিরাট বিরাট ঢেউগুলো আমাদের ছোট জলযানকে কখনও কখনও ঠেলে মাইলখানেক দূরে নিয়ে গেছে নির্দিষ্ট পথ থেকে। আসলে ১৯° উঃ অক্ষাংশে মে মাসের মাঝামাঝি সূর্য থাকে ৮৮/৮৯° দক্ষিণে হেলে, ঠিক মাথার ওপর তো নয়। সুতরাং সূর্যের হিসেবে সময় ধরলে আমাদের ঘড়ি থেকে তা ২৫ মিনিটের ব্যবধান তৈরি করে—যার মানে দ্রাঘিমারেখার হিসেবে ৬° ডিগ্রির মতো, অর্থাৎ বলা যায় পৃথিবীপৃষ্ঠে সেটা ৩৫০ মাইলের পার্থক্য।

সানফ্রান্সিসকো থেকে যাত্রা করবার ছাব্বিশদিন পর এক বিকেলে। দ্বিতীয় প্রহরের সময় চার্মিয়ান ও আমি 'ক্রিবেজ' তাস খেলা খেলছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল মেঘে ঢাকা চুড়োসহ এক পাহাড় সমুদ্র থেকে উঠে আছে। দেখে আমাদের খুব আনন্দ হল। অবশেষে ডাঙা দেখা গেল। কিন্তু জাহাজ চালানো এবং দিক সম্বন্ধে যতই ভুলভ্রান্তি করি না কেন—এটা ঠিক যে, ওই ডাঙা অন্তত একশো মাইল দূরে আছে। কিন্তু ডাঙা তো বটে। অস্তগামী সূর্যের শভ্রণ্ড আলোর সঙ্গে সঙ্গে ডাঙার দৃশ্য মিলিয়ে গেল। চার্ট ও ম্যাপ থেকে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম যে একশো মাইল দূরের ওই ডাঙা 'হালেয়াকালা'র চুড়ো। স্থানীয় ভাষায় এর অর্থ হল—সূর্যের বসতবাড়ি। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ 'মৃত' আগ্নেয়গিরি। সমুদ্র থেকে দশ হাজার ফুট উঁচুতে ওর চুড়ো। হ্যাঁ, একশো মাইল দূরেই আছে। কেননা, সারারাত সাত নট্ গতিবেগে চলেও সকাল বেলায় সেই হালেয়াকালা তখনও আমাদের চোখে দৃশ্যমান।

আরও কয়েক ঘণ্টা চলবার পর কয়েকটা দ্বীপ চোখে পড়ল। চার্ট দেখে অভিজ্ঞের মতো আমরা বললাম, 'এই হল মউই দ্বীপ। এর পরের দ্বীপটা মোলোকাই কুষ্ঠরোগীদের কলোনী। মোলোকাইয়ের পাশের দ্বীপটা—ওয়াহু। আমরা মাকাপ্‌পুর পথ ধরে এগোচ্ছি। কাল পৌঁছে যাব হনলুলু। না, আমাদের নৌ-চালনায় কোনো ত্রুটি নেই।'

পাঁচ

প্রথম ডাঙা দেখা

সমুদ্রযাত্রার প্রথম দিন থেকে সাতাশদিন পর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ওয়ালুর কাছাকাছি এলাম। খুব সকালে হনলুলুর পূর্ণ আকার আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর তারপরই যেন সমুদ্র সজীব হয়ে ধরা দিল আমাদের কাছে। গোল্ডেন গেট পার হবার পর সমুদ্র ছিল প্রাণহীন মরুভূমির মতো। ক্যালিফোর্নিয়ার পাহাড় দিগন্তে অদৃশ্য হল, দক্ষিণমুখোই চলেছি, সূর্য ক্রমেই প্রখর হচ্ছে, তবু একটা উড়ুক্কু মাছ, কি একটা ডলফিন বা বনিটো মাছ, কিছুই চোখে পড়েনি। সঙ্গীদের আমিই আশ্বাস দিয়েছিলাম, ঘাবড়িয়ো না, আলবৎ মিলবে উড়ুক্কু মাছ। তারপর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল ছেড়ে মেক্সিকো উপসাগর অবধি চলে এলাম, তবু কোনো জলজ প্রাণীর দেখা নেই।

আসলে. হাওয়াইয়ের দিকে যেতে হলে আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে চলার কথা। স্নার্কের মুখ তখন ঘোরানো দরকার পশ্চিমে, তবু আমি দক্ষিণমুখোই ছুটেছি। উদ্দেশ্য ছিল উড়ুক্কু মাছ। একেবারে ১৯° অক্ষাংশে এসে তবে প্রথম দেখলাম আমাদের প্রথম উড়ুক্কু মাছটিকে। ব্যস, দ্বিতীয় আর একটিও নেই! অন্য মাছ তো দূরের কথা। বার্ট মাঝে মাঝে সাহস করে জলে নেমেছে, হাঙরকে লোভ দেখাবার জন্য। কোথায় হাঙর? বার্ট বললে, 'হাঙর যদি থাকবে তো দেখা দেয় না কেন?' তারপর দেখুন প্রকৃতির খামখেয়ালি—দু'হাজার মাইল পাড়ি দিয়েও একটা হাঙর দেখলাম না, আর সেদিন বার্ট স্নান করে ওঠার পাঁচ মিনিটের মধ্যে জলের ঢেউ কেটে ছুটে চলেছে একটা হাঙরের ডানা! স্নার্কের চারপাশ দিয়ে চক্কর কাটছে। তাহলে এ-হাঙরটা হয়তো ভুল করেই কিছুক্ষণের জন্য নিষ্প্রাণ সমুদ্রে তাড়া করেছিল আমাদের? কিন্তু কেন ওটা এসেছিল? এর পরই আমরা ডাঙা দেখতে পেয়েছিলাম বলে রহস্যটা সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম—হাঙরটা খাবারের লোভে ডাঙার দিক থেকেই এসেছে। আমাদের অনুমান সত্য। ডাঙার অগ্রদূত হিসেবে ওটার আগমন হয়েছিল।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সমুদ্র আমাদের কাছে সজীব হয়ে ধরা দিল। উড়ুক্কু মাছেরা ঝাঁপাতে লাগল সর্বরকম উজ্জ্বলতা নিয়ে। অন্য প্রজাতির বড় বড় মাছও জল থেকে লাফিয়ে উঠছে বাতাসে। সমুদ্রে ও ডাঙায় জীবনের চিহ্ন। বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজের মাস্তুল নজরে পড়ল। ওয়াকিকির সমুদ্রতটে হোটেল ও স্নানার্থীদের আভাস দেখা যাচ্ছে। বাসভবনের চিমনির মাথায় ধোঁয়া। পেছনে 'পাঞ্চ বাউল'

আর 'ট্যান্টালাস্' আগ্নেয়গিরি। আমাদের দিকে ছুটে আসছে শুল্ক দপ্তরের টাগ্-বোট। স্নার্কের গলুইয়ের নিচে একদল শুশুক জড়ো হয়ে হাস্যকরভাবে নাচছে। বন্দরের ডাক্তারের লঞ্চও এগিয়ে আসছে আমাদের লক্ষ্য করে। বিশালকায় একটা সামুদ্রিক কাছিম জল থেকে মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জীবনের উদ্দামতা, উচ্ছ্বাস ঘিরে ধরল আমাদের। অচেনা মুখ, অজানা কণ্ঠস্বরে ভরে উঠল স্নার্কের ডেক। সেদিন সকালেরই খবরের কাগজ ও সারা পৃথিবী থেকে পাঠানো টেলিগ্রাম-রিপোর্ট আমাদের চোখের ওপর তুলে ধরা হল। আমরা জানতে পারলাম—"স্নার্ক ও তার যাত্রীদের সলিল সমাধি হয়েছে ; এমনিতেও স্নার্ক নাকি ছিল একটা অপদার্থ জাহাজ।" এদিকে তখন আমাদের উপস্থিতিতেই হালেয়াকালার অধিবাসীদের বেতার-বার্তা পাঠিয়ে জানানো হচ্ছে—'স্নার্ক নিরাপদেই এসে পৌঁছেছে।'

সাতাশদিন প্রাণবর্জিত অথৈ সমুদ্রের পরে প্রথম ডাঙা! পৃথিবীতে এত রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আছে—বিশ্বাস করতেও যেন মন চায় না। একদিকে নীল সমুদ্র সুনীল আকাশে মিলেছে, অন্যদিকে সেই সমুদ্রেরই পান্নাসবুজ তরঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ছে শ্বেতশুভ্র প্রবাল সৈকতে। সৈকত পেরিয়ে ধাপে ধাপে উঠে গেছে বাতাসে-আন্দোলিত সবুজ আখের ক্ষেত। ক্রান্তীয় বৃষ্টিধারায় সিক্ত। মৃত আগ্নেয়গিরির চূড়োয় বাণিজ্যবায়ু-তাড়িত বিশাল পুঞ্জীভূত মেঘের মুকুট। এ যেন এক সুন্দর স্বপ্ন দেখছি আমরা।

স্নার্কের ঘোরানো মুখ সবুজ ফেনিল ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলল বন্দরের দিকে। একটা বিপজ্জনক খাড়ি পার হয়ে আমরা স্থির শান্ত লেগুনে প্রবেশ করলাম। লেগুনের জলে কালো-কালো শিশুরা ঝাঁপাচ্ছে, চান করছে। গাঢ়নীল সমুদ্রকে আর দেখা যাচ্ছে না। কোনো বাধাবিপত্তি না ঘটিয়েই সুস্থিরভাবে নোঙর করল স্নার্ক। সবটাই এমন আশ্চর্য সুন্দর যে বাস্তব বলে বিশ্বাস হয় না। চার্টে এই জায়গার নাম পার্ল হারবার। আমরা এর নাম দিলাম স্বপ্নের বন্দর—ড্রীম হারবার।

একটা লঞ্চ এগিয়ে এল। এতে রয়েছে হাওয়াইয়ান ইয়ট্ ক্লাবের সদস্যরা। ওরা আসছে আমাদের স্বাগত আর অভ্যর্থনা জানাতে। পুরোপুরি হাওয়াইসুলভ কায়দায় যতোটা তাদের পক্ষে সম্ভব। এরা সাধারণ রক্তমাংসেরই মানুষ। মানুষ সম্পর্কে আমাদের শেষ ধারণা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের সেই মার্শাল আর ভয়-কাতুরে ক্ষুদে ব্যবসাদারগুলোকে ঘিরে, ডলার যাদের জানপ্রাণ, যারা আমাদের অভিযানের পথে কাঁটা দেবার উদ্দেশ্যে নোংরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এগিয়ে আসা এই মানুষদের সম্বর্ধনায় ডলারের লোভের বিন্দুমাত্র ছায়াপাত নেই।' ওরা পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যবান মানুষ।

আমাদের স্বপ্নকেই ওরা সজীব করে দিতে এসেছে।

ওদের সঙ্গেই আমরা আশ্চর্য সুন্দর সবুজ দ্বীপে পা রাখলাম। একটা ছোট্ট জেটিতে পদার্পণ করতে আমাদের স্বপ্ন আরো যেন সাকার হয়ে উঠল। জানেনই তো দীর্ঘ সাতাশদিন ধরে ক্ষুদে স্নার্কে আমরা অনবরত সাগরের দোলাই খেয়েছি—এই সাতাশ-দিনে এতটুকু বিশ্রাম হয়নি কারোরই। ক্রমাগত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত একটানা নড়াচড়া আমাদের দেহমনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এতদিনের এই দোলানি আর পাক-খাওয়া আমাদের মস্তিষ্কে এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে ছোট জেটিতে উঠেও মনে হতে লাগল—আমরা কেবলই দুলছি। অভ্যস্ত মানসিকতার ঘোরে দুলে দুলে জেটি থেকে জলে পড়ে যাবার অবস্থা। আর ভাবছি জেটিটাই দুলছে। ক্ষুদে জেটিটাও অবশ্য যে-কোনো ডেকের মতোই দুলছে, ডুবছে, ঝাঁকুনি দিচ্ছে। জেটিতে কোনো রেলিঙ না থাকায় আমি আর চার্মিয়ান প্রাণপণে নিজেদের সামলাচ্ছি পাছে জলে পড়ে যাই। মনটাকে যখনই দৃঢ় করে তাকাই, দেখি জেটি আর নড়ছে না, অন্যদিকে মন যেতেই আবার সেই স্নার্কের দুর্দশা—এই বুঝি ডুবে মরলাম!

অবশেষে যারা আমাদের নিতে এসেছে তাদেরই সহায়তায় জেটির মোকাবিলা করে শেষ পর্যন্ত জমিতে পদার্পণ করলাম। কিন্তু জমিও যে সুখকর নয়। প্রথমেই যা দেখলাম—ভূখণ্ড যেন এক দিকে কাত হয়ে গেল। যতদূর চোখ যায় দেখি কাত হয়েই যাচ্ছে একেবারে আগ্নেয়গিরির শৈলশির অবধি। দেখলাম ওপরের মেঘগুলোও কাত হয়ে গেল। মাটি নিশ্চয় শক্ত ঘাস-মাটি নয়, তাই এমন খেল দেখাচ্ছে?

এ কি আমার মাথাঘোরাজনিত ভুল দেখার ফল? স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে? নাকি খারাপ কিছু খেয়ে ফেলেছি? চার্মিয়ানের দিকে তাকালাম। রসকোর পাশে চলতে চলতে সেও দেখি টলে পড়ছে, দেখলে কষ্ট হয়। জমির এই অদ্ভুত ব্যবহার সম্পর্কে সেও দেখি অভিযোগ করল।

এর পর সুন্দর পামগাছের সারিপথ ধরে আমরা একটা চমৎকার প্রশস্ত লন্ পেরিয়ে আরো অপরূপ ঘাসে-মোড়া সবুজ উদ্যানের মধ্যে এসে পড়ি। সেখানে বিচিত্র বড়-বড় গাছের শ্যামল ছায়া। বাতাসে ভেসে আসছে পাখির গান। লিলি, হিবিস্-কাসের মত বিরাট উজ্জ্বল ক্রান্তীয় ফুলের সুগন্ধ। চার্মিয়ান হঠাৎই হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। ভাবলাম—এই অপূর্ব সৌন্দর্য যেন বিহ্বল করেছে ওকে। কিন্তু তা নয়। ওকে ধরতেই ফুল আর ঘাসে ভরা মাঠ আমার চোখের সামনে দুলে উঠল। একটা ভূমিকম্পেরই মতো, তবে দ্রুত কাঁপুনি দিয়েই বন্ধ হয়ে গেল। মাটির এই আজব খেলা ধরতে পারা রীতিমতোই কষ্টকর ব্যাপার। মনস্থির করে রাখলে সবই স্থির, শান্ত।

আর যখনই একটু অন্যমনস্ক হই, চারপাশের দৃশ্য যেন বেঁকা হয়ে কাত হয়ে দুলতে থাকে। পেছন দিকে হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে দেখি পামগাছের দোদুল নাচ, কিন্তু দৃষ্টি স্থির করতেই তারা আগের মতোই শান্ত, অচঞ্চল। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল শান্ত স্নিগ্ধ একটা বাড়িতে। বিরাট চওড়া বারান্দা, দরজা জানলা খোলা, ফুলের সৌরভ আর পাখির গানের অবাধ যাওয়া-আসা। ঘরের দেয়াল টাপা-গাছের বল্কলে ছাওয়া। কৌচগুলো ঘাসের মাদুরে ঢাকা। ঘরে মস্ত একটা পিয়ানো। জাপানী পরিচারিকারা দেশী পোশাকে প্রজাপতির মতো নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরের ভেতর স্নিগ্ধ শীতল। প্রখর ক্রান্তীয় সূর্যের উত্তাপ ভেতরে প্রবেশ করছে না। কিছুই যেন সত্য বলে বিশ্বাস হয় না। আমি এখনও কিন্তু এটাকে অবাস্তব স্বপ্নের পুরী বলেই মনে করছি। তা জানি, কারণ চোখ ফেরাতেই দেখি পিয়ানোটা ঘরের কোণে নাচতে শুরু করেছে। কিছু বললাম না, কারণ এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন শ্বেতবসনা এক রমণী। মহিমময়ী সুন্দরী মাতৃমূর্তি। এমন ভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন উনি, যেন সারা জীবন ধরেই আমাদের চেনেন।

নানা রকম অজানা-অচেনা খাদ্য ও পানীয় দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করা হল। আবার হঠাৎই আমার শুরু হল সেই ভূকম্পের অনুভূতি। আমাদের অতিথিপরায়ণা মহিলাটিকে নিয়ে চেয়ার টেবিল বারান্দা ফুলগাছ সব যেন উঁচুতে উঠে চোখের সামনে সমুদ্র-ঢেউয়ের মধ্যে কাত হয়ে পড়ছে। সম্বিৎ আনবার জন্য চেয়ার-টেবিল আঁকড়ে ধরে রইলাম আমি। যেন আবার সেই স্নার্কের আলোড়ন, সমুদ্রের উথালপাথাল। তবু আড়চোখে সেই মহিলা আর তাঁর স্বামীর দিকে তাকাই—কই, তাঁরা তো চাঞ্চল্যের কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছেন না?

দেখলাম, বাসন-টাসন সবই ঠিকঠাক আছে, টেবিলে হিবিস্কাস ফুল, গাছ আর ঘাস যথাস্থানেই আছে। মহিলাটি জানতে চাইলেন, আমার একটু বরফ-দেওয়া চা লাগবে কি না। আমি হ্যাঁ বলতে-বলতেই ভদ্রমহিলার দিকের টেবিল যেন ৪৫ ডিগ্রি কোণে নিচে নেমে গেল! ওঁর স্বামী হাঙর সম্পর্কে একটা কাহিনী শুরু করেছিলেন। তাঁকেও আমি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ উঁচুতে দেখতে পাচ্ছি। যাক, এ ভাবেই আমাদের আহারপর্ব চলতে থাকে। অবশ্য চার্মিয়ানকে কষ্টসহকারে হাঁটতে হচ্ছে না দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম। এই সময় কানে এল এক রহস্যময় শব্দ 'রিপোর্টার'। কাগজের রিপোর্টার এসেছেন তিনজন। ওঁদের দেখতে পেলাম লন পেরিয়ে হেঁটে আসছেন। আহা! তাহলে আমাদের স্বপ্ন সত্যিই বাস্তব হল! বেঁচে থাক রিপোর্টারেরা। ওই তো স্নার্ক নোঙর করে বসেছে, সানফ্রান্সিসকো থেকে পাড়ি দিয়ে হাওয়াই এসেছি আর

এটা হল পার্ল হারবার—সবই তো দিব্যি মনে পড়ে যাচ্ছে। ওদের খাতিরে খুশি হয়ে রিপোর্টারদের প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলেও ফেললাম, 'হ্যাঁ, পুরো যাত্রায় আমরা খুব ভালোই আবহাওয়া পেয়েছি।'

ছয় একটি রাজসিক খেলার আকর্ষণে

ওয়াইকিকির সমুদ্রতটের বিশেষত্ব হল, অপার চিরন্তন সমুদ্র এখানে একেবারে পায়ের গোড়ায়—সৈকত থেকে পঞ্চাশ ফুট গেলেই মহাসমুদ্র। বিশাল ফেনিল ঢেউ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে তটে। আধ মাইল এগিয়েই এখানকার বালিয়াড়ি, যেখানে শান্ত সবুজ-নীল জল থেকে হঠাৎ উপছে উঠছে আকাশছোঁয়া সাদা মুকুটপরা উত্তাল ঢেউ—গড়িয়ে আসছে পাড় অবধি। মহাসাগরের এত কাছে সৈকতের কিনারায় বসে একটা শঙ্কার ভাব জাগে মনে, নিজেকে বড়ো ছোট মনে হয়।

অথচ এরই মধ্যে আচমকা দেখি কোনো মানুষের কালো মাথা ঢেউ থেকে জাগল। কালো শরীর নিয়ে দ্রুত ছুটে এল সামনে—তারপর দেখি দীর্ঘদেহী ঋজু গড়নের একটি মানুষ ঢেউয়ের সঙ্গে পাড়াপাড়ি না করেই প্রশান্ত মূর্তিতে তরঙ্গের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে—অচঞ্চল 'মার্কারি' দেবতার মতো। এ হল এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা, কানাকা। ধীরস্থিরভাবে হেঁটে আসছে সৈকতের দিকে। ভয়ের জায়গায় এবার আমার মনে জাগে বিস্ময়। এই কানাকারাই এখানকার মানুষ, দেবতা, দৈত্য, যারা প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করে। আমার একটু লজ্জা হয়। ভাবি, তুমিও তো রাজার জাত, যাও না, ওই কালো রাজার মতোই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড় দেখি! লড়াই কর ঢেউয়ের সঙ্গে, কেরামতি দেখাও তোমার ডানার, পায়ের গোড়ালির—লড়ো রাজার মতো! একটা ছোট কাঠের তক্তার ওপর মাঝ-সমুদ্রে খাড়া হয়ে দাঁড়াও দেখি!

ওই কানাকাকে দেখেই প্রথম আমার এল 'সার্ফরাইডিং' শেখার প্রেরণা। এ খেলাকে আমি 'রাজসিক' খেলা বলে মনে করি। সার্ফরাইডিং জিনিসটা ডাঙার পাড় থেকে সমুদ্রের দিকে নয়, বরং তার উল্টো—ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সমুদ্র থেকে ডাঙায় পাড়ি দিয়ে আসার খেলা। দারুণ উত্তেজনাময় আর বিপজ্জনক।

খেলাটি এই রকম: ছ ফুট লম্বা একটা কাঠের চ্যাপ্টা তক্তা চাই, যাকে বলে সার্ফবোর্ড। তক্তার আকারটা হবে লম্বাটে উপবৃত্তের মতো, চওড়া হবে ফুট

দুয়েক। শুরু করার সময় ওর ওপর খেলোয়াড়কে উবুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। হাত-পাগুলো দুপাশে জলে ডুবিয়ে প্যাডেল করতে হবে—ঠিক যখন ঢেউগুলোকে দেখা যাবে উঁচু হয়ে উঠছে তখনি এভাবে কাটতে হবে সাঁতার। তারপর স্থির হয়ে ভাসমান থাকো তক্তার ওপর। আশপাশ, মাথার ওপর দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে এগিয়ে যাক পাড়ের দিকে, তুমি কিন্তু পেছনেই পড়ে থাকবে। এ হল খেলার প্রথম ভাগ, তারপর যা তা আপনাদের একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।

বড়ো একটা ঢেউ যখন সমুদ্রের জলে জাগবে তখন মনে করুন খেলোয়াড় তক্তার সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে। ঢেউ তো সামনে ছুটে যাচ্ছে, খেলোয়াড় কিন্তু এ সময় আসলে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ার মতো পেছনেই গড়িয়ে আসছে—একই জায়গায় স্থাণু থেকে। রহস্যটা এইখানেই। আসলে ঢেউ সরে গেলেও তক্তার নিচের জলটা রয়ে যাবে স্থির, ঢেউয়ের পেছনে গড়িয়ে পড়লেও খেলোয়াড় থাকবে ভাসমান। পাঠকেরা হয়তো লক্ষ্য করে দেখেছেন, সমুদ্রের বুকে হাজার হাজার ঢেউ খেলে গেলেও কোনো বিশেষ জায়গার জল কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওঠা-নামা করে। কোনো ভাসমান বস্তুকেও তার ওপর স্থাণুই দেখা যায়। আসলে ঢেউটাই নড়ে, যে-জল দিয়ে ঢেউটা তৈরি তা কিন্তু নড়ে না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এই সূত্রটাই সার্ফরাইডিংএর ক্ষেত্রে কাজ করছে। এ হল খেলার শুরুর পর্যায়।

এখন আপনি বলবেন, 'তাহলে খেলোয়াড় পাড়ের দিকে এগোবে কী করে? এগোতেই যদি না পারল, তাহলে এ আবার একটা খেলা নাকি?' জবাবে বলি, এখানেও প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্র কাজ করছে। এটা সত্যি যে ঢেউয়ের মধ্যেকার জল কখনো সামনের দিকে ছুটে যায় না। আবার এটাও সত্যি যে সমুদ্রের 'ঠেলা' বলে একটা জিনিস আছে। জল তরল বস্তু, তাই জলের ওপরের অংশ ধাক্কা খেয়ে চল্‌কে পড়ে সামনেই। তখন কি হয়, ঢেউয়ের তলার অংশের আলোড়ন সমুদ্র-পাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে-উঠতে খানিকটা গিয়ে থেমে যায়। অথচ ঢেউয়ের তলার অংশ রুখে গেলেও ওপরের চুড়োর অংশ চল্‌কে সামনেই গড়িয়ে যেতে থাকে। ফলে ঢেউয়ের মাথা আর তলার অংশের মধ্যে ফাঁকা বায়ুরন্ধ্রের সৃষ্টি হয়। আর প্রাকৃতিক নিয়মেই ওপরের সচল ঢেউ মাধ্যাকর্ষণ বলে হুড়মুড় করে নিচে নেমে আসে—সৃষ্টি হয় তরঙ্গভঙ্গের। এই তরঙ্গের মাথায়ই এবার খেলোয়াড়কে লাফিয়ে উঠতে হবে—ঠিক যে-মুহূর্তে ঢেউ ভাঙতে শুরু করেছে। তরঙ্গভঙ্গের ঝুঁটি চেপেই তাকে বসে থাকতে হবে যতোক্ষণ না পুরো রাস্তাটা ঢেউ ভাঙতে-ভাঙতে অবশেষে পাড়ে গিয়ে পৌঁছয়। বিশেষ করে এই ওয়াইকিকির সমুদ্র সৈকতে পাড়ের ঢাল মন্থরভাবে ঢালু হয়ে উঠে গেছে প্রায় সওয়া মাইলটাক জায়গা

নিয়ে। পাড়ের কাছে এমন সুন্দরভাবে ঢালু, যার ফলে সার্ফ-চড়ার উপযুক্ত ফেনিল সার্ফ-ঢেউ এখানে অবিরত সৃষ্টি হচ্ছে। অপর্যাপ্ত পরিমাণে। এক কথায় অতি চমৎকার।

তাই বলি, সার্ফবোর্ডে চড়া নেহাতই নির্ঝঞ্ঝাটে ঢেউয়ের পাহাড় থেকে গড়িয়ে ভাসমান থাকা নয়। আসলে ফেনিল তরঙ্গের মাথায় চড়ার চেষ্টা মানে দৈত্যের হাতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ডাঙায় আছড়ে পড়ার মতো। আমি অবশ্য প্রথমে সবটুকু বুঝিনি, বা জানতামও না। মনে শখ জাগতেই একটা তক্তা যোগাড় করে ফেলি। সেটা যে আমার পক্ষে অতি খুদে—কেউ তা বলেও দেয়নি। অগভীর জলে কতকগুলো কানাকা বাচ্ছাকাচ্ছার সঙ্গে যোগ দিই খেলায়। ফলে যা হবার তাই হল। একটা বড়ো ঢেউ আসতেই কোথায় ছুটে গেল তক্তা! ওদের নকল করে হাত-পা ছুঁড়েও কাজ হল না। অথচ ওই বাচ্চা শয়তানগুলো দিব্যি ঢেউয়ের মাথায় চড়ে পা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে এগিয়ে চলে গেল। আমি বেকুব বনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পুরো এক ঘণ্টা চেষ্টা করেও একটি বড়ো ঢেউকে বাগাতে পারলাম না যা আমাকে পাড় অবধি উজিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর পেলাম এক বন্ধুর দেখা।

আলেকজাণ্ডার হিউম ফোর্ড একজন পেশাদার ভূপর্যটক। অস্ট্রেলিয়ার পথে যাবার সময় ওয়াইকিকিতে নেমেছিলেন এক হপ্তার জন্য। অবশেষে এখানে সার্ফ-রাইডিং খেলার মধ্যে প্রভূত উত্তেজনার খোরাক পেয়ে এক মাস থেকে গেছেন। আর এক মাসের প্রত্যেকটি দিনই দারুণ উৎসাহে খেলায় মেতে আছেন। এ খেলায় তাঁর মতামতের মূল্য অসীম।

আমাকে প্রথমেই বললেন হিউম, 'ওই তক্তাটা ছাড়ুন তো! ওর নাকের দিকটা জলের তলায় পড়লে আপনি বিলকুল উল্টে পড়ে যাবেন যে! নিন, আমার এই প্রমাণ সাইজের বোর্ডখানা নিন।' তারপর আমাকে ওঁর তক্তায় চড়িয়ে ভালোমতো একটা ঢেউ আসতে দেখে জোর ধাক্কা মেরে আমাকে পেছন থেকে তুলে দিলেন ঢেউয়ের ওপর। এই হল আমার শিক্ষার শুরু। দেড়শো ফুট উজিয়ে চলে এলাম। তারপর আমায় পায় কে? ওঁর তক্তাতেই আমার শিক্ষা চলতে লাগল। আধঘণ্টার মধ্যে আমি শিখে গেলাম কীভাবে 'স্টার্ট' দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় ঢেউয়ের মাথায়। অনেকবার করে দেখালাম হিউমকে, তিনিও খুশি হয়ে আমার পিঠ চাপড়ালেন। এক-আধবার যে বিপদ ঘটেনি তা নয়। একবার তো পাড়ে উঠতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে কোনো মহিলা স্নানার্থিনীকে জানেই মেরে দিয়েছিলাম আর কি! ভাগ্যে সময়মতো তাঁকে এবং নিজেকেও বাঁচিয়ে-ছিলাম। যাহোক কসরতগুলো এক এক করে রপ্ত করা তো হল। এবার হিউম বললেন, 'কাল থেকে যাওয়া যাবে মাঝদরিয়ায়, কী বলেন?' সমুদ্রের ওই বড়ো ঢেউগুলোর

কাছে এখানকার এই ছোট-ছোট ঢেউ তো নেহাত বাচ্চা। তবু বলি, 'ঠিক আছে, যাব।'

তাই হল, পরদিন সকালে ফোর্ড আর আমি মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। তক্তার ওপর পেট চেপে উবুড় হয়ে সাঁতার কেটে বেরুলাম কানাকা বাচ্চাদের সেই ছোট হাঁটু-সমান জলের জায়গা ছেড়ে। ঢেউ ভেঙে ভেঙে সাঁতার কেটে এগুবার মধ্যেই কতো যে শিক্ষা আর লড়াইয়ের আনন্দ পেলাম তা বলা দুঃসাধ্য। হ্যাঁ শিখলাম বটে—প্রকাণ্ড ফেনিল ঢেউয়ের মোকাবিলা করা, সতর্কভাবে তক্তা আঁকড়ে রাখা, সময়মতো ঝপ্ করে বিশাল ঢেউকে ফাঁকি দিয়ে জলে নেমে পড়া। সর্বোপরি শিখলাম এ খেলায় নিজেকে কীভাবে ঢেউয়ের হাতে সঁপে দিতে হয়—যেটা সবচেয়ে বড়ো কৌশল, আর আত্মরক্ষার উপায়ও; কখনো ডুব দাও, কখনো চড়ে বসো, কখনো পাশ কাটাও। কখনো শক্ত হবে না, বাধা দেবে না, গা ছেড়ে দেবে পুরোপুরি—কারণ প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে শারীরিক লড়তে গেলে তোমাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না! ঢেউয়ের সঙ্গে সাঁতার কাটবে, তার বিরুদ্ধে নয়—এই হল মূলনীতি।

বোঝা গেল, এ খেলা নরম শরীরের জন্য নয়। ভালো সাঁতারু হতে হবে। আর ব্যবহার করতে হবে সাধারণ বুদ্ধি। অন্যের উপর একেবারে ভরসা করবে না। কারণ হিউম বা অন্য বন্ধু কানাকাদেরও সাধ্য হয়নি বিপদমুহূর্তে যথাস্থানে হাজির থাকার—তা করা সম্ভবও নয়।

আজ মাত্র দু'দিন হল সার্ফরাইডিং খেলার। বেশ গর্বিত বোধ করছি এ দুদিনের সাফল্যে—এতটা কখনো ভাবতে পারিনি! ভেবেছিলাম পরদিন আবার খেলতে আসব, কিন্তু হাওয়াই-সূর্যের প্রখর উত্তাপে আমার পা দুটো পুড়ে গিয়েছিল। এর আগে অনেকবারই আমার পিঠের, কাঁধের, হাতের চামড়া রোদ্দুরে ঝলসে গেছে। কিন্তু এবার গেল পা আর হাঁটুর চামড়া। এ ধরনের পুড়ে-যাওয়া প্রথমে শুধু উষ্ণতাবোধ জাগায়, কিন্তু তারপরেই জ্বলন শুরু হয়ে ফোস্কা পড়তে থাকে। আমারও সেই অবস্থা হল। আমি হাঁটতে পারছিলাম না। অগত্যা পুরো চব্বিশ ঘণ্টা শুয়েই রইলাম বিছানায়।

সাত — মোলোকাই দ্বীপের বাসিন্দারা

অবশেষে হনলুলুর পথে মোলোকাই দ্বীপের পাড় ঘেঁষে যাত্রা শুরু হল স্নার্কের। চার্টে দেখি দ্বীপটাকে বলা হয়েছে 'অভিশপ্ত দ্বীপ'। কুষ্ঠরোগীর উপনিবেশ। সাধারণ

হাওয়াইবাসীদের কাছ থেকে এই মানুষদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় এই দ্বীপে। অথচ ওখানে পৌঁছবার আগে কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি যে একমাস বাদে এই 'অভিশপ্ত' দ্বীপ থেকেই কতো আনন্দ কুড়িয়ে নিয়ে আসতে পারব !

একটা নমুনা দিই। মোলোকাই পৌঁছে আমরা কুষ্ঠরোগীদের ৪ঠা জুলাইয়ের খেলাধূলার উৎসবে (স্বাধীনতা দিবস) যোগ দিয়েছিলাম। কলোনীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডাক্তারদের এড়িয়ে গিয়ে আমি প্রতিযোগিতার 'দড়ি-ছোঁয়ার' দৃশ্যগুলো ক্যামেরায় ধরে রাখতে প্রয়াস পেলাম। প্রতিযোগিতাটা হল মজার। প্রতিযোগীদের সমর্থকদের উৎসাহও বিপুল।

প্রথমে আসরে নামল তিনটি ঘোড়া। একটিতে একজন চীনা, আর একটিতে একজন হাওয়াইবাসী এবং শেষেরটিতে একজন পর্তুগীজ বালক সওয়ার হয়েছে। তিন প্রতি-যোগী, বিচারক ও দর্শকের সকলেই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত (সুপার, ডাক্তার, কয়েকজন কর্মী ও আমরা বাদে)। প্রতিযোগিতার জন্য দৌড়ের মাঠটিকে দু'বার চক্কর দিতে হবে প্রতিযোগীদের। দৌড় শুরু হল। দেখা গেল চীনা ও হাওয়াইবাসী গলায় গলায় ছুটছে। পর্তুগীজ বালকটি ওদের চেয়ে দুশো ফুট পিছিয়ে।

প্রথম চক্করে এই অবস্থাই চলল। দ্বিতীয় চক্করের মধ্যপথে চীনা প্রতিযোগী এগিয়ে গেল হাওয়াইবাসীকে পেছনে ফেলে। পর্তুগীজ বালকটি চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর ভরসা আছে বলে মনে হয় না। দর্শকেরা উত্তেজনায় পাগল হয়ে গেল। দর্শকের সঙ্গেও আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। পর্তুগীজ বালকটি এবার ছাড়িয়ে গেল হাওয়াইবাসীকে। মাঠে শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ। তিনটি ঘোড়াই এবার কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে ছুটছে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরেই চলেছে সওয়ারেরা। দর্শকেরা ফেটে পড়ছে উল্লাসে। ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগিয়ে গেল পর্তুগীজ বালক। চীনা প্রতিযোগীকেও ছাড়িয়ে গেল সে। একদল কুষ্ঠরোগীর মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ওরা চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে, নাচছে, বাতাসে টুপি ছুঁড়ছে। অবাক হয়ে গেলাম আমিও ওদের মতই টুপি নাচাচ্ছি আর চেঁচাচ্ছি—'জিতে গেল, ছেলেটা জিতেই গেল দেখছি, কী তাজ্জব ব্যাপার !'

নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করলাম আমি। আরে, আমি তো মোলোকাইয়ের বীভৎস রূপ দেখতে এসেছি। এ অবস্থায়, আমার এই হাল্কা আচরণে নিজেরই লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমি নিজেকে মিথ্যেই রোখার চেষ্টা করছি। কারণ এর পরের দৌড়-প্রতিযোগিতাটা আরও মজার। গাধার দৌড়। এই দৌড়ের নিয়ম—শেষে যে পৌঁছাবে, সে-ই হবে বিজয়ী। প্রতিযোগীরা কিন্তু নিজের গাধায় চাপতে পারবে না। ব্যাপারটা খুবই কঠিন। অন্যের গাধার পিঠে চেপে দৌড়োনো একটা সংগ্রাম। খুব

মন্থর ও বিচ্ছিরিভাবে চেঁচাতে-পারা গাধারাই এই দৌড়ের যোগ্য প্রতিযোগী। একটা গাধাকে তার মালিক শিখিয়ে দিয়েছে আরোহী তার পেটে গুঁতো মারলেই সে শুয়ে পড়বে। কতকগুলো গাধা আবার কিছুটা দৌড়েই পেছন ফিরে পালিয়ে আসতে থাকবে। কিংবা চুপ করে পাশে সরে দাঁড়িয়ে থাকবে রেলিঙে গা ঘেঁষে। সবগুলোকেই অবশ্য অযথা সময় নষ্ট করতে শেখানো হয়েছে।

দৌড় শুরু হতে অর্ধপথেই পিঠের সওয়ারির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকল একটি গাধা। দৌড়ের মাঠের দর্শকেরা প্রতিবাদী গাধা এবং আরোহীদের কাণ্ড-কারখানা দেখে হেসেই কুটিপাটি। আমারও সেই অবস্থা। শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ-জানানো গাধাটাই জিতে গেল। গাধাসহ সব আরোহীরা যখন সীমানায় পৌঁছে গেছে, তখনও সেই গাধাটা মাঠে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছিল। আরোহীটিকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছে সে। গাধাটা ও তার আরোহীর ব্যাপার দেখে হাজার খানেক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত দর্শক হেসে একেবারে গড়াগড়ি। আমিও বাদ যাই কেমন করে!

মোলোকাইকে যেভাবে দুঃস্বপ্নের দ্বীপ বলে বর্ণনা করা হয়, সত্যি সত্যি তা নয় মোটেই। এই বর্ণনা যারা অতীতে করেছে এবং এখনও করে, তারা স্বচক্ষে এদের উপনিবেশটি দেখেইনি। অবশ্য কুষ্ঠরোগকে খুব নরমভাবে দেখলেও হবে না। রোগটি ভয়ঙ্কর। কিন্তু মোলোকাই দ্বীপের কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত বাসিন্দারা ও তাদের সেবায় উৎসর্গীকৃত মানুষদের প্রতি সুবিচার মোটেই করা হয়নি। একটি ঘটনা বলি। এক সাংবাদিক, যে জীবনে কখনো এই কলোনীর ধারেকাছেও আসেনি, সংবাদপত্রে এক চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিয়ে বসল। কলোনীর সুপার মিস্টার ম্যাকভে নাকি তাঁর ঘাসের কুটিরে বসে থাকেন আর কুষ্ঠরোগীরা খিদের জ্বালায় তাঁকে ঘিরে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। এই চুল-খাড়া-করা বিবরণ সেই সংবাদপত্র থেকে অন্যান্য সংবাদপত্রও খবর হিসেবে গ্রহণ করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রগুলো গরম-গরম সম্পাদকীয়ের বন্যা বইয়ে দিল।

অথচ, শুনে রাখুন, মিঃ ম্যাক্‌ভের ঘাসের কুটিরটা আসলে একটি কাঠের তৈরি বাংলো এবং সমস্ত দ্বীপে একটিও ঘাসের তৈরি কুটির নেই। সেখানে আমি পাঁচ রাত্তির কাটিয়েছি। হ্যাঁ, কুষ্ঠরোগীদের তথাকথিত কান্নাকাটি আমিও শুনেছি। তবে সেই কান্নাকাটির সঙ্গে আশ্চর্য সুন্দর সুরেলা আর ছন্দবদ্ধ কণ্ঠের স্বর জড়িত। এই ছন্দিত ও সুরযুক্ত কণ্ঠস্বরকে আরো প্রাণবন্ত করেছে গীটার, উকুলেলে ও ব্যাঞ্জোর মতো বাদ্যযন্ত্র। কান্নাকাটি বলতে নানারকম সুসংবদ্ধ ব্যাণ্ড বাদনের সঙ্গে দুটি সঙ্গীত সম্প্রদায়ের গান। সর্বশেষে পঞ্চ গায়ক ও পঞ্চ-যন্ত্রের অপূর্ব সুরেলা ঐকতান। যখনই মিঃ ম্যাক্‌ভে হনলুলু

থেকে কোনো কাজ সেরে ফিরে আসেন, তখন এই প্রমোদ-ক্লাব নৈশ-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করে তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। এই হল প্রকৃত চিত্র।

কুষ্ঠরোগ কিন্তু তেমন ছোঁয়াচে নয়, যেমনভাবে লোকে ধারণা করে আসছে। এক সপ্তাহ ওই কুষ্ঠরোগীদের উপনিবেশে ছিলাম আমি। সঙ্গে আমার স্ত্রীও ছিলেন। আমাদেরও যদি এমন ধারণা থাকত যে এই রোগ ছোঁয়াচে এবং আমাদেরও হতে পারে, তবে কখনই সেখানে যেতাম না। সংস্পর্শ বাঁচাতে লম্বা-লম্বা দস্তানাও আমরা পরিনি। বরং নির্বিবাদে ও নির্দ্বিধায় ওদের সকলের সঙ্গে মিশেছি। দ্বীপ ছাড়বার আগে অনেককেই নাম ধরে ডেকেছি আমি—পরিচয় হয়েছিল এত গভীর। সাবধানতা? হ্যাঁ, তা নিতে হবে বইকি। সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই ছিল আমাদের সাবধানতা। দ্বীপের ডাক্তার, সুপার ও অন্যান্য কর্মীরা, যাদের কুষ্ঠরোগ নেই—তারাও বাড়ি ফিরে অ্যান্টিসেপটিক সাবানে হাত মুখ ধুয়ে নেয়। বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে পরিষ্কার পোশাক পরে।

অবশ্যই অপরিচ্ছন্ন ভবঘুরে কুষ্ঠরোগীকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেই হবে। কিন্তু একথা মানতেই হবে অতীতকাল থেকে কুষ্ঠরোগীদের যে নজরে দেখা হয়েছে এবং হয়ে আসছে—তা নির্দয়তারই পরিচায়ক। কুষ্ঠরোগী সম্পর্কে বাজে ধারণার অবসানের জন্য আমি কিছু বলব—রোগী ও নীরোগ সম্পর্কে। এই মোলোকাই দ্বীপের অভিজ্ঞতাই বলব।

মোলোকাই দ্বীপে আসবার পর প্রথম সকালে চার্মিয়ান ও আমি যোগ দিয়েছিলাম কালাউপাপা রাইফেল ক্লাবের অনুষ্ঠানে। একটা রাইফেল প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। বিজেতা পাবে একটি কাপ—যা ম্যাকভের উদ্যোগে ও অর্থে আনা হয়েছে হনলুলু থেকে। ম্যাকভে ও দুই ডাক্তার গুডহিউ এবং হলম্যান—সকলেই রাইফেল ক্লাবের সদস্য। (প্রসঙ্গত জানাই, দুই ডাক্তারই সস্ত্রীক থাকেন এই উপনিবেশে।) শুটিং বুথে একটা বন্দুক থেকেই আমরা—কুষ্ঠরোগাক্রান্ত এবং যারা আক্রান্ত নয়—সকলেই গুলি ছুঁড়েছি। ছোট্ট জায়গাটিতে প্রতিযোগীরা কাঁধে কাঁধ হাতে হাত মিলিয়েছে সর্বক্ষণ। বিকেলে আমরা দ্বীপের সর্বোচ্চ পাহাড় 'পালি'তে উঠে দেখেছি—নিচে ম্যাকভে, তার নীরোগ সহকর্মীরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে মহা উৎসাহে বেস্-বল খেলছেন।

মধ্যযুগে ইউরোপে কুষ্ঠরোগকে কী ভয়ঙ্করভাবেই না দেখা হত। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হলেই সে ব্যক্তি সমাজের চোখে গণ্য হত মৃত বলে। জীবিত অবস্থাতেই তার শবযাত্রা হত। সেই অবস্থায় গীর্জায় নিয়ে গেলে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করত ধর্মযাজক। তারপর এক বেলচা মাটি তার বুকের ওপর রাখা হত এবং এর সঙ্গেই ঘোষণা করা হত যে সে মৃত। এভাবে জীবিত থেকেই সে গণ্য হত মৃত বলে। অবশ্য ইউরোপে

কুষ্ঠরোগীদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে একটা মস্ত বড় উপকার হয়েছিল। ক্রুসেডারদের দ্বারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনীত এ-রোগের সংক্রামতা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান হয়েছিল। রোগীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে ইউরোপ থেকে কুষ্ঠরোগ নির্মূল হয়ে যায়। সেকালে রোগীদের প্রতি নির্দয় ব্যবহারের প্রত্যক্ষ ঘটনা ঘটলেও, এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে প্রত্যক্ষ সংযোগে কুষ্ঠরোগ সংক্রামিত হতে পারে। অতএব বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানও লাভ করা যায়। এভাবেই সেখানে কুষ্ঠরোগের অবসান ঘটে।

একইভাবে হাওয়াই দ্বীপেও কুষ্ঠরোগ এখন নির্মূল হবার পথে। কিন্তু মোলোকাই দ্বীপের রোগীদের বিচ্ছিন্নকরণ তাই বলে সংবাদপত্রের ভাষার মতো 'ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন' নয় যেমন করে "হলুদ-সংবাদপত্রের" সাংবাদিকরা একে ফলাও করে বর্ণনা করেন। প্রথমত, এই অঞ্চলে রোগীদের জোর-জবরদস্তি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকে স্বাস্থ্য-দপ্তরে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। তার যাবতীয় খরচ বহন করে দপ্তর। জীবাণুবিদেরা পরীক্ষার পর যদি নিশ্চিত হন যে তার শরীরে 'ব্যাসিলাস লেপার' আছে তবে পাঁচ ডাক্তারের এক পরীক্ষাকারী বোর্ড স্বাস্থ্যদপ্তরের সমর্থন পেলে তাকে মোলোকাই যাবার আদেশ দেয়। কিন্তু 'আদেশ' মাত্রেই নিষ্ঠুর আদেশ নয়। মোলোকাই যাবার আগে রোগক্রান্ত ব্যক্তিকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় যাতে সে তার ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক সব বন্দোবস্ত সুষ্ঠুভাবে করে যেতে পারে। মোলোকাই দ্বীপে তার সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন বা ব্যবসা-স্বার্থের কোন ব্যক্তি দেখা করতে পারে অবাধে। তবে তার সঙ্গে খাওয়া এবং রাত্রিবাস নিষিদ্ধ। এর জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অতিথি-নিবাস আছে।

কুষ্ঠরোগ ধরা পড়ার পরেই তড়িঘড়ি রোগীকে মোলোকাইতে পাঠানো হয় না। মাঝখানে সে কালিহি নামে একটা জায়গায় বেশ কিছুদিন কাটিয়ে যেতেও পারে। মোলোকাইয়ের মতো এখানেও তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ আছে। মোলোকাই দ্বীপের কোনো রোগী যদি ইচ্ছে করে যে তাকে আবার পরীক্ষা করা হোক, তা হলে তার হনলুলুতে ফিরে আসতে কোন বাধা নেই। যে স্টিমারে আমি ওই দ্বীপে যাই, সেই একই স্টিমারে হনলুলু থেকে ফিরে আসছিল কয়েকজন যুবক যুবতী রোগী। এদের একজন গিয়েছিল কিছু বৈষয়িক কাজ করতে। অসুস্থ মাকে দেখে এল আর একজন। এরা দুজনেই প্রায় মাসখানেক কালিহিতে কাটিয়ে স্বেচ্ছায় ফিরে যাচ্ছিল মোলোকাই।

হনলুলু থেকে মোলোকাইয়ের আবহাওয়া অনেক ভাল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এক কথায় অপূর্ব। পালি-পাহাড়ের উপত্যকায় চড়ে বেড়ায় অসংখ্য ঘোড়া।

এগুলো রোগীদেরই সম্পত্তি। কয়েকজনের মালবাহী গাড়ি, মাছ ধরার জালও আছে। কালাউপাপার ক্ষুদে বন্দরে মাছ ধরবার নৌকো ও স্টীম লঞ্চও আছে যা রোগীদেরই নিজস্ব। একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা করতে তাদের কোনো বাধা নেই। সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে স্বাস্থ্যদপ্তরকে নগদমূল্যে বিক্রি করতে পারে তারা। আমি থাকতে থাকতেই একদিনের মাছ ধরার পরিমাণ দেখেছিলাম—চার হাজার পাউণ্ড। এদের মধ্যে ভাল ভাল কর্মী আছে যারা স্বাস্থ্যদপ্তরে বা অন্যান্য ব্যবসায়ে থেকে নানা কাজ করে। বেশ ভালই রোজগার করে। একজন রং মিস্ত্রিকে দেখেছিলাম, তার আছে আটজন কর্মী, সে আবার কালাউপাপা রাইফেল ক্লাবের সদস্য আর তার পোশাক আমার থেকে ভাল। ম্যাক্‌ভের সহকারী ওয়াইমাউ একজন হাওয়াইদেশীয় কুষ্ঠরোগী। খুব শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তি। বার্টলেট নামে একজন মার্কিনী রোগী আছে যে স্টোরকীপারের কাজ করত হনলুলুতে, পরে রোগাক্রান্ত হয়। কাজ করে রোজগার করে এমন লোক যেমন আছে, তেমনি কাজ না করেও যারা আছে—দু'পক্ষকেই চিকিৎসা, আহার, আশ্রয়ের ব্যাপারে একই দৃষ্টিতে দেখা হয়। এই দ্বীপে গবাদিপশু পালনের খামার আছে। এখানে যারা কাজ করে, বোর্ড থেকে তাদের মাইনে দেওয়া হয়। কিন্তু অক্ষম, দুর্বল ও পঙ্গুদের কোনমতেই অবহেলা করা হয় না।

সদ্য নির্মিত স্টিমচালিত ধোবিখানার প্রধান কর্মী মেজর লী। ইনি সুস্থ অবস্থায় মেরিন ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে কাজ করতেন। মিস্টার লীর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হত। একদিন তিনি বললেন, 'আমরা কীভাবে আছি দেখেই গেলেন। ঈশ্বরের দিব্যি, আমাদের সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখুন। দুঃস্বপ্নের দ্বীপ বলে যারা আখ্যা দেয় তাদের মিথ্যা গুঁড়িয়ে দিন। পৃথিবীকে জানিয়ে দিন সত্যি সত্যি কীভাবে আছি আমরা। আমাদের বিকৃতভাবে দেখানো হয়, এ আমরা চাই না।'

উপনিবেশের সমস্ত মানুষ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই একই কথা বলেছে আমাকে। এখানকার প্রায় হাজার অধিবাসী দুটি গ্রামে থাকে। ছটি গির্জা, একটি ইয়ংম্যানস ক্রীশ্চান অ্যাসোসিয়েশন, কয়েকটি মিলন কেন্দ্র, ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাঠ, বেস্‌বল মাঠ, চাঁদমারির মাঠ, খেলাধূলার সংঘ, প্রমোদ সংগীতের ক্লাব এবং দুটি ব্যাণ্ডবাদক দল আছে এই মোলোকাই দ্বীপে। মিস্টার পিঙ্কহ্যাম আমাকে জানিয়েছিলেন, 'এরা সবাই এত সুখী যে তাড়িয়ে দিলেও যেতে চাইবে না।'

পরবর্তী কালে এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে দেখেছি। গত জানুয়ারি মাসে এগারোজন সেরে-ওঠা রোগীকে হনলুলু পাঠানো হয়েছিল পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষান্তে তাদের পুনর্বাসনের কথা বলতেই তারা একবাক্যে জানায় তাদের মোলোকাই দ্বীপেই

ফেরত পাঠাতে হবে। এক বৃদ্ধ মার্কিনী নিগ্রো রোগী বড়ো ঝামেলা করত। একবার পরীক্ষায় পাওয়া গেল যে সে সুস্থ। ম্যাক্‌ভে খুব খুশি। ওকে ফেরত পাঠালে তাঁর অনেক সময় বেঁচে যায়। কিন্তু নিগ্রোটি এক কাঠি ওপর দিয়ে যায়। চট করে এক কুষ্ঠরোগিনীকে বিয়ে করে ফেলল সে। রোগিনীটির সেরে ওঠবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বিয়ে করেই সে স্বাস্থ্য দপ্তরে আবেদন জানালো—"রুগ্না স্ত্রীকে সেবা করবার জন্য আমার এখানে থাকা একান্ত দরকার।" কিন্তু, একরকম জোর করেই তাকে হনলুলু-গামী স্টীমারে চাপিয়ে দেওয়া হয়। স্টীমার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে পালি পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। তাকে ধরে এনে আবার জাহাজে চাপিয়ে হনলুলু পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হনলুলুতে সে বিষণ্ণ মনে জুতো পালিশের কাজ করতে থাকে। ম্যাক্‌ভে যখন হনলুলুতে যান, তাঁর জুতো পালিশ করতে আসে সেই নিগ্রোটিই। তারপর কান্না-ভরা গলায় বলে, 'বস্, আমাকে ওখানে ফিরে যেতে দাও। বড় চমৎকার ঘর ছিল আমার ওখানে। একটা ব্যবস্থা করতে পার না?'

মোলোকাই দ্বীপের রোগীরা সুখী। যাদের রোগ নেই তারাও সুখী। আমি বরং আমার জীবনের শেষ কটা দিন সেখানেই কাটিয়ে দিতে রাজি, সেরকম বাধ্য হলে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের যক্ষ্মা হাসপাতালগুলোতে, নিউইয়র্কের পূর্বাঞ্চলে বা চিকাগোর বন্দরে কিছুতেই জীবন কাটাতে পারব না। '৪ঠা জুলাই'-এর উৎসবের দিনটিকে আমরা কখনোই ভুলব না। সকাল ছটায় এইসব 'বীভৎস' মানুষগুলো মজাদার পোশাক পরে, ঘোড়া গাধা খচ্চরের (যেগুলোর মালিক ওরাই) পিঠে চেপে দ্বীপটাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দুটো ব্যাণ্ড-বাদক দল বেরিয়েছিল রাস্তায়, আর ছিল 'পা-উ' অশ্বারোহিনীরা। তিরিশ-চল্লিশজন হাওয়াইবাসী রমণী তাদের পৌরাণিক জমকালো পোশাকে সজ্জিত হয়ে, দল বেঁধে বা দু-তিনজন আলাদা হয়ে আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিকেলে বিচারপতির মঞ্চ থেকে আমি আর চার্মিয়ান 'পা-উ' মহিলাদের পুরস্কার দিলাম অশ্বারোহণ আর মজার-পোশাকের প্রতিযোগিতায় বিজয়স্বরূপ। চারদিক ঘিরে মাথায় গলায় ফুলের মালাপরা শত শত রোগী আনন্দ করছে, আসছে যাচ্ছে, ফুর্তি করছে। সে-সময় আমার মনে পড়ছিল হাভানার কুষ্ঠাবাসের কথা। দুশো রোগীকে সেখানে দেখেছিলাম আমি। কুষ্ঠাবাসটি একটি পাথরের দেয়ালঘেরা বন্দীনিবাস। একমাত্র মৃত্যুই এসে তাদের মুক্ত করতে পারত বন্দীদশা থেকে। তাই বলছি, অন্য হাজারটা জায়গার চেয়ে আমি বরং মোলোকাইকেই পছন্দ করব আমার স্থায়ী বসতি হিসেবে।

কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিত। একেবারে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ কুষ্ঠরোগীর জীবনে যে নিরাপত্তার অভাব, উপনিবেশে আলাদা করে রাখলে তার অনেক সুবিধা। প্রথম

কথাই হল শল্যচিকিৎসার সাহায্যে আক্রান্ত অঙ্গ প্রয়োজন হলে কেটে বাদ দেওয়া যায়, যার ফলে কুষ্ঠরোগী বেঁচে যায়—অনেক সময় স্বাভাবিক জীবনও উপভোগ করতে পারে। মোলোকাইতে এমন সার্জারী আমি অনেকগুলো দেখেছি। অন্তত রোগের পুনরাক্রমণ এতে বন্ধ হতে পারে।

কুষ্ঠরোগ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু আজও সঠিকভাবে ধরা যায়নি কীভাবে মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং এই রোগ কতটা ছোঁয়াচে। এক রোগীর দেহ থেকে অন্য সুস্থ লোকের দেহে কীভাবে তা সংক্রামিত হয় কেউ বলতে পারে না। রোগের টীকা প্রয়োগ করেও দেখা গেছে পশুদের মধ্যে এ রোগ প্রকাশ পায়নি। কুষ্ঠের জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়েও কোনো নিশ্চিত ফল লাভ হয়নি। চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা শুধু সক্ষম হয়েছেন এর জীবাণুকে চিহ্নিত করতে। কিন্তু কোনো কার্যকরী ওষুধ এখনো আবিষ্কার হয়নি যাতে কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ নির্মূল হয়।

সমস্ত তদন্ত থেকে শুধু একটাই বিষয় জানা গেছে—কুষ্ঠের আক্রমণ খুব ধীর গতিতে হয়। কিন্তু সংক্রমণটা হয় কীভাবে? এক অস্ট্রিয়ান চিকিৎসক ও তাঁর সহকর্মীরা নিজেদের শরীরে রোগের জীবাণু অনুপ্রবেশ করিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা সংক্রামিত হন-নি। অথচ এতেও কোনো নির্ভুল সিদ্ধান্ত হয় না, কারণ এক হাওয়াইবাসী ফাঁসির আসামীকে মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের লোভ দেখানো হয়েছিল এই পরীক্ষাটির জন্য তাকে রাজি করিয়ে। বীজাণু প্রয়োগের পর লোকটির শরীরে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ দেখা দেয় এবং মোলোকাই দ্বীপেই তার মৃত্যু হয়। এতেও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয় না, কারণ পরে জানা যায় লোকটির পরিবারবর্গের অনেকেরই এই রোগ ছিল। সম্ভবত তারও রোগটি ছিল সুপ্ত অবস্থায়। এবার ফাদার দামিয়েনের কথা শুনুন। এই উৎসর্গিতপ্রাণ মহান পাদ্রীটি সম্পূর্ণ সুস্থ ও নীরোগ অবস্থায় মোলোকাই দ্বীপে গিয়ে-ছিলেন। কিন্তু কুষ্ঠরোগে তাঁর মৃত্যু হয়। কেমন করে রোগটা তাঁর দেহে সংক্রামিত হল, তা কেউ ধরতে পারেননি, তিনি নিজেও নয়।

আজ পর্যন্ত কুষ্ঠরোগের রহস্য আবিষ্কৃত হয়নি। একদিন নিশ্চয় হবে। তখন যথার্থ ওষুধ আবিষ্কার হলে পৃথিবী থেকে নির্মূল হবে এই কুৎসিত ব্যাধি। এর ওপর আছে আর এক সমস্যা—এই রোগীদের চিহ্নিতকরণ ও জনসমাজ থেকে সুস্থ ও মানবিক পরিবেশে বিচ্ছিন্নকরণ। হাজার লক্ষ কুষ্ঠরোগী এশিয়া আফ্রিকার কোণে কোণে অসংগঠিতভাবে রাস্তায় ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীতে কার্নেগি, রকফেলারদের মতো বহু মানবহিতৈষী প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। তাঁরা কুষ্ঠরোগ নির্মূলীকরণে যথোচিত বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় অর্থ সাহায্য করতে অবশ্যই এগিয়ে আসবেন ভরসা করা যায়।

অন্তত পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করা খুবই জরুরি।

হে মানবহিতৈষী, আপনার অর্থের সার্থক ফল লাভ তো ঘটবে এই রকম কাজেই—আসুন, সমগ্র চিকিৎসাজগতের সঙ্গে একযোগে এই রোগকে পৃথিবীছাড়া করা যাক।

আট

হালেয়াকালা : সূর্যের আবাসভবন

প্রকৃতির বিস্ময় আর সৌন্দর্যের সন্ধানে, চমৎকার নিসর্গদৃশ্য আর সমুদ্রশোভার খোঁজে পৃথিবী ভ্রমণ করা বা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার মতো লোক তো পাওয়া যায় অসংখ্য। ভ্রমণবিলাসীদের দেখা যাবে ফ্লোরিডায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, পিরামিড দর্শনে, কানাডা ও আমেরিকার পর্বত চূড়া এবং পর্বত গহ্বর পরিদর্শন করতে। কিন্তু 'সূর্যের আবাসভবন' হালেয়াকালা পাহাড়ে যায় কজন? স্টিমারে গেলে সানফ্রান্সিস্কো থেকে হনলুলু ছ'দিনের পথ। যে দ্বীপে হালেয়াকালা অবস্থিত, সেই দ্বীপটির নাম মাউই। হনলুলু থেকে মাউই মাত্র একটি রাতের পাড়ি। আর ছ' ঘণ্টার পথ গেলেই হালেয়াকালার সূর্যের বাড়ির তোরণদ্বারের মতো দাঁড়িয়ে আছে কোলিকোলি। সমুদ্র থেকে দশ হাজার বত্রিশ ফুট উঁচু এই পাহাড়টি। অথচ ভ্রমণকারী এখানে আসে না। তাই হালেয়াকালা তার অদেখা সৌন্দর্যসম্ভার নিয়ে একাকী ঘুমোয়।

এ-ধরনের ট্যুরিস্ট নই বলেই হয়তো আমরা, স্নার্কের আরোহীরা, গিয়েছিলাম হালেয়াকালায়। এই দৈত্যাকৃতি পর্বতের নিম্নভূমিতে পঞ্চাশ হাজার একরের একটা র‍্যাঞ্চ আছে গবাদি পশুর। র‍্যাঞ্চটি দু হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। একটা রাত আমরা এখানেই কাটালাম।

পরদিন সকালে পর্বতারোহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম। সঙ্গে মালপত্র টানা ঘোড়া ও পথপ্রদর্শক হিসেবে কাউ-বয়েরা। 'উকুলেলে' পর্যন্ত আমরা উঠলাম সেদিন। সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে এই র‍্যাঞ্চ বাড়িটা। হাওয়াই ভাষায় নামটার অর্থ 'উড়ন্ত মাছি'। আবার এই একই নামে হাওয়াই এলাকার গীটারের মতো একটা বাদ্যযন্ত্রও আছে। আমার মনে হয় ওই গীটারের নামেই উকুলেলে নামটা। বেশ ভাল ঠাণ্ডা এখানে। রাতে গনগনে আগুনের চুল্লীর পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকতে হয়েছিল।

আমাদের তেমন কোনো তাড়া না থাকায় পরের দিনও ওখানেই কাটালাম

প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ, আবহাওয়া অনুধাবন, মুরগির ডিমের আকারের রাস্পবেরী ফল সংগ্রহ করে। ওপরের দিকে আরো সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচুতে দেখতে পাই হালেয়াকালার চুড়ো, তার লাভাগঠিত ঢাল বেয়ে ফসল খেত। আবার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি—যেন মেঘে-মেঘে প্রচণ্ড লড়াই চলছে সেখানে। এদিকে মাঝখানে আমরা কিন্তু উজ্জ্বল সূর্যালোকের মধ্যে।

দিনের পর দিন মেঘদের এই সমাপ্তিহীন লড়াই চলতেই থাকে। সমুদ্র থেকে উত্থিত বাণিজ্য বায়ু (দেশীয় নাম—উকিউকিউ) উত্তরপূব কোণ থেকে হালেয়াকালার ওপর আছড়ে পড়ে। হালেয়াকালা পাহাড়টা লম্বায়-চওড়ায় এতই বড় যে সেই বাণিজ্য বায়ু তার দু'পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে হালেয়াকালার আড়াল ঢাকা অংশে উত্তরপূর্ব বাণিজ্যবায়ু মোটেই বয় না। বরং তার মুখোমুখি উল্টোদিকেই একটা হাওয়া বইতে থাকে। এই বায়ুর দেশী নাম নাউলু। আর, দিনরাত দুই বায়ু উকিউকিউ ও নাউলুর মধ্যে আপ্রাণ লড়াই চলতেই থাকে। আকাশের একেকটি দিক থেকে ভেসে-আসা মেঘপুঞ্জ দেখলেই চোখে ধরা পড়ে এই অনন্ত বায়ু-সংঘাত। যেন দলে-দলে সৈন্যের আনাগোনা, আগুপিছু আক্রমণ, আলোড়ন আর পলায়ন—মেঘ সৈনিকদের এই নিরন্তর সংঘর্ষে কখনো উকিউকিউয়ের জিত, কখনো নাউলুর।

উকিউকিউ যদি মেঘের পর মেঘ দিয়ে হালেয়াকালার চুড়ো সাজায়, তবে তক্ষুনি নাউলু এসে তা ভেঙে দিয়ে যাবে। আবার নাউলু যদি এমনটা করল তো উকিউকিউ সেই সাজসজ্জা নষ্ট করে দেবে। অনন্তকাল ধরে চলছে এই খেলা। হালেয়াকালার পশ্চিম ঢালেই অবশ্য লড়াইটা সবচাইতে প্রবল হয়ে জমে। আসলে এটা স্থলবায়ু আর সমুদ্র-বায়ুর চিরন্তন যুদ্ধ—তাই সকাল থেকে সন্ধ্যে উকিউকিউর দাপট, আর রাতে শুরু হয় নাউলুর প্রতাপ।

পরদিন সকালে উঠে আমরা যাত্রা শুরু করি। আরো উঁচুতে আরোহন। তেরটি ঘোড়ায় চলেছে খাদ্য ও পানীয়। জল পাওয়া ওখানে বড় সমস্যা, বিশেষ করে আগ্নেয়-গিরি মুখ এলাকায়। ঘোড়াগুলো এমনভাবে উঠছে যেন দারুণ খাড়াইয়ের পথ চলাতে ওরা কতো অভ্যস্ত! সত্যি বলতে কি, আগ্নেয়গিরির লাভা দিয়ে তৈরি পাহাড়টির অসংখ্য খাত, উঁচু খাড়াই আর গভীর উৎরাই—সবই অতিক্রমে অত্যন্ত পটু এই ঘোড়াগুলো।

পর্বতারোহীরা জানেন, আশপাশে কোনো উঁচু পাহাড় না থাকলে একটা আশ্চর্য দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে পাহাড়ে ওঠার সময়। যতোই উঁচুতে ওঠা যায় চারপাশের ভূ-পৃষ্ঠ ততোই বেশি করে দৃষ্টিগোচর হয়। আর এর ফলে মনে হয় যেন দিগন্তটাও ক্রমেই

উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। মৃত আগ্নেয়গিরি এই হালেয়াকালা, সমুদ্র থেকে সরাসরিই জেগে উঠেছে। আশপাশে কোনো পাহাড়চূড়া বা শৈলশ্রেণী নেই। ফলে ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত মনে হতে থাকে চারপাশের সমুদ্র বুঝি আকাশে উঠে যাচ্ছে, আর আমরা নামছি একটা গভীর গর্তের মধ্যে। এমন কি যে-দিগন্তে গিয়ে সমুদ্র মিশেছে তাও আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় একটা বিশাল গর্তের কিনারা বলে। আর এ যেন সেই গর্তটা যেখান দিয়ে জুলে ভের্ন পৃথিবীর অন্তর্দেশে যাত্রা করেছিলেন !

অবশেষে সেই দৈত্যের চূড়োয় গিয়ে পৌছলাম আমরা। চুড়ো বলতে যেন একটা ওল্‌টানো শঙ্কু, ভয়াল মহাজাগতিক গর্তের মুখে বসানো। আমরা যেন নিচেও নেই, ওপরেও নেই। মাথার ওপর মহাকাশ ছোঁয়া দিগন্ত, আর পায়ের নিচে আগ্নেয়গিরির মুখের গভীর গহ্বর—"সূর্যের বসতবাড়ি"। আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর বা জ্বালামুখী তেইশ মাইল পরিধিতে বিস্তৃত। পশ্চিমের খাড়া দেয়ালের ওপর কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা। আধ মাইল নিচে জ্বালামুখীর মেঝে দেখা যাচ্ছে। এবড়োখেবড়ো লাভা প্রবাহ আর ছুঁচলো পোড়া অঙ্গারে কণ্টকিত মেঝেটা এমন তাজা লাল আর অটুট রয়েছে যে মনে হয় আগ্নেয়গিরির আগুন বুঝি সদ্য-সদ্য নিভেছে। দু জায়গায় ক্রেটারের কিনারা ভগ্ন হয়ে আছে। আর সেই দু হাজার ফুট গভীর ভগ্ন পথে উকিউকিউ বাতাস বৃথাই চেষ্টা করেছে মেঘেদের ঠেলে আনতে। আগ্নেয়গিরির ভেতর থেকে গরম হাওয়া মুহূর্তেই তাদের বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে।

এ এক বিপুল বিষণ্ণতার ছবি যা হতশ্রী, কঠোর, নিষেধের ভ্রূকুটিভরা, অথচ কুহকময়। ঝুঁকে দেখলাম আর একটি জায়গা—অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের মুখ। পৃথিবী সৃষ্টিলগ্নের সঙ্গেই প্রকৃতি যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল তার কামারশালার সামগ্রী, যা এখন আমাদের চোখের সামনে। প্রাচীনতম শিলার স্তম্ভশিরা তাই এখানে-ওখানে তার পেট ফুঁড়ে ঠেলে উঠেছে, সোজা উঠেছে গলিত ত্বকের গাদ ঠেলে—যেন এই সেদিন ঘটল ঘটনাটা। অপার্থিব, অবিশ্বাস্য !

এখান থেকে ওপরের দিকে তাকালে (প্রকৃতপক্ষে নিচের দিকে) উকিউকিউ ও ও নাউলুর মেঘের লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় আরো ওপরে সমুদ্রের মধ্যে যেন ঝুলে রয়েছে লানাই ও মোলোকাই দ্বীপ। ক্রেটার অতিক্রম করে দৃষ্টি ছড়ালে দেখা যাবে হাওয়াই দ্বীপের সমুদ্রসফেন তীরভূমির শ্বেত তটরেখা। আরো আশি মাইল দূরে রহস্যময় আকাশের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'মউনা কীয়া' আর 'মউনা লোয়া' —দুটি পাহাড়ের তুষারাবৃত চুড়ো। যেন মরীচিকার মতো কাঁপছে। দুটি পাহাড়কে কেন্দ্র করে রয়েছে স্থানীয় নানা পৌরাণিক কাহিনী। এই সব কাহিনীর সঙ্গে জড়িত

আছে এমন বাস্তবতা যা আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে বেশ খানিকটা মিলে যায়।

দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েছিলাম আমরা। তারপর ক্রেটারের কিনারা ধরে আরও আধ মাইল এগিয়ে ক্রেটারের মধ্যে অবতরণ শুরু করলাম। আড়াই হাজার ফুট নিচে ক্রেটারের সমতল আঙিনা। খাড়া-পথ ধরে, অগ্ন্যুৎপাতের ছাই মাড়িয়ে আমাদের অবতরণের পালা। ঘোড়াগুলোর পা হড়কে যাচ্ছে কিন্তু সামলে নিচ্ছে ঠিক। ঘোড়ার খুরের চাপে কালো ছাইয়ের আবরণ ভেঙে হলুদ গেরুয়া গুঁড়ো মাটি বেরুচ্ছে। ক্রেটারের দেয়াল খাড়াভাবে আকাশের দিকে উঠে গেছে। এদিকে শিলীভূত সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গের মধ্যে অসংখ্য লাভাপ্রবাহ ঠেলে এঁকেবেঁকে নামছি আমরা। গলিত লাভা জমাট হয়ে কত না বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর নক্শা বানিয়ে রেখেছে। সাত মাইল লম্বা শেষ-বারের মতো শুকিয়ে যাওয়া একটা লাভা স্রোতের মধ্য দিয়ে এখন আমরা এগোচ্ছি —তলহীন একটা গহ্বরের পাশ দিয়ে।

ক্রেটারের খানিকটা নিচের ধাপে, 'ওলাপা' আর 'কোলিয়া' গাছে ঘেরা একটা ঝোপের মধ্যে আমাদের ছাউনি বসানো হল। এখানে ঘোড়াদের জন্য অনেক প্রাকৃতিক খাদ্য মজুত। কিন্তু জল নেই। জলের খোঁজে আরও এক মাইল দীর্ঘ একটা লাভা-পথ ধরে এগুতে হল। সেখানে নাকি ক্রেটারের দেয়াল থেকে চুঁইয়ে-পড়া একটা জলধারা আছে। কিন্তু সে উৎসটাও শুকনো। তবে একটা ফাটল ধরে পঞ্চাশ ফুট ওপরে উঠে এবার একটা ছোট জলাশয় পাওয়া গেল। জল পান করবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ঘোড়াগুলোর মধ্যে। ছাউনিতে জল টেনে আনার সঙ্গে সঙ্গে আমদানি হল পালে পালে বুনো ছাগল। ফলে বেশ কিছু শিকারও করা গেল নৈশভোজের প্রয়োজনে।

চাঁদের আলোয় ছাউনিতে বসে আমরা রাত্রির আহার সেরে নিলাম। ক্যাম্পের আলোয় ক্রেটারের বন্য গবাদি পশুরা আকৃষ্ট হয়ে উকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল আমাদের, চ্যালেঞ্জও জানাল কেউ কেউ। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। এরা জলপান করে খুব সামান্যই, ভোরের শিশির-ভেজা ঘাসই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। রাত্রির প্রচুর শিশির আমাদের তাঁবু ভিজিয়ে দিয়ে উপকারই করল। তাঁবুর আরামদায়ক শয্যায় ভালই ঘুম হল আমাদের। ক্লান্তিহীন হাওয়াইবাসী 'কাউবয়'দের, দিশী হুলা-গানের একটানা সুর আমাদের চোখে ঘুম এনে দিয়েছিল।

এই ক্রেটার অভিযানের অনেক ছবিই তোলা হয়েছিল আমাদের ক্যামেরায়। কিন্তু দু'একটি ছাড়া অন্যগুলো সমগ্র দৃশ্যকে যথাযথ চোখের সামনে হাজির করতে পারেনি। বর্ণবৈচিত্র্য, ব্যাপকতা ভালোভাবে ক্যামেরায় ধরতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

এরপর আমরা ক্রেটারের দেয়াল বেয়ে একটু উঁচুতে উঠলাম। বুনো ছাগল মারবার চেষ্টা করা হল কিন্তু ও ব্যাপারে আমি সফল হইনি, আমি শুধু পাথরই খসিয়ে গিয়েছি। বিশেষ করে একটা জায়গায় মনে আছে একটা বড়োসড়ো পাথরের চাঁই আলগা করে দিয়েছিলাম। পাথরটা ছিল আস্ত ঘোড়ার সাইজের মতো। ওটা হড়কে যেতেই এখানে-সেখানে ধাক্কা খেতে খেতে অকূল গহ্বরে নেমে যাবার শব্দ শুনতে পেলাম। একসময় শব্দ আর শোনা গেল না। কেউ বলল পাথরটা গহ্বরের কোনো খাঁজে আটকে গেছে, আবার আমারই মতো কারুর কারুর ধারণা, না, ওটা অন্তবিহীনভাবে চলছে এবং চলবে। সেই রাতে বৃষ্টি হল। এমন প্রচণ্ড বৃষ্টি যে ক্রেটারে থাকা আর চলল না। ভোর সকালে তাঁবু গুটিয়ে আমরা একটা লাভা-ফাটলের পথ ধরে বেরিয়ে এলাম বাইরে। দিনের পর দিন পূর্ব মাউইয়ের চড়াই উৎরাই ভীতিজাগানো সরু পথ অতিক্রম করেও ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়নি। ওদের খাদ্য ওরা নিজেরাই যোগাড় করে নিয়েছে। অথচ এই কর্কশ লাভাখচিত পথে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরেই নাল লাগানো ছিল না। ওরা এতেই এত অভ্যস্ত যে মানুষ ও মালপত্রের বোঝা পিঠে করেও এ কদিনে তাদের খুর এতটুকু খয়ে যায়নি। এই জাতের ঘোড়া সত্যিই হালেয়াকালার নিজস্ব সম্পদ।

নয় তির্যক পথে মহাসাগর পাড়ি

"স্যাণ্ডুইচ দ্বীপ থেকে তাহিতি : উত্তরপূর্ব আর দক্ষিণপূর্ব, দুই বাণিজ্যবায়ু ডিঙিয়ে এই যাত্রাপথটি খুবই কষ্টকর। তিমি শিকারীরা ছাড়াও আরো অনেকে বলেছে— জাহাজে স্যাণ্ডুইচ থেকে তাহিতি যাওয়া আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ। ক্যাপ্টেন ক্রস্ বলেন, জলযানটিকে উত্তরমুখী রাখতে হবে যতোক্ষণ না অনুকূল বাতাস তাকে লক্ষ্যস্থলের দিকে ঠেলে দেয়। ১৮৩৭ সালের নভেম্বর মাসে একই পথে যাত্রা করতে গিয়ে ক্যাপ্টেন ক্রস্ বিষুবরেখার কাছে দক্ষিণে যাবার মতো কোনো 'বাণিজ্যবায়ু মধ্যবর্তী এলাকা'ই (ভেরিয়েবল্‌স্) খুঁজে পাননি। কোনো একটি বায়ুপথ ধরে যে পূব দিকে সরে আসবেন তেমন কোনো সুবিধাই পাননি তিনি, যদিও তাঁর চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না।"

দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরের নৌ-পথ নির্দেশমালায় উপরোক্ত মন্তব্য ও বর্ণনা করা

হয়েছে। এর বেশি আর একটিও শব্দ নেই যা দিয়ে কোনো নাবিক এই দীর্ঘ পথ পার হবার মতো সাহস পাবে। ঠিক এমনি আর একটি সমুদ্রপথ—হাওয়াই থেকে মার্কোয়েসাস দ্বীপপুঞ্জ যার অবস্থিতি তাহিতি থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে আরো আটশো মাইল। এই সমুদ্রপথের তো কোথাও কোনো নির্দেশই নেই। নির্দেশিকার অভাবের একমাত্র কারণ হলো কোন অভিযাত্রীই এই যাত্রাপথকে সহজ সরল বলে মেনে নেয়নি। অসম্ভব আখ্যা দিয়ে কেউ সে পথে যায়ওনি। কিন্তু অসম্ভব বললে তো স্নার্ককে রুখে রাখা যাবে না—বিশেষ করে যখন যাত্রা করবার আগে আমরা নির্দেশমালায় বর্ণিত অনুচ্ছেদটি পড়েই দেখিনি! জেনেছি আমাদের যাত্রা শুরু হয়ে যাবার পর।

হাওয়াই দ্বীপের হাইলো থেকে অক্টোবরের সাত তারিখে রওনা দিয়ে মার্কোয়েসাস্ দ্বীপে পৌছই ডিসেম্বরের ছ তারিখে। কাক যদি এ পথে একটানা সোজা উড়ে যায় তাহলে এর দূরত্ব হবে দু হাজার মাইল। কিন্তু মার্কোয়েসাস্ পৌছতে আমাদের চার হাজার মাইল ভ্রমণ করতে হয়েছিল। এই দূরত্ব, আমাদের পক্ষে, নাক-বরাবর পথ ধরলে পাঁচ কিংবা ছ হাজার মাইলও হতে পারত। অতএব এটা আমরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলাম যে, সোজা পথটাই সব সময় সংক্ষিপ্ততম পথ নয়।

একটা বিষয়ে আমরা স্থির সংকল্প নিয়েছিলাম—১৩০° পঃ দ্রাঘিমারেখার পশ্চিম ধার থেকে কিছুতেই নিরক্ষরেখা পেরুবো না (নিরক্ষরেখা পার হয়ে তবেই মার্কোয়েসাস্ দ্বীপে আসা যায়)। সমস্যাটা হল এই রকম। ওই লক্ষ্যবিন্দুর পশ্চিম ধার থেকে যদি নিরক্ষ বা বিষুব রেখা পার হই, আর দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্যবায়ুটা যদি সত্যিই দক্ষিণ-পূর্বে বইতে থাকে, তাহলে অচিরেই মার্কোয়েসাসের পশ্চাৎবর্তী এলাকার দিকে এতটা পেছিয়ে চলে আসব যে তখন দ্বীপের দিকে সামনেমুখো চলাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া,...এই কথাটিও মনে রাখতে হবে যে মধ্যপথে আছে নিরক্ষীয় স্রোত—যার গতি পশ্চিম দিকে, এবং গতিবেগ একদিনে বারো থেকে সাতাশ মাইল। ওই স্রোতে পেছিয়ে পড়লে তো আমাদের চলবেই না। যে ভাবেই হোক, ১৩০° দ্রাঘিমা-রেখার এক ইঞ্চি পশ্চিমপারে গিয়েও বিষুবরেখা ডিঙোনো চলবে না। এই দ্রাঘিমারেখা ধরেই বিষুবরেখার উত্তরে থেকে আমাদের এগোতে হবে পূব দিকে—যতোক্ষণ না আমরা দক্ষিণপূর্ব বাণিজ্যবায়ু ধরে অন্ততপক্ষে ১২৮° পশ্চিম দ্রাঘিমায় পৌছোই।

আমি একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি আপনাদের। আমাদের সেই অকেজো পঁচাত্তর অশ্বশক্তির ইঞ্জিনটির সঙ্গে এবার যোগ দিয়েছে একটি অসুস্থ লঞ্চ-ইঞ্জিনও। আলো পাখা ও পাম্প চালানোর জন্য যে পাঁচ অশ্বশক্তির ইঞ্জিনটা ছিল সেটাও এবার বিগড়ে যাবার দলে। অতএব তিনটি ইঞ্জিনের একটিও সচল নয়। একটা নতুন বই

লেখবার বাসনা হয় আমার। বইটার শিরোনাম হবে—"তিনটি গ্যাসোলিন ইঞ্জিন ও আমার স্ত্রীকে নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ"। বইটি লেখবার জন্য আমি তাড়না বোধ করি। কিন্তু না, লিখব না। ভয় হয় তাহলে সানফ্রান্সিস্‌কো, হনলুলু ও হাইলোর কয়েকটি যুবক আমার লেখনীর আঘাতে দুঃখ পেতে পারে। তারা তো ইঞ্জিন-বিদ্যা মক্‌শ করেছিল স্নার্কের ইঞ্জিনগুলোর ওপর দিয়েই।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম—কাগজে-কলমে অর্থাৎ চার্ট দেখলে সমুদ্রপথটা কত সরল মনে হয়। এই তো হাইলো, আর এই আমাদের গন্তব্যস্থল—১২৮° পশ্চিম দ্রাঘিমা। উত্তর-পূর্ব বাণিজ্যবায়ুকে নির্ভর করে দুই পয়েণ্টে একটা সরলরেখা অঙ্কিত করেই আমরা চলতে পারি। কিন্তু এই বায়ুগুলোর কোন মাথামুণ্ডু নেই। কেউ বলতে পারে না কোথায় এই বায়ুর নাগাল পাব আমরা এবং তা কোন দিকে নিয়ে যাবে আমাদের। হাইলো বন্দরের পোতাশ্রয় থেকেই আমরা উত্তর-পূর্ব বাণিজ্যবায়ুর নাগাল পেয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু হতভাগা বায়ু বইছিল আরো পুবের দিকে সরে গিয়ে। তার ওপর পড়লাম গিয়ে উত্তরের নিরক্ষীয় স্রোতে। এই স্রোত তখন বিশাল নদীর মতো প্রবলবেগে ধেয়ে চলেছে পশ্চিম দিকে। একটা ছোট্ট নৌকো এই বিপুল প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্য করে কী করে? হাপুসহুপুস করে ওঠানামা করতে লাগল ঢেউয়ের সঙ্গে তাল দিয়ে, কিন্তু এগোলো না কোনো দিকেই। পালগুলো পুরো টান-টান, পেছনের অংশ রেলিংসুদ্ধ ডুবে যাচ্ছিল হরদমই। এই সব সামুদ্রিক স্রোত আর বায়ুর টানে পড়ে ক্ষুদে স্নার্ক কেবলই দক্ষিণে যাবার ঝোঁক দেখায়, কিন্তু আসলে সে-মুখো যেতে পারে না। আবার তার পুব দিকে সরে যাবার গতিও বড়ো নৈরাশ্যজনক। যেমন ধরুন, ১১ই অক্টোবর তার পুব দিকের অগ্রগতি হল ৪০ মাইল; ১২ই অক্টোবর ১৫ মাইল; অক্টোবর ১৩ তারিখে কোনো অগ্রগতি হল না; ১৪ই অক্টোবর ৩০ মাইল; ১৫ই অক্টোবর ৩৩ মাইল; ১৬ই অক্টোবর মাত্র ১১ মাইল, আর ১৭ই অক্টোবর সে প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম দিকেই সরে এল ৪ মাইল। অর্থাৎ, এক সপ্তাহে মাত্র ১১৫ মাইল পুব দিকে সরলো স্নার্ক, মানে দিনে ১৬ মাইল করে পরে। কিন্তু হাইলো আর ১২৮° পঃ দ্রাঘিমার মধ্যে পার্থক্য হল ২৭° অথবা বলা যায়, প্রায় ১৬০০ মাইল। দিনে ১৬ মাইল করে এগোলে এ দূরত্ব অতিক্রম করতে লাগবে ১০০ দিন। কিন্তু এটুকুই তো শেষ কথা নয়। আমাদের আসল লক্ষ্যস্থল যে ১২৮° পঃ দ্রাঘিমার ওপর, তা নিরক্ষরেখা থেকে ৫° উত্তরে, আবার মার্কোয়েসাস দ্বীপের "নুকা হিভা" (যেখানে আমরা যাব) তা নিরক্ষরেখা থেকে আরো ৯° দক্ষিণে ও ১২° পশ্চিমে অবস্থান করছে! (মানচিত্র দেখুন)

আমাদের এখন একটাই কাজ রয়েছে করার মতো—বাণিজ্যবায়ুর ওপর নির্ভর করে দক্ষিণ দিকে যাবার প্রয়াস করা, আর দুই বাণিজ্যবায়ুর মধ্যবর্তী অঞ্চল (ভেরিয়েবল্‌স্) এর মধ্যে ঢুকে পড়া। ক্যাপ্টেন ক্রস্ হয়তো 'ভেরিয়েবল্‌সের' সন্ধান পাননি, কিন্তু আমাদের তা পেতেই হবে। এখানকার 'ভেরিয়েবল্‌স্' পড়েছে বাণিজ্যবায়ু আর শান্ত-বলয় (ডোলড্রাম)-এর মাঝখানে একটা সামুদ্রিক বন্ধনীর মতো। আর কোথায় তার হদিশ মিলবে···তা ভগবানই জানেন। অনবরতই তার জায়গা বদলায়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

'ভেরিয়েবল্‌স্' পেলাম আমরা ১১° উত্তর অক্ষাংশে। আর সেই ১১° অক্ষাংশেই জানপ্রাণ দিয়ে লেগে রইলাম। দক্ষিণে শান্ত-বলয়, উত্তরের বাণিজ্যবায়ু ফাঁকি দিচ্ছে, তাতে হাওয়া নেই—এই এল, হঠাৎ চলে গেল। কখনো আধঘণ্টা, কখনো তারও কম সময়। তবে ধৈর্য ধরে বসে থাকলে কি আর কিছু না ঘটে পারে? যেমন অক্টোবরের ২৬ তারিখে আচমকাই পুব দিকে এগিয়ে গেলাম ১০৩ মাইল! ধীরভাবে অপেক্ষা করতেই বা অসুবিধে কোথায়? যথেষ্ট খাদ্য আর পানীয় স্নার্কের ভাণ্ডারে মজুত।

এই তির্যক পথে কোন নৌ-চলাচল নেই, হয়নি বহু বছর ধরে। আমরা পড়ে রয়েছি প্রশান্ত মহাসাগরের এক অতি নিঃসঙ্গ অঞ্চলে। ষাট দিন আমাদের এই অবস্থায় থাকতে হল। একটা পাল বা স্টীমারের ধোঁয়া পর্যন্ত দিগন্তে দেখা যায়নি। এখানে হারিয়ে গেলেও কেউ আমাদের উদ্ধার করতে আসবে না। আমাদের উদ্ধারকারী হতে পারে স্নার্কের মতোই কোন দুঃসাহসী অথচ নৌপথ নির্দেশমালা পড়েনি এমন কোন নৌকো। স্নার্ককে কেন্দ্র করে সমুদ্রের শুধু সাত মাইল পরিধি আমাদের নজরে পড়ছে। সব সময়ই কেন্দ্রে আছি আর ক্রমাগতই কোনো দিকে ভেসে চলেছি, তাই আমাদের নজর সীমাবদ্ধ একেকটা বৃত্তের মধ্যেই। সব বৃত্তেরই এক চেহারা—না কোনো ঘাস ভরা দ্বীপ, না তীরভূমি, একঘেয়ে একটানা দৃশ্য। কোনো নৌকার সাদা পালও নজরে পড়ে না। দৃশ্যমান এই সাত মাইলের একেকটা বলয়ের একপাশ থেকে মেঘ উঠছে। আবার অন্য দিকে নেমে যাচ্ছে।

পৃথিবীর সমস্ত স্মৃতি যেন আমাদের কাছে লুপ্ত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ পার হয়ে যাচ্ছে। বিশাল সমুদ্রে সাতজন আরোহীকে অবলম্বন করে স্নার্ক যেন এক ভিন্ন পৃথিবী গড়ছে। পুরনো পৃথিবীর স্মৃতি আমাদের কাছে স্বপ্নবৎ। কবে কোথায় আমরা জন্ম-গ্রহণ করেছিলাম—ভুলতে বসেছি। স্নার্কের এই নতুন পৃথিবীতে আমাদের এক নতুন অভ্যাস গড়ে উঠতে লাগল। দৈনন্দিন সহজ স্বাভাবিক ঘটনা ও আমাদের আচরণ মেনে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু একটু ব্যতিক্রম হলেই অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠছি।

প্রতিদিনের কার্যক্রমের ব্যতিক্রম হলেই মনে হচ্ছে সেটা যেন অপরাধ।

হয়তো আমাদের কোনো অতিথি নেই। কোনো টেলিফোনের সাড়া দিতে আমরা বাধ্য নই। কোথাও যাবার তাড়া নেই। আমাদের কোনো ট্রেন ধরতেও হবে না। নেই কোনো সংবাদপত্র যার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমরা জানব যে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ কী করছে। বদ্ধ জলে দোলায়মান স্নার্কের কোনো আরোহীই জানে না, পরমুহূর্তে কী ঘটবে। এ সব সত্ত্বেও স্নার্কের জীবনধারা মোটেই একঘেয়ে নয়। অনেক বৈচিত্র্য আছে এই স্তব্ধ জলের জীবনে।

ভোর চারটের সময় হারমানকে ঘুমোতে যেতে বলে স্টিয়ারিং ধরলাম আমি। যাবার সময় সে বলে গেল, 'স্নার্কের মুখ পূর্ব-উত্তরপূর্ব দিকে। আট পয়েন্ট নড়েছে বটে তবে স্টিয়ারিং অচল। একটু আগে সামান্য বাতাসের স্পর্শ পেয়েছি। হয়তো ফিরে আসবে আবার।'

পিছনের মাস্তুলে ছোট পাল ভাল করে এঁটে গুটিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু মাস্তুলের প্রধান পাল এখনো খোলা আর পাশের ক্ষুদে পালগুলো প্রত্যেকবার দোলানির সঙ্গে ঝটকানি খাচ্ছে ফটফট করে। হারমান যেভাবে রেখেছিল, হালের চাকাটা আমি কপাল ঠুকে তা থেকে একেবারে উল্টো ঘুরিয়ে দিই। তারপর তাকিয়ে থাকি আকাশের তারার দিকে। আমার আর কিছুই করণীয় নেই এই বদ্ধজলে দোলায়মান স্নার্ককে নিয়ে।

হঠাৎ বাতাসের সামান্য স্পর্শ আমার গাল ছুঁয়ে গেল। এত সামান্য যে মনে হয় আমারই মনের ভুল। কিন্তু তারপর আরেক বার। আবার, আবার। এতক্ষণে সত্যিকার বহমান বায়ুর স্পর্শ পাচ্ছি আমি। স্নার্কের পালগুলোও এই বায়ুর স্পর্শ পেয়েছে নিশ্চয়ই। শুধু তাই নয়, স্নার্ক নিজেও বুঝি সাড়া দিচ্ছে, কারণ দেখলাম কম্পাসের কাঁটা নড়ছে। আসলে কম্পাসের কাঁটা মোটেই ঘুরছিল না কিন্তু। পৃথিবীর চৌম্বক আকর্ষণে কম্পাসের কাঁটা একই জায়গায় বন্দী হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে স্নার্ক নিজেই ঘুরছে—ওই সূক্ষ্ম যন্ত্রটিকে কেন্দ্র করে, ওর কার্ডবোর্ডের নির্দেশসূচীটা কেবল ঘুরে যাচ্ছে, কম্পাস-কাঁটা নয়।

তাহলে এইভাবেই স্নার্ক আবার তার নিজস্ব নিশানায় ফিরে আসছে। বাতাস এবার ছোট ছোট ঝাপটা দিতে লাগল। স্নার্ক অনুভব করছে এই ঝাপটা। দেখি আকাশের নক্ষত্রেরা মুছে যাচ্ছে আর মাথার ওপর মেঘের ভেলা ছুটছে। অন্ধকার ঘিরে ধরছে আমাকে। এত অন্ধকার যে হাত বাড়িয়ে তাকে অনুভব করতে পারি সবদিক থেকে। বাতাসের ঝাপটা বাড়ছে। পিছনের পালটা গুটিয়ে রাখা হয়েছিল

বলে খুশি হই। তারপরই আসে এক বিরাট ঝাপটা। স্নার্কের পেছনের অংশ ডোবে জলের তলায়। গোটা প্রশান্ত মহাসাগর যেন ছোট জাহাজটায় উঠে আসতে চাইছে। পাঁচ-ছটা এরকম ঝাপটা হতেই আমার মনে হল অন্য পালগুলোও নামিয়ে নিলে ভাল হত। সমুদ্র ফুলে উঠছে। পর পর বাতাসের ঝাপটাগুলো ক্রমেই প্রবল আর জলসিক্ত হয়ে উঠছে। হাওয়ার গতি লক্ষ্য করে এখন লাভ নেই। বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না। দেশলাই জালিয়ে ব্যারোমিটার দেখি—বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই। তা না হোক, স্নার্ক যে পূব দিকে চলেছে এই ঢের।

জাহাজের পাশের দিকের ছোট পালগুলোর জন্য চিন্তা হয়। ওগুলো গুটিয়ে ফেললেই ভাল হত, এ আবহাওয়ায় তাতেই ঝুঁকিটা কমত। বাতাসের গর্জনের সঙ্গে পট পট করে বৃষ্টির ফোঁটা। ভাবলাম আর সবাইকে ডেকে তোলাই উচিত, পরমুহূর্তেই আবার মনে হল এখুনি হয়তো এই বাতাস বন্ধ হয়ে যাবে, মিছিমিছি ওদের ঘুম ভাঙিয়ে লাভ কী? স্নার্ককে যাত্রাপথে চলতে দিয়ে আমি একাই দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকারের মধ্যে আবার ছাপিয়ে বৃষ্টির তোড় এল, তার সঙ্গে বাতাসের গজরানি। তারপর সবই যেন সহজ হয়ে আসছে—একমাত্র ওই গাঢ় অন্ধকার ছাড়া। লোকজনদের ডাকিনি বলে আমার আনন্দই হল।

বাতাসের বেগ একটু নরম হলেও সমুদ্র ফুঁসে উঠছে। স্নার্কের পেছনের রেলিং ঘনঘন চুবুনি খাচ্ছে জলে। নাঃ, এবার বোধহয় সবাইকে ডেকে তোলা উচিত! কিন্তু তবু ডাকতে ইচ্ছে করল না কারণ বাতাস তো একটু হালকা হয়েছেই। তারপর বেড়ে গেল বৃষ্টির তোড়। হাওয়া কম। এদিকে কিন্তু ককপিটেও বৃষ্টির ঝাপটা আসছে। অন্ধকারে একা এই অবস্থায় স্নার্কের দায়িত্ব নিয়ে থাকা কি ঠিক হবে? পাল গুটোবার জন্য অন্তত ওদের ডেকে তোলা উচিত। আমার হৃদয় বলছে, "নাঃ ওরা ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।" আবার সজাগ চেতনা বলছে, "কেন ওরা ঘুমোবে?" এরপর হাওয়ার ঝাপটা কমে যেতে আরেকটু সবুর করে দেখতে চাই শেষ অবধি কী দাঁড়ায়। এই কষ্ট স্নার্ক সহ্য করতে পারবে নিশ্চয়।

রাক্ষসের মূর্তি নিয়ে ভোর হল সমুদ্রে। বৃষ্টির অঝোর বর্ষণের সঙ্গে সমুদ্র ফেনায় ফেনায় ভরে গেছে। ঘুম থেকে একে একে ডেকে উঠে আসছে সবাই। প্রথমেই হারমান। হাওয়ার বেগ বুঝতে পেরে সে খুশি হয়ে দন্তবিকাশ করে হাসল। ওয়ারেনের হাতে ষ্টিয়ারিং হুইল দিয়ে আমি নিচে নেমে যাচ্ছি এমন সময় আচমকাই পেছনের ডেকে হাপিয়ে ওঠা জলে আমি আর হারমান দুজনেই নাকানিচোবানি খাই। তাহলেও একটা কাষ্ঠহাসি মুখে ফুটে ওঠে—স্নার্ক সত্যিই চলেছে পূব দিকে।

না তাই বলে ব্যাপারটা একঘেয়ে নয়। পূবদিকে সরে ১২৬ পঃ দ্রাঘিমা রেখা অবধি আসার পথে আমরা বাণিজ্যবায়ুর 'মাঝখানের এলাকা' ছেড়েছি, চলে এসেছি দক্ষিণের দিকে 'শান্ত বলয় (ডোলড্রাম্‌স)' পেরিয়ে। তাই আবহাওয়াটা বলব তুলনায় অনেক নরমই। অনুকূল বাতাসে আমরা এখন দিনে কুড়ি মাইল করে এগোচ্ছি। যদিও এরই মধ্যে চলছে ঝঞ্ঝাবাত্যা, সেই সঙ্গে বন্যার মতো বৃষ্টি, একের পর এক পরপর অনেক ঝড়ের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছি। একেকটা ঝড়ের যা দাপট তা আনাড়ি লোকে বুঝবে না।

'এই শান্ত বলয়ে' এসেই আমাদের এক নতুন অভিজ্ঞতা হল।···

২০শে নভেম্বর হঠাৎই আবিষ্কার হল—কোনো দুর্ঘটনাবশত আমাদের পানীয় জলের ভাণ্ডার অর্ধেক হয়ে গেছে। হাইলো থেকে যাত্রা করার সময় আমরা যেটুকু পানীয় জল সঙ্গে এনেছিলাম তা এই তেতাল্লিশ দিনেই অর্ধেক কাবার। যা জল আছে তাতে কুড়িদিনও চলবে কিনা সন্দেহ। 'শান্ত বলয়ে' আমরা যে কখন অনুকূল দক্ষিণমুখো হাওয়া পাব তারও কোনো ঠিক নেই।

সঙ্গে সঙ্গে জলের ভাণ্ডারে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। প্রত্যেককে দু পাইট করে জল দেওয়া হল প্রতিদিনের পানের জন্য। রাঁধুনিকে দেওয়া হল ষোল পাইট। কিন্তু এর ফলে এক মানসিক রোগের শিকার হলাম আমরা সবাই, এমন কি আমি নিজেও। জলে ঘাটতি জেনেই যেন আরো বেশি করে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লাম আমরা। জীবনে এমন তৃষ্ণার্ত হইনি, ইচ্ছে করছিল আমার ভাগের সামান্য জলটুকু এক চুমুকেই খেয়ে ফেলি। খেলাম না অনেক মনের জোর খাটিয়ে, কিন্তু আমি একাই নই, সকলেরই এক অবস্থা। সর্বত্র শুধু জলের কথা, জল নিয়ে চিন্তা। এমন কি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখা হল জলের। আমাদের সঙ্গে অবশ্য সমুদ্রের লবণাক্ত জল চুঁইয়ে পানীয় জল বের করার মেশিন ছিল। কিন্তু তার জন্য দরকার গ্যাসোলিন, যা আমাদের খুব অল্পই আছে।

তন্ন তন্ন করে চার্ট ও ম্যাপ খোঁজা হল—যদি ডাঙার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু না, কোথাও কোন দ্বীপের ইশারা পর্যন্ত নেই। মার্কোয়েসাস হল সব থেকে কাছের দ্বীপ। কিন্তু সে তো বিষুব রেখার ওপারে। আমরা আছি ৩° উত্তর অক্ষাংশে, আরো বারো ডিগ্রি দক্ষিণে গেলে পাব মার্কোয়েসাস—এক হাজার মাইলের ধাক্কা।

বৃষ্টির জল ধরার জন্য চাদর বেঁধে রেখেছিলাম, কিন্তু তেমন করে বৃষ্টি আসছেই না। সকলের পাগল হবার অবস্থা। ভাগ্যক্রমে সেই রাতে অঝোরে বৃষ্টি নামল। মার্টিন তার ভাগের জল আগেই শেষ করে ফেলেছিল, সে সোজা বৃষ্টির দিকে মুখ হাঁ করে শুয়ে রইল। বালতি বালতি জল ভরে ভাণ্ডারে জমা করা হতে লাগল। আমাদের পানীয়

জলের সমস্যা মিটল এমনি অভাবনীয় ভাবেই। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা—মার্কোয়েসাস দ্বীপ পর্যন্ত এর পর আর এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়েনি আমাদের স্নার্কে।

স্নার্ক এগিয়ে চলেছে। এবার শুরু হল মাছ ধরার পালা। না, কষ্ট করে ধরতে হয়নি। রেলিঙের নিচেই অজস্র মাছ। একটা তিন ইঞ্চি ইস্পাতের বঁড়শি, লম্বা সুতো আর এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়ের ফাতনা—ব্যাস্, এই দিয়েই বনিটা মাছ ধরা হতে লাগল। এক-একটার ওজন দশ থেকে পঁচিশ পাউণ্ড। এত ভাল শিকারের আসল কারণ হল বনিটারা উড়ুক্কু মাছ খেতে ভালবাসে, কিন্তু নিজেদের বঁড়শি ঠোকরানোর অভ্যাস নেই। লোভে পড়ে বঁড়শিগেলা উড়ুক্কু মাছগুলোকে গিলেই বনিটারা ধরা পড়ে। একদল বনিটা মাছ, সংখ্যায় হাজার হাজার, তিন সপ্তাহ ধরে আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গেই চলছিল! উড়ুক্কু মাছ বঁড়শিতে গাঁথলেই হুড়হুড় করে তাদের টেনে নিয়ে চলতে থাকে। পেট ভরে খেয়ে আবার স্নার্কেরই পালের ছায়ায় বিশ্রাম-নিতে নিতে চলে। কিন্তু বেচারী উড়ুক্কু মাছগুলো! তারা ডলফিন ও বনিটাদের মুখ থেকে বাঁচবার জন্য জলের ওপর উড়তে চায়, কিন্তু সমুদ্রের পাখিদের তাড়া খেয়ে আবার ঝাঁপ মারে জলে। ওদের যেন আশ্রয় নেই। সারাদিনে হাজার বার এই করুণ দৃশ্য দেখেছি আমরা। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড একেক সময় আমাদের কাছে অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু আমরাও তো কম যাই না! পালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উড়ুক্কু মাছেরা যখন ডেকের ওপর লাফিয়ে পড়ে, তখন আমরাও লোভী মাংসাশী জন্তুর মত ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

হাঙরও আমরা ধরেছি। কিন্তু খুবই অল্প। হিংস্র মানুষখেকো হাঙরও এই সমুদ্রে আছে। বাঘের মত চোখ, বারো সারিতে তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁত। টমাটো দিয়ে সেঁকা-হাঙরের মাংস খুবই ভাল লাগে খেতে। 'হাকে' নামে এক ধরনের মাছও খেয়েছি। কিন্তু সব থেকে যে মাছটি খেতে পরম উপাদেয় ও সুস্বাদু, তা হল সাপের আকৃতির এক রকমের মাছ। তিন ফুট লম্বায় এবং তিন ইঞ্চি গোল।

সব থেকে পছন্দসই আহার হল সমুদ্র কাছিম। কমপক্ষে এক পাউণ্ড ওজন। কাবাব, ঝোল, স্টু আর অদ্ভুত সুন্দর কারি—সব কিছু হয়। কাছিমের মাংসের সঙ্গে আমাদের ভাত খাওয়ার হার খুবই বেড়ে গিয়েছিল। কাছিম ধরা হলে আমরা ফাউ স্বরূপ পেতাম ওর শক্ত খোলের সঙ্গে লেগে থাকা কাঁকড়াদের।

ডলফিনদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মানতেই হবে। একই রঙে দুবার দেখা যায় না। গভীর সমুদ্রে মাছেদের রাজা ওরা। কতরকম যে রঙের বাহার দেখাতে পারে ওরা। জলে যদি এক রকমের রঙ, ডেকে এনে ফেললেই রঙ বদলে ফেলে। ডলফিনেরা

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল প্রায় এক মাস ধরে। কিন্তু সেই যে ওরা নিরক্ষরেখার উত্তরে এসে অদৃশ্য হল—পথের অবশিষ্ট অংশে আর ওদের দেখা যায়নি।

দিনের পর দিন, সময় যেন আর কাটতে চায় না। শুধু চেয়ে দেখি সমুদ্রের বুকে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, ঘোর রাত্রি আর ভর-দুপুরের রামধনু রঙের খেলা। আমাদের স্নার্ক চলছে পূবের টানে। শান্ত-বলয়ে এবারে ভাল বাতাস ধরা গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু। এর ঝোঁকে চললে আমরা মার্কোয়েসাস ছেড়ে আরো পশ্চিমে গিয়ে পড়তাম, কিন্তু ২৬শে নভেম্বর একটা ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় আমরা দক্ষিণ-পূবে চলতে শুরু করলাম। অবশেষে বাণিজ্য বায়ুর নাগাল পাওয়া গেছে। এর পর আবহাওয়া সুন্দর। জাহাজের পাল ফুলে উঠছে। ঝড় বাদল নেই। ৬ই ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় আমরা ডাঙা দেখতে পেলাম চোখের সামনে। নুকা হিভার দক্ষিণ কিনারা ঘেঁষে, সেইদিনই গভীর রাতে ঘন অন্ধকার আর ঝড়ের ঝাপটা ঠেলে তাইওহেতে নোঙর ফেললাম আমরা। ভারি বাতাসে দ্বীপের ফুলের গন্ধ। পাহাড়ের ওপর থেকে বুনো ছাগলের ডাক।

তেরছা পথে সাগর-পাড়ি দেওয়া শেষ হল আমাদের। এক নিঃসঙ্গ সমুদ্র পেরিয়ে দীর্ঘ ষাটদিন পর এক ডাঙা থেকে আর এক ডাঙায় পৌছনো সম্ভব হল।

দশ

মৃত্যুর উপত্যকা: তাইপী

তাইপী! তাইপীর উপত্যকা। কতবার চার্টে ঝুঁকে পড়ে আমরা নামটি উচ্চারণ করেছি।

এই সেই তাইপী—বাল্যকাল থেকেই যা আমাকে আকর্ষণ করেছে। হারম্যান মেলভিলের "তাইপী" বইটি যেদিন আমার হাতে এল, সেদিন থেকেই এই উপত্যকাটিকে স্বপ্নে দেখছি। সেই বাল্যকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—বড হয়ে আমি তাইপীর উপদ্বীপে যাবই যাব। বহু বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু তাইপীকে ভুলিনি। একবার উত্তর সাগরে সাত মাস কাটিয়ে সানফ্রান্সিসকো ফিরে গিয়ে শুনলাম—'গ্যালিলী' নামে একটা ছোট্ট জাহাজ যাচ্ছে মার্কোয়েসাস দ্বীপে। বহু চেষ্টা করেও সেই জাহাজে একজন কেবিন-বয়ের কাজও জোটাতে পারিনি—নাবিক হওয়া তো দূরের কথা। জাহাজের ক্যাপ্টেন ভুল বুঝেছিলেন আমাকে। ভেবেছিলেন—আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছি।

এই সেই তাইপীর উপদ্বীপ, আমার স্বপ্নের উপত্যকা।

স্নার্ক থেকে আমরা দেখতে পেলাম 'সেইল রক্'। নুকু হিভা দ্বীপের সর্ব দক্ষিণ-পূর্ব যে অন্তরীপটি, তারই মুখে দাঁড়িয়ে উপসাগর পাহারা দিচ্ছে—পাল তোলা একটা জাহাজের মতো। হারমান ছিল জাহাজের স্টিয়ারিং ধরে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কী বল তো?'

'একটা মাছ ধরা নৌকো, স্যর,' খুব ভাল করে নজর করে জবাব দিল হারমান।

কিন্তু চার্টে পরিষ্কার লেখা রয়েছে—'সেইল রক' (পালের মতো দেখতে শিলা পাহাড়)। তিনটি ভূখণ্ড উপসাগরের মুখে বাঁক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক মাঝখানের অন্তরীপটিতে আমরা নজর রেখেছিলাম, ওখান থেকেই। গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম উপত্যকা—দ্বীপের ভেতর দিকে বিস্তৃত হয়ে গেছে। তারপর সোজা সামনে এক ঝলক দেখা দিল 'সেন্টিনেল রক্' (প্রহরী পাহাড় শিলা)। ফেনিল সাগরে অন্ধকারেও আমরা ওটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলাম। শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে, মাঝেসাঝে বৃষ্টিতে মুছে যাচ্ছে সেন্টিনেল রকের অবয়বরেখা। কিন্তু তবু ওই সেন্টিনেল রককে হারিয়ে ফেললে চলবে না। এটিকে হারালে 'তাইওহে' উপসাগরই হারিয়ে ফেলব। একদল ডাঙা-ভুখা লোক যারা ষাটদিন একটানা এক ভয়াল সমুদ্রযাত্রা পেরিয়ে এসেছে—তাদের পক্ষে ব্যাপারটা শোচনীয় হবে।

ঢেউ-বিক্ষুব্ধ শব্দমুখর 'প্রহরী শিলা'র পাশ কাটালাম আমরা। হাওয়ার বেগে পাল তুলে দিয়ে শিলাপাহাড়ের পেছন দিকে যেতেই বাতাসের উদ্দামতা কমে গেল। একেবারে শান্ত জলে প্রবেশ করে স্নার্ক দুলতে লাগল। বাতাসের একটা দাপট এসে স্নার্কের বড় পালগুলোকে জাগিয়ে তোলে। আমরা এগোতে থাকি খুব ধীরে। আমাদের নজর পুরনো একটা দুর্গের লাল বাতির দিকে, ওখানেই নোঙর ফেলার কথা। বাতাস কখনো আসছে পূব থেকে। কখনো পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ থেকেও আসছে। এলোমেলো হাওয়া। দু ঘণ্টা অবিরাম চেষ্টার পর উপসাগরের মাইলখানেক ভেতরে এসে নোঙর ফেললাম। এগার ফ্যাদম নিচে নোঙর আটকেছে। এইভাবে আসা হল তাইওহেতে।

সকালে আমাদের ঘুম ভাঙল এক রূপকথার দেশে। স্নার্ক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পোতাশ্রয়ের শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে। আশপাশে দ্রাক্ষাকুঞ্জ ঘেরা খাড়া পাহাড়ের দেয়ালগুলো জল থেকে যেন সোজা উঠে গেছে। দূরে, পূব দিকে ওই দেয়ালের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা একটু সরু পায়ে-চলার পথ দৃশ্যমান।

পুরো একটা দিন আমরা বিশ্রাম নিলাম স্নার্কে। পুরো দুটি মাস আমরা সমুদ্রে

কাটিয়েছি নগ্ন পদে। কিছু অভ্যাস করে না নিলে চামড়ার জুতো পায়ে দেওয়াই অসম্ভব। তাছাড়া জাহাজের একটানা দোলানি এখনো আমাদের মাথা ঘুলিয়ে দিচ্ছে, যার জন্য একেবারে শরীরটা জুত বোধ করি না। ঘোড়ার পিঠে (ছাগলের মত আকৃতি যাদের) চেপে ওই পথ ধরে চলা সম্ভব হবে না। দিনটি আমরা কাটালাম তীরবর্তী ঘন জঙ্গলের পথে গুঁড়ি মেরে চলে—এখানকার এক বিশাল শ্যাওলাধরা দেবমূর্তির সঙ্গে পরিচয় করে।

এই দেবমূর্তিটির কথা কিছু বলি। দক্ষিণ সমুদ্রের বহু দ্বীপে এ-রকম অসম্মানিত দেবমূর্তি দেখা যায়। একজন জার্মান ব্যবসায়ী ও নরওয়ের জনৈক জাহাজের ক্যাপ্টেন মূর্তিটিকে দেখে নিয়ে যাবার মতলব করেছিল। কানাকারা একটা কাঠের ফ্রেমে মূর্তিটাকে ভরে জাহাজে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু সম্ভব হয়নি। যার ফলে সেই থেকে সমুদ্রতীরেই মূর্তিটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আধা কর্তিত অবস্থায়, হাতুড়ি ছেনির ঘায়ে বিধ্বস্ত হয়ে।

সেদিনটাতে আমরা আপ্যায়িত হলাম তাইয়ারা তামারী নামে এক দ্বীপবাসীর উদ্যোগে। তাইয়ারা তামারী এক হাওয়াইবাসী নাবিকের ছেলে। তিমি-শিকারী জাহাজ থেকে পালিয়ে এই দ্বীপেই রয়ে গিয়েছিল। আজ তার মার্কোয়েসীয় মায়ের স্মৃতি-উৎসব, তাই তার আমন্ত্রণে আমরা গ্রামের ভেতরে গেলাম। দ্বীপবাসীরা ভোজ প্রস্তুত করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওদের অগ্রদূত একটি তরুণী, একটা উঁচু পাথরে দাঁড়িয়ে স্তোত্রের স্বরে আমাদের আগমন বার্তা ঘোষণা করল, এবং আহারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত সে কথা ঘোষণা করতেই সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। এর পর মেয়েটির কণ্ঠস্বর আরো তীব্র আর উদগ্র হয়ে উঠল কানফাটা চিৎকারে। একটু দূর থেকে কারা যেন চিৎকার করেই জবাব দিল পুরুষালি গলায়। এই তীব্র নাদ ক্রমে মিশ্রিত হল এক সমবেত বন্য বর্বর মন্ত্রোচ্চারণের স্বরের মধ্যে—যেন তা এক রক্তঝরা যুদ্ধের আহ্বান। তারপর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বড় বড় গাছের আড়াল থেকে সার বেঁধে বেরিয়ে এল একদল আধা বুনো মানুষ। কোমরে একটুকরো রঙচঙে কাপড় ছাড়া তাদের পরনে আর কিছু নেই। ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে আসছে। ওদের সুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে উন্মাদনাময় আদিম যুদ্ধসংগীত। প্রত্যেকের কাঁধে-বসানো গাছের ডাল থেকে ঝুলছে ভারি একেকটা রহস্যময় বস্তু, সবুজ গাছের পাতায় মুড়ে লোকচক্ষুর আড়ালে ঢাকা। ওই মোড়কগুলো থেকে বের হল হৃষ্টপুষ্ট বড় আকারের ঝলসানো শুয়োর। এগুলো বহন করবার পদ্ধতিটা পুরনো জমানার আদি প্রথা অনুকরণে 'বড় শুয়োর'-এর মাংস পরিবেশনের। 'বড় শুয়োর' কিন্তু শুয়োর নয়—

ভালবেসে, পলিনেশিয়ান ভাষায় মানুষের মাংসকেই বলা হয় 'বড়ো-শুয়োর' বা 'লম্বা-শুয়োর'। সেই যুগের মানুষখেকো আদিবাসীদের বংশধর এরা—এদের মোড়ল এক রাজার ছেলে। তারা পুরনো আমলের নিয়মমতই আহার্য সাজাচ্ছিল। প্রত্যেক খাদ্য-বহনকারীকেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল যাতে সে পরাভূত শত্রুর বিরুদ্ধে হিংস্র চিৎকার ধ্বনি করে গরম বক্তব্য রাখতে পারে। বর্তমান প্রজন্মের দুই প্রজন্ম আগে মেলভিল দেখতে পেয়েছিলেন 'হাপ্পার'-যোদ্ধাদের ঝলসানো মৃতদেহ তালগাছের পাতায় মুড়ে পরিবেশন করতে। মেলভিল আরও দেখেছিলেন—"একটা কাঠের তৈরি অদ্ভুত বাসন।...সেটার মধ্যে এখনও মানুষের হাড়গোড় ও ইতস্তত মাংসের ছিন্নাংশ লেগে রয়েছে।"

অতি সভ্য মানুষেরা এই অসভ্য মানুষদের স্বজাতি ভক্ষণের কথা বিশ্বাস করতে চান না। বলেন যে ওটা আষাঢ়ে গল্প। তাহলে হয়তো সুদূর অতীতে কোনোদিন তাঁদেরই পূর্বতন আদি পুরুষেরা নরমাংসের প্রথায় আসক্ত ছিলেন এটাই যে বিশ্বাস করতে হয়! এই অবিশ্বাসীদের মধ্যে ক্যাপ্টেন কুকও ছিলেন একজন। নিউজীলাণ্ডের এক বন্দরে তিনি নিজেই স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখেছিলেন একদিন। এক আদিবাসী বিক্রি করার জন্য জাহাজে এনেছিল রোদে-শুকোনো একটি চমৎকার নরমুণ্ড। তখনো ওটাতে কিছু মাংস লেগে ছিল। কুকের আদেশে মাংসের চিলতেটুকু তুলে নিয়ে আদিবাসীটিকেই দেওয়া হয়।...এবং সে তৃপ্তিসহকারে সেই মাংস খেয়ে ফেলে। বিজ্ঞান জগৎ বহুদিন ধরেই ব্যাপারটির খোঁজখবর করছিল—এবার কুকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা যথার্থ সত্য জানলেন।

এ যুগেও নরমাংস-ভক্ষণের দৃশ্য আমায় দেখতে হবে—এমন আশা করি না। কিন্তু আমার সংগ্রহে এমন একটি লাউয়ের খোল আছে, যার বয়স শতবর্ষের উর্ধ্বে এবং যাতে করে দুই জাহাজী কাপ্তেনের রক্ত পান করা হয়েছিল। অবশ্য এদের একজন কাপ্তেন জোচ্চুরি করে আদিবাসীদের ঠকিয়েছিল। বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য আদিবাসীরা তাদের মাংস খেয়েছিল।

স্নিগ্ধ ঊষাকালে আমরা যাত্রা শুরু করলাম তাইপীর উদ্দেশে, ঘোড়ার পিঠে চেপে। ঘোড়াগুলো পা ছুঁড়ে, বিচিত্র চিৎকার করে একে অন্যকে আক্রমণ করতে লাগল। ওরা ভুলেই গিয়েছিল ওদের পিঠে রয়েছে ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য। তাছাড়া পথে রয়েছে পিছল আলগা পাথর এবং গভীর গিরিখাত।

প্রাচীন কালের এই পথটি 'হাউ' গাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। পথের দু'পাশেই দেখা যাচ্ছিল একদা ঘনবসতির ধ্বংসচিহ্ন। ছয় থেকে আট ফুট অবধি

উঁচু পাথরের দেয়াল এবং মজবুত ও বিশাল ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তিভূমির ওপর এককালে মানুষ বাস করত। কিন্তু আজ সেই বাড়িঘর আর মানুষজন নেই, চলে গেছে। বড় বড় গাছের শিকড় সেই ভিত্তিপাথর ফাটিয়ে উর্ধ্বমুখী হয়েছে। জঙ্গলে ছেয়ে গেছে জায়গাটা। এই ভিত্তিপাথরগুলোকে বলে 'পায়ে-পায়ে'—মেলভিল যাকে বলেছেন 'পাই পাই'।

বর্তমান প্রজন্মের মার্কোয়েসানদের এইসব বড় বড় পাথর তুলে খাড়া করে বাড়ি তৈরি করার হিম্মতই নেই। তাদের উৎসাহেরও অভাব। উপত্যকার ওপর দিকে উঠছি আর দেখতে পাচ্ছি সেই বৃহৎ পাথুরে 'পায়ে-পায়ে'গুলোর ওপরেই বাসিন্দারা ছোট খড়ের কুঁড়েঘর বানিয়েছে। মার্কোয়েসানরা এখন অবলুপ্তির পথে। তাইওহের অবস্থা দেখলে মনে হয় এই অবলুপ্তিকে রোধ করতে যে নবীন রক্তের প্রয়োজন, তার অভাব ঘটেছে। খাঁটি মার্কোয়েসিয়ান আর নেই বলতে গেলে। মনে হয় তারা সবাই বর্ণসংকর হয়ে গেছে। অনেক জাতির মিশ্রণ ঘটে গেছে তাদের রক্তে। মাত্র উনিশ-জন সক্ষম মজুর আছে জাহাজের খোলে শুকনো নারকেলের শাঁস ভরতে পারে। আর এদের শরীরে আছে ইংরেজ, আমেরিকান, ডেনিশ, জার্মান, ফরাসী, কর্সিকান, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, চীনা আর তাহিতি, হাওয়াই, পমোটান, এবং ইস্টার দ্বীপবাসী মানুষের রক্ত! এ যেন মানুষের সংখ্যা থেকে রক্ত মিশ্রণকারী জাতির সংখ্যাই বেশি। সত্যি বলতে একটা জাতিব ধ্বংসাবশেষ হিসেবেই এরা বেঁচে রয়েছে। এখানকার উষ্ণ সুষম আব-হাওয়ায়—সত্যিকারের পার্থিব স্বর্গোদ্যানে—চরমতা নেই, স্নিগ্ধ বাতাস যেখানে ওজোন গ্যাসে সমৃদ্ধ, সেখানে বনসম্পদের বাড়বাড়ন্তের মতই মানুষ ভুগছে—হাঁপানী, যক্ষ্মা, টি-বি প্রভৃতি রোগে। প্রত্যেকটি দীনহীন ঝুঁড়েঘর থেকে ভেসে আসছে খক্‌খকে কাশি আর ক্ষয়িষ্ণু ফুসফুসের হাঁপধরা পীড়াদায়ক আওয়াজ। যক্ষ্মারোগে 'গ্যালপিং' বলে একটা লক্ষণের কথা আছে যা আতঙ্ককর দ্রুতগতিতে ফুসফুসকে খতম করে দেয়। দু মাসের মধ্যে একজন শক্তসমর্থ মানুষকে কঙ্কালে পরিণত করে কবরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। প্রতিটি উপত্যকায় এইভাবে শেষ মানুষটিও বিদায় নিয়েছে; সুফলা মাটি জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। মেলভিলের সময় এই উপত্যকায় 'হাপ্পার' নামে এক শক্তিশালী যোদ্ধাজাতির বাস ছিল। দুই প্রজন্ম পরে আজ সেখানে মাত্র দুশো অসুস্থ রুগ্ন লোকের বাস। বসতিহীন হাহাকারভরা এক আরণ্য মরুভূমি।

আমরা গিরিপথ ধরে আরও উঁচুতে উঠতে থাকি। পথে আরও অজস্র পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ 'পায়ে-পায়ে'র ভিত্তিভূমি। লাল পাহাড়ি-আপেল অজস্র ফলে আছে দেখে এক স্থানীয় অধিবাসীকে দিয়ে তা পেড়ে এনে খাওয়া হল। তাকে দিয়ে ডাবও

পাড়ানো হল। অনেক দেশের ডাবের জল আমি পান করেছি—হাওয়াই এবং জামেইকারও। মার্কোয়েসাসের ডাবের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। মাঝে মাঝে বুনো জামির ও কমলালেবুর গাছও দেখতে পাচ্ছিলাম। যারা নিজের হাতে এই বিশাল গাছগুলো লাগিয়েছিল, তারা তো কবেই শেষ হয়েছে—কিন্তু এরা ঠিক রয়েছে অরণ্য রূপ নিয়ে। অসংখ্য হলদে ক্যাসিফুলের বন পেরিয়ে চলেছি। ওগুলোর মধ্যে বোলতার বাসা। আর কী বিরাট সব বোলতা! একেকটা ছোট ক্যানারি পাখির মতো আকারের। একটা ঘোড়া হঠাৎ শূন্যে পা ছুঁড়ল—তার পরেই দিল এক প্রচণ্ড লাফ। না, অন্য কোনো কারণে নয়। বোলতার ভীষণ হুল ফুটেছে তার মোটা চামড়ার মধ্যেও। এমনিভাবে পর পর কয়েকটা ঘোড়া পরিত্রাহি চিৎকার করে ক্রমাগত সামনের পা ছুঁড়ছে শূন্যে—একেবারে খাদের কিনার ঘেঁষে। যাঃ, একটা বোলতা যে আমার গালে হুল ফুটিয়ে দিল! তারপর আবার ঘাড়ের ওপর। ঘোড়াগুলো পেছনে যেতে পারে না। বিশ্রী বিপদসঙ্কুল পথে ঘোড়াগুলো সামনেই দৌড়োয়। আমার ঘোড়া চার্মিয়ানের ঘোড়াকে পেছনে ফেলে ছুটতে লাগল। চার্মিয়ানের ঘোড়াটা ভয় পেয়ে তার দুটো পা তুলে দিল আমার দিকে। আমার ভাগ্য ভাল যে ঘোড়ার খুরে লোহার নাল পরানো নেই। ঘোড়াদের এবং আমার যন্ত্রণায় আমি কোন পার্থক্য করতে পারলাম না। পাগলের মতো আমি টুপি দুলিয়ে বোলতা তাড়াতে তাড়াতে ঘোড়া ছুটিয়ে আগে চলি। সরু পাহাড়ি পথের একপাশে খাড়া দেয়াল, অন্যদিকে গভীর খাদ। এ অবস্থায় ঘোড়া থামানোর থেকে তাকে ছুটতে দেওয়াই ভাল। কী করে যে ঘোড়াগুলো কোনো দুর্ঘটনা না ঘটিয়েই এ পথ পার হচ্ছে—ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। যেন অলৌকিক ব্যাপার। ঘোড়াগুলো পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করছে—কে আগে এই ভয়ঙ্কর জায়গা পার হতে পারে।

অবশেষে এই বিরক্তিকর অবস্থার অবসান হল। আমরা একটা উঁচু জায়গায় পৌছলাম। চারদিকে যতোদূর চোখ যায়, কেবল পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো শৈলশিরা মাথা জাগিয়ে আছে। বাণিজ্যবায়ুর সঙ্গে মেঘ উঠে চুড়োগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে। নিচে দেখতে পাই তাইওহে উপসাগরে স্নার্ক—শান্ত জলে যেন একটা কাগজের নৌকার মতো ভাসছে। হাজার ফিট নিচে নামলাম আমরা। ঠিক নিচেই রয়েছে তাইপী। এখান থেকে প্রথম দর্শনে তাইপীকে দেখে মেলভিল লিখেছিলেন—'চোখের সামনে যেন স্বর্গোদ্যান। এমন দৃশ্যে কখনো এত বিহ্বল হইনি।'

মেলভিল দেখেছিলেন স্বর্গোদ্যান। আমরা কী দেখছি? জংলা বনভূমি। কোথায় গেল সেই শ'য়ে-শ'য়ে রুটিফলের গাছ যা তিনি দেখেছিলেন? আমরা শুধু জঙ্গলই

দেখছি। শুধু দুটো কুঁড়েঘর আর কয়েকটা নারকেল গাছ আদিম সবুজ ওড়না সরিয়ে উঁকি দিচ্ছে। কোথায় সেই 'টাই'—যাকে 'মেহেভি'দের মধ্যে যারা অবিবাহিত মানুষ তাদের নিজস্ব বাসস্থান বলা হতো? যে 'টাই'-আবাসে নারীদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ? কোথায় সেই প্রাসাদ, সর্দাররা, আর 'টাপা'-ঢাকের আওয়াজ? বৃথাই খুঁজে বেড়াই সেসব।

একটা আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমরা নামছি। পথের দু'পাশে ও মাথার ওপর তোরণের মতো জঙ্গল ঘিরে রয়েছে। নিঃশব্দে বড়-বড় প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। পথের দুধারে উল্কি আঁকা বন্য মানুষেরা গদা ও বল্লম নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। কোনো নিষেধ বা 'ট্যাবু'র চিহ্নমাত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। না, পুরনো যুগের সে ট্যাবু আর নেই। হ্যাঁ, তবে নতুন যুগের একটা ট্যাবু আমাদের সচেতন করে দিল। কতগুলো আদিবাসী মেয়েকে দেখিয়ে একটি লোক সাবধান করে দিল আমাদের। উদ্দেশ্য আসলে ভালই। মেয়েগুলো কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। যে লোকটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিল—তার নিজের পায়ে ভয়ঙ্কর রকমের গোদ বা এলিফ্যানটিয়াসিস্। প্রত্যেকেই ফুসফুসের রোগে কষ্ট পাচ্ছে। তাইপীর উপত্যকা হল মৃত্যুর আস্তানা। যে কয়েক ডজন মানুষ এখনও কোনোক্রমে বেঁচে আছে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে এই উপজাতির অবলুপ্তির আর বেশি দেরি নেই।

একদা এই তাইপীয়রা ছিল শক্তিশালী এবং সমর্থ উপজাতি। হাপ্পার, তাইওহীয়ান, এমনকি নুকুহিভার সমস্ত উপজাতিদের থেকেও তারা বহুগুণ বেশি বলশালী ও যোদ্ধা ছিল। তাইপী শব্দের অর্থ—নরখাদক। মার্কোয়েসাসের সমস্ত উপজাতিই ছিল নরখাদক। কিন্তু এ বিষয়ে সকলকে টেক্কা দিয়েছিল তাইপীয়রা। মার্কোয়েসাস দ্বীপপুঞ্জে তাইপীয়রা ছিল সকলের আতঙ্ক। এদের জয় করা ছিল দুঃসাধ্য। ফরাসী নৌবহর সমগ্র মার্কোয়েসাস দখল করেও তাইপীয়দের একা ছেড়ে দেয়। ইংরেজ ক্যাপ্টেন পোর্টার কিন্তু সঙ্গে হাপ্পার-তাইওহের দু হাজার বাড়তি যোদ্ধা নিয়ে, তাইপীয়দের শায়েস্তা করতে গিয়েও তাইপীয় যোদ্ধাদের দাপটে দ্বীপের ভেতরে তো প্রবেশ করতে পারেইনি বরং উল্টে পালিয়ে যাবার পথ পায়নি।

দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরের সমস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে মার্কোয়েসাস্ দ্বীপবাসীরাই সৌন্দর্যে ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত। মেলভিল লিখেছেন—'এদের শৌর্যে ও সৌন্দর্যে আমি চমৎকৃত। সুঠাম দেহসৌষ্ঠবের দিক থেকে এদের তুলনা খুঁজে পাই না। অন্তত আমার চোখে উৎসবরত জনতার মধ্যে বিকৃতাঙ্গ কাউকে দেখিনি। তাদের প্রত্যেকেই ভাস্করের মডেল হবার যোগ্য।' মেনডানা—যিনি মার্কোয়েসাস দ্বীপপুঞ্জের প্রথম

আবিষ্কারক—লিখে গেছেন, 'ওদের দেহের বর্ণ প্রায় গৌর। দীর্ঘদেহী ও সুগঠিত।' ক্যাপ্টেন কুক দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরের দ্বীপগুলোর মধ্যে মার্কোয়েসাস আধিবাসীদেরই শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়ে গেছেন।—

'প্রায় প্রত্যেকটি দ্বীপবাসীই লম্বা-চওড়া মানুষ; ছ'ফুটের নিচে তো কেউই নেই লম্বায়।'

আর এখন? তাইপী উপত্যকা থেকে সেই সমস্ত শৌর্য আর সৌন্দর্যের অবলুপ্তি ঘটেছে। এখানে বাস করে কয়েক ডজন চরম দুর্দশাগ্রস্ত প্রাণী। কুষ্ঠ, গোদ ও যক্ষ্মায় বিধ্বস্ত। মেলভিলের ধারণায় সে সময় এই দ্বীপের লোকসংখ্যা ছিল দু হাজার। পাশের হো-ও-উমী উপত্যকার লোকসংখ্যা অবশ্য হিসেবেই নেননি তিনি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যনিবাস থেকে জীবনের স্পন্দনই যেন মুছে যাচ্ছে। একদিন এখানকার বিশুদ্ধ বাতাসে কোন দৃশ্য বা অদৃশ্য নরঘাতক জীবাণুর অস্তিত্ব ছিল না। যেদিন থেকে সাদা মানুষেরা জাহাজে চেপে আসতে লাগল, সেদিন থেকেই আমদানি হতে লাগল মৃত্যু-দূতরূপী জীবাণুদের। এই সব শত্রুদের কাছে প্রথমে নতজানু, তারপর ভেঙে পড়তে লাগল মার্কোয়েসাস্ দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা। জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার, প্রতি-রোধ করবার ক্ষমতা এদের ছিল না, যা আমাদের আছে। অবশ্য এই প্রতিরোধ ক্ষমতা আমরা অর্জন করেছি বহু যুগের সংগ্রামের ফলে। কিন্তু এই দ্বীপবাসীদের প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রয়োজনই হয়নি কখনও। ফলে, যারা শত্রুর মাংস খেতে অভ্যস্ত, তারা এমন অদৃশ্য জীবাণুর শিকার হয়েছিল যে শত্রুর বিরুদ্ধে তীর-ধনুক অথবা বল্লম কোন কাজই করে না।

আমরা দুপুরের আহারের জন্য ঘোড়া থেকে নামলাম। এখানে আবার হুল-ওয়ালা বেলে মাছির উপদ্রব। টিনের মাংস, কলা খাওয়া হল নারকেলের দুধ সহযোগে। এখানে জঙ্গলের আক্রমণ কম। মানুষের কিছু প্রাচীন কীর্তিকলাপ ছড়িয়ে আছে। পাথরের তৈরি 'পাই-পাই'গুলো দৃশ্যমান। কিন্তু কোন শিলা-লিপি বা চিত্র-লিপি তাতে অনুপস্থিত। শুধু বিস্মৃত কালের মূক-বধির পাথরের স্তম্ভ। যে মানুষের হাতে তারা আকৃতি পেয়েছিল তারা ধুলোয় মিশে গেছে। 'পাই-পাই'গুলোর ভেতর থেকে এখন বিশালাকৃতি গাছ গজিয়ে উঠেছে। পাথরগুলোকে ভেঙে ফাটিয়ে তারা আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে আদিম বিশৃঙ্খল অবস্থায়।

আহারের পর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আমরা একটি জলের সোঁতার ওপারে যেতে চেষ্টা করি। উদ্দেশ্য বেলে মাছিদের ধোঁকা দেওয়া। হুঃ, ওদের আবার ধোঁকা দেওয়া! সাঁতার কাটতে হলে জামাকাপড় খুলেই জলে নামা দরকার,

মাছিরা সেটা ভালো করেই জানে, তাই নদীর কিনারা ছেঁকে বসে থাকে। স্থানীয় ভাষায় এ মাছির নাম 'নাউ-নাউ'। ইংরেজীতে নাউ-নাউ (এখনই-এখনই) শব্দের সার্থক নাম বহন করছে ওরা। মানে ওরা এখুনি আক্রমণ করতে প্রস্তুত। জলে থাকার সময়টুকুই যা রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু জল থেকে তো উঠতেই হবে। আর উঠলেই তারা সারা শরীরে সেঁটে যাচ্ছে। একসময় এমন একটা পর্যায় আসে যে পাগলের মত হয়ে যাই আমরা। এরা শরীরে সেঁটে থাকলেও, খবরদার, মারবেন না। মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও এই ঘৃণ্য পতঙ্গগুলো আপনার চামড়ায় নোংরা বিষ ঢেলে দিয়ে যাবে। এদের ফোটানো হুলে চামড়ায় বসন্ত রোগীর মত গুটি বের হয়। আমারও তাই হয়েছিল এক সপ্তাহ বাদে।

হো-ও-উমি একটা ছোট উপত্যকা, মাঝখানে একটা নিচু গিরিশিরা। ওদিকেই চললাম আমরা। ভেবেছিলাম আমাদের উদ্দাম দুর্দান্ত ঘোড়াগুলো ইতিমধ্যে বশ্যতা স্বীকার করেছে। কিন্তু ওয়ারেনের ঘোড়া যেন শখ করে লোক দেখানোর মতো এমন একটা বিপজ্জনক পথ ধরে চলতে শুরু করল যে পাঁচ মিনিট আমাদের রুদ্ধশ্বাসে কাটাতে হল। তাইপী উপত্যকার একেবারে নিম্ন মুখে পৌছলাম আমরা। ওই সামনের সৈকতভূমি ধরেই মেলভিল প্রাণ হাতে পালিয়েছিলেন কারাকোঈ নামে এক সমাজচ্যুত কানাকার সাহায্য পেয়ে। ওই বিশেষ জায়গাটি থেকে ছুটে গিয়ে নৌকোতে চেপে মেলভিল যখন পালাচ্ছেন তখন মেহেভি আর মাউ-মাউয়ের আদিবাসীরা সাঁতরে ওদের ধাওয়া করেছিল। নৌকোয় উঠতেও চেষ্টা করে তারা। কিন্তু ছুরি মেরে তাদের নৌকো থেকে ফেলে দেওয়া হয়। মেলভিলের হাতের বঁড়শি গেঁথে যায় এক মাউ-মাউয়ের গলায়।

হো-ও-উমিতে প্রবেশ করলাম আমরা। মেলভিলকে এমন কঠিন পাহারায় থাকতে হয় যে এই উপত্যকাটির অস্তিত্বই তিনি জানতেন না। এখানেও অনেক পাথরের 'পাই-পাই'। কিন্তু সমুদ্রের কাছাকাছি এসে দেখি অসংখ্য নারকেল আর রুটি ফলের গাছ। আলু জাতীয় 'টারো' ফলে আছে জমিতে। ডজন খানেক ঘাসের কুটির দেখা গেল। এদের একটিতেই আমরা রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই খাবারদাবারের ব্যবস্থা হল। একটি ছোট শুয়োর মারা হল। ওটাকে যখন রোস্ট করা হচ্ছে পাথর উত্তপ্ত করে, সেই সঙ্গে নারকেলের দুধে কয়েকটা মুরগিও স্টু করা হতে লাগল। এক আদিবাসী রাঁধুনীকে বলেছিলাম একটা নারকেল গাছে উঠে কিছু নারকেল পেড়ে দিতে। একশো পঁচিশ ফুট উঁচু গাছটায় সে এমন স্বচ্ছন্দে উঠে গেল যেন হেঁটেই চলে গেল গাছের মাথায়, পাড়ল নারকেল। কিন্তু ওই অঞ্চলের সমস্ত

মানুষই যে এমনটা করতে পারে তা নয়—বেশির ভাগ দ্বীপবাসীই এই শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ওদের ফুসফুস জখম। সারাদিন সারারাত কেসেই চলেছে। কিছু আদিবাসী মহিলার কাসির সঙ্গে সঙ্গে বুকভাঙা করুণ শব্দ বেরিয়ে আসছিল। এদের নারী-পুরুষের মধ্যে খুব কম মানুষেরই এখন পুরোদস্তুর মার্কোয়েসীয় রক্ত। ফরাসী, ইংরেজ, ডেনিশ, চীনা বংশজরাই প্রধানত এদের আধা ফিরিঙ্গি করে তুলেছে।

একটা 'পাই-পাই' পাথরের চত্বরে আমাদের আহার পরিবেশিত হল। এখানেই একটা ঘাসের কুটিরে আমরা রাত্রিবাস করব। প্রথমেই কাঁচা মাছের 'পই-পই' সরবরাহ করা হল যেটা হাওয়াইয়ের 'পই' থেকে স্বাদে আলাদা। মার্কোয়েসাসে 'পই-পই' বানাবার কায়দা রুটি ফল সহযোগে। কাঁচা মাছ আর পাকা রুটি ফল পাথরের হামানদিস্তায় ছাতুর মতো পিষে পাতার খোলে মুড়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়। বেশ কয়েক বছরে ধরে। পরিবেশন করার আগে পাতায়-মোড়া খাবারটি উত্তপ্ত পাথরের মধ্যে রাখা হবে, আর ভাল করে সেঁকে নেওয়া হবে। জল মিশিয়ে পাতলা করে খেতে হয়। খাদ্যটি যে স্বর্গীয় স্বাদের তাতে সন্দেহ থাকেনি আমার। রুটিফল আর টারো তো রাজার খাদ্য। রুটিফল আসলে কিন্তু মিষ্টি আলুরই মতো, রুটির মতো নয় কোনো মতেই। ভোজ শেষ করবার পরই তাইপীর আকাশে চাঁদের উদয় হল। বাতাসে ফুলের সুগন্ধ। এ এক আশ্চর্য মোহময়ী রাত। তীরে আছড়ে পড়া সমুদ্রের ঢেউয়ের দূরাগত অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে। আমাদের সঙ্গে বিছানা ছিল না। পাথরের চত্বরেই সবাই শয্যা গ্রহণ করলাম।

কাছেই কোথাও এক মহিলা হাঁপাচ্ছে আর ঘুমের মধ্যে ককাচ্ছে। সারা রাত ধরে আমাদের চারদিক ঘিরে গোটা দ্বীপের সমস্ত মুমূর্ষু লোকেরাই বোধ হয় কেসে চলেছে অহরহ।

এগারো

প্রকৃতির মানুষ

আমি তাকে প্রথম দেখেছিলাম সান ফ্রান্সিসকোর মার্কেট

বর্ষণসিক্ত এক বিকেলবেলায় একাকীই হেঁটে যাচ্ছিল সে। হাঁটু পর্যন্ত খাটো স্রেফ একটি প্যান্ট আর ছোট শার্ট ছিল তার পরনে। ফুটপাথের জলে তার খালি পায়ের শব্দ হচ্ছিল ছলাৎ-ছলাৎ করে। পেছনে একপাল ছেলেছোকরা। প্রত্যেকটি

মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি—তা হাজার খানেক মানুষের দৃষ্টি তো বটেই—ওর দিকেই ফেরানো। আমার চোখও ওর দিকেই। এ-রকম চমৎকার রোদপোড়া শরীর আমি দেখিনি এর আগে। লোকটার সর্বাঙ্গই রোদপোড়া অথচ চামড়া ওঠেনি বলে তাতে সোনালি আভা। ওর লম্বা হলুদ চুলেও দগ্ধতার ছাপ। দাড়িও তাই। দাড়িতে কোনদিন ক্ষুরের স্পর্শ পড়েনি। তামাটে বর্ণের লোকটি কিন্তু ঠিক তামাটে নয়, স্বর্ণাভ তামাটে। সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল আর দীপ্তিমান। আমার মনে হল—ইনি যেন কোনো দিব্য-প্রেরণাপ্রাপ্ত সাধক সন্ন্যাসী, শহরে এসেছেন বাণী প্রদান করতে। সে বাণীতে পৃথিবী হয়তো ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার পাবে।

এর কয়েক সপ্তাহ পরে সানফ্রান্সিস্কোর কাছেই পীডমণ্ট পাহাড়ের এক বাংলোতে ছিলাম জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে। 'পেয়েছি; তাকে পেয়েছি,' বন্ধুরা চেঁচামেচি করে বলছিল, 'একটা গাছের ওপর তাকে দেখা গেছে। ভালই আছে এখন। চল, ওকে দেখে আসি।' ওদের সঙ্গে বেশ একটা উঁচু পাহাড়ে উঠি, মাথা যেন ঘুরে যায়। দেখি ইউক্যালিপটাস্-কুঞ্জের মধ্যে ছোট একটা কুঁড়েঘরে সেই রৌদ্রদগ্ধ চেনা মানুষটিকে। শহরের ফুটপাথের সেই দিব্য-প্রেরণাপ্রাপ্ত সাধক।

আমাদের সঙ্গে দেখা করতে তিনি হন্তদন্ত করে ছুটে এলেন কয়েকটা ডিগবাজির দ্রুত প্যাচ দেখিয়ে। আমাদের সঙ্গে করমর্দন করার বদলে কিছু শরীরের কসরত আর মারপ্যাচ দেখালেন, সেই ওর সম্ভাষণ জ্ঞাপনের কায়দা। শরীরটাকে সাপের মতো তরঙ্গায়িত করলেন। বাজিকরের খেলার আগে শরীর উঁচিয়ে তোলার কায়দায়। এবার কোমর বাঁকিয়ে পা লম্বা করে প্রথমে হাঁটু ছুঁলেন, তারপর মাটিতে হাতের পাতা দিয়ে ঘন ঘন চাপড় মারতে লাগলেন। উঠে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন খুশিতে মশগুল একটা বনমানুষের মতো। সূর্যস্নানের আনন্দময় জীবন তাঁর মুখের ওপর উপচে পড়ছে। 'আমার হৃদয় আনন্দে ভরপুর'—এই গানই যেন তিনি গেয়ে শোনাচ্ছেন শব্দহীন সংকেতে।

সারা বিকেল তিনি এইভাবেই অসংখ্য বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে ওই নিঃশব্দ গানের বাণীই শোনালেন। ভাবলাম, বনের মধ্যে এ আবার কোন্ নির্বোধ ভাঁড়ের সঙ্গে দেখা হল আমার! তবে হ্যাঁ, ভাঁড়টির যোগ্যতা আছে বটে। ডিগবাজি আর ঘোরপাক খাওয়ার মধ্যে মধ্যেই তিনি পৃথিবী উদ্ধারের বাণী শুনিয়ে দিলেন দুভাবে। প্রথম, দুর্দশাগ্রস্ত মানবজাতি শরীরের প্রতিটি সুতো বিসর্জন দিক, আর বুনোদের মতো পাহাড়ে উপত্যকায় ছুটে বেড়াক। দ্বিতীয় বাণী, এই হতভাগ্য পৃথিবী লিখিত ভাষায় ধ্বনিগত বানানের পদ্ধতি গ্রহণ করুক। ওঁর বাণী শুনে আমার চোখের সামনে ভেসে

উঠল একটি দৃশ্য। শহরের জনগোষ্ঠী উলঙ্গ হয়ে ছুটে চলেছে প্রান্তরে-প্রান্তরে। খামারের কুকুরগুলো তাড়া করেছে তাদের। আর বন্দুক ও আঁকশি নিয়ে চাষীরাও আক্রমণ করতে চলেছে উলঙ্গ মানুষদের।

এরপর…অনেক বছর কেটে গেছে। এক রোদ-ঝলমলে সকালে একটা খাড়ি পার হয়ে পাপিতি বন্দরের দিকে এগোচ্ছে স্নার্ক। একটা নৌকো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। নৌকায় একটা হলুদ পতাকা উড়ছে পতপত করে। নৌকোতে বন্দরের ডাক্তারেরই থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই নৌকার পিছনে, অনেকটা দূরে আরেকটা মাস্তুলওলা ক্যানো জাতীয় নৌকোকেও আসতে দেখা গেল। আমরা ধাঁধায় পড়লাম। কেন না ওটাতে উড়ছে একটা লাল পতাকা। দুরবিন দিয়ে দেখলাম। মনে হলো ওই অঞ্চলে হয়তো কোনো নৌকাডুবি বা জলযানের দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাই নাবিকদের প্রতি সতর্কতা-জ্ঞাপক এই লাল পতাকা।

বন্দরের ডাক্তার আমাদের জাহাজে উঠে এল। পরীক্ষা করা হল আমাদের স্বাস্থ্য। স্নার্কে ইঁদুর বহন করে আনা হয়নি জেনে নিশ্চিন্ত হল ডাক্তার। এবার আমি তাকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই লাল পতাকার মানে?' 'আরে, ও তো ডারলিং।' ডাক্তার জানাল।

আর তারপরই উদয় হলেন ডারলিং—আর্নেস্ট ডারলিং। বিশ্বভ্রাতৃত্বের লাল পতাকা উড্ডীন করে আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। 'হ্যালো জ্যাক! হ্যালো চার্মিয়ান!' দূর থেকে আমাদের নাম ধরে ডেকে দ্রুত বৈঠা চালিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে আসতেই চিনলাম—আরে, এ যে পীডমন্ট পাহাড়ের সেই তামাটে রঙের অবতার! একটি কৌপীন-সম্বল সূর্যদেবতা, দু'হাতে এনেছেন অভিনন্দনের ডালা—আমাদের জন্য এক বোতল সোনালি মধু, আর একটা পাতার ঝুড়িতে বড় বড় সোনা-রঙের আম, কলা, আনারস, লেবু ও রসালো কমলালেবু। সূর্য ও মাটির নিজস্ব শক্তিতে ভরপুর জিনিসগুলো। এইভাবে দক্ষিণ সমুদ্রের আকাশের নিচে আবার দেখা হল সেই 'প্রকৃতির মানুষ' ডারলিঙের সঙ্গে।

তাহিতি হল পৃথিবীর একটি সেরা সৌন্দর্যময় দেশ—যেখানে বাস করে চোর ডাকাত ধাপ্পাবাজেরা, এবং অবশ্যই এখানে যথেষ্ট সংখ্যক সৎ বিশ্বস্ত নারীপুরুষও আছে। যেহেতু তাহিতির এই মাকড়শাসদৃশ জীবগুলোর দৌলতে তাহিতির অতুলনীয় সৌন্দর্যের ওপর কলঙ্ক লেগেছে, তাই তাহিতির কথা আর লিখছি না। লিখছি প্রকৃতির হাতে গড়া মানুষটির কথা। তাজা এবং পরিচ্ছন্ন মানুষটির কথা। মানুষটির ভেতর থেকে যে মনঃশক্তি বেরিয়ে আস'ছ তা এত অমায়িক, এত মিষ্ট যে তাতে কারো কোনো ক্ষতিই

হতে পারে না। ক্ষতি বোধ করতে পারে শুধু লুটেরা আর অর্থগৃধ্নু পুঁজিপতিরা।

'তোমার ওই লাল পতাকার মানে কি?' ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'অবশ্যই সমাজবাদ।'

'তা তো আমি জানি। কিন্তু তোমার হাতে এই পতাকা কী বলতে চাইছে?'

'আমি আমার অভীষ্ট বাণী খুঁজে পেয়েছি।'

'তার প্রচার কি এই তাহিতি দ্বীপে করছ?'—অবিশ্বাসের সুরে বলি আমি।

'নিশ্চয়।' সরল জবাব তাঁর। পরে অবশ্য জেনেছি তাঁর বক্তব্যেও কোনো অসরলতা নেই।

জাহাজ নোঙর করে ছোট নৌকোয় চেপে ডাঙার দিকে যাত্রা করার সময় প্রকৃতির সন্তানও চললেন আমাদের সঙ্গে। ভাবলাম এবার তো এই ছিটগ্রস্ত মানুষটি আমাদের জ্বালাতন করে মারবেন। জেগে বা ঘুমিয়েও বোধ হয় আমাদের কাছ ছাড়া হবেন না, যতদিনে এই দ্বীপ ছেড়ে বিদায় না হব।

কিন্তু এত বড় একটা ভুল ধারণা আমি জীবনেও করিনি। একটা বাড়ি ভাড়া করে সেখানে উঠি, লেখা ও অন্যান্য কাজকর্ম করতে শুরু করি। কিন্তু সেদিনের পর তিনি আমার ধারেকাছেও এলেন না। বিনা আমন্ত্রণে আসবার পাত্র তিনি নন; ইতিমধ্যে তিনি স্নার্কে গিয়ে তার লাইব্রেরিটি দখল করে বসেছিলেন। বিজ্ঞান-সংক্রান্ত এত বই সেখানে পেয়ে তিনি আনন্দে বিহ্বল হন। কিন্তু পরে শুনেছি তিনি বড় বেদনা পেয়েছিলেন গল্প-উপন্যাস জাতীয় বইয়ের অকারণ প্রাচুর্য দেখে। প্রকৃতির সন্তান গল্প-উপন্যাস পড়ে সময় নষ্ট করার লোক নন।

সপ্তাহখানেক বাদে, নিজের বিবেকের তাড়নাতেই ওঁকে শহরের প্রান্তের এক হোটেলে ডিনারের নিমন্ত্রণে ডাকি। তিনি এলেন সুতীর পোশাকে অনভ্যস্ত আড়ষ্ট ও অস্বস্তিকর এক অবস্থায়। যখন বললাম ইচ্ছে করলে তিনি পোশাক খুলে ফেলতে পারেন, তখন তাঁর চোখে-মুখে ফুটে ওঠে খুশি ও কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি! কোমর থেকে কাঁধ অবধি জামা খুলে ফেললেন। পরনে রইল শুধু মাছধরা জালের মত একটা গেঞ্জি। ফলে তার সোনা-উজ্জ্বল দেহত্বকটুকু প্রকাশিত হল। বাকি নিচের অংশে লাল কটিবস্ত্র। সে রাতে আমাদের সত্যিকার পরিচয় শুরু হল এবং তারপর আমার তাহিতির দীর্ঘ-প্রবাসে সে পরিচয় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল।

একদিন সকালে আমি লিখে-লিখে ঘর্মাক্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তিনি বললেন, 'তা হলে তোমার কাজ বই লেখা?' তারপরই তার সগর্ব ঘোষণা 'আমিও বই লিখি।'

এই রে ! এবার বুঝি তিনি তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টা নিয়ে আমায় জ্বালাতে আরম্ভ করবেন ? আমার মন বিদ্রোহ করে ওঠে—না, এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই দক্ষিণ-সমুদ্রে এসে একটা সাহিত্যচক্রে বসার ইচ্ছে নেই আমার।

'এই হল আমার লেখা বই।' মুঠো-করা হাতে তিনি নিজের বুকের ওপর দুম্ দুম্ করে ঘুষি মারতে মারতে বলেন, 'আফ্রিকার জঙ্গলে গরিলারা বুকে ঘুষি মারতে থাকে যতক্ষণ না সেই শব্দ আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়।'

'তোমারও বুক দেখছি দারুণ।' আমি তারিফ করেই বললাম, 'একটা গরিলারও ও বুক দেখে বিলক্ষণ ঈর্ষা হতে পারে।'

সেইদিনই প্রথম আর্নেস্ট ডারলিঙের অপূর্ব সুন্দর বইটির বিষয় জানলাম, পরেও বিস্তারিত বিবরণ পড়েছি। বারো বছর আগে তিনি ছিলেন মৃত্যুর দোরগোড়ায়। তখন তাঁর ওজন দাঁড়িয়েছিল মাত্র নব্বই পাউণ্ড, এত দুর্বল যে গলা দিয়ে শব্দ বেরুতো না। ডাক্তারেরা শেষ জবাব দিয়ে দিয়েছিল। এমনকি ওঁর বাবাও, যিনি নিজে একজন পেশাদার ডাক্তার, হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন ওঁর বিষয়ে। বহু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডারলিংকে পরীক্ষা করেন, কিন্তু কোন আশাই কেউ দিতে পারেননি। স্কুলের শিক্ষকতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো দুটো এক সঙ্গে করতে গিয়ে তাঁকে অতিরিক্ত পড়াশুনো করতে হয়। তার ওপর দুবার নিমোনিয়ার আক্রমণে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। দিনের পর দিন শরীরের শক্তি কমে যেতে থাকে। পরিমাণে যথেষ্ট খেতে দিলেও আহার থেকে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারতেন না। নানারকম ওষুধ দিয়েও তাঁর পাকস্থলীর হজমশক্তি বাড়ানো গেল না। শুধু স্বাস্থ্যই ভগ্ন হয়নি। মানসিক ত্রুটিও দেখা দিল। মনে সর্বদাই অতিরিক্ত উত্তেজনা, ওষুধে তো অরুচি এসে গেলই, মানুষ দেখলেও ক্লান্তি ও বিরক্তি আসত। মানুষের কণ্ঠস্বর তাঁকে পীড়িত করত। মানুষের মনোযোগ ও যত্ন বরং ক্ষিপ্তই করে তুলত তাঁকে।

শেষ পর্যন্ত ডারলিঙের মনে হল, মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন সে মৃত্যু আসুক উন্মুক্ত আকাশের নিচে—এইসব ঝুট-ঝামেলার বাইরে। আসলে একই সময় তাঁর মাথায় আর একটি চিন্তাও উঁকি দিচ্ছিল। এই সব গুরুভোজন খাদ্য, ওষুধ এবং তার যত্ন নিয়ে দুর্ভাবনাগ্রস্ত মানুষের দল—এ সমস্ত কিছুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে তার হয়তো মৃত্যু নাও হতে পারে।

আর্নেস্ট ডারলিং মন স্থির করে নিলেন যে মানুষ একটা চলন্ত শবদেহ ছাড়া আর কিছু নয়, সামান্য প্রাণপ্রদীপ সম্বল করে, কয়েকটা নড়বড়ে হাড় নিয়ে তিনি একদিন মানুষের সমাজ ত্যাগ করলেন। কায়ক্লেশে উঠলেন গিয়ে অরিগনের পোর্টল্যাণ্ড শহর

থেকে পাঁচ মাইল দূরে, একটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে। এমন কাজ শুধু পাগলেই করতে পারে। মৃত্যুশয্যা থেকে এভাবে এতদূরে চলে যাওয়া শুধু বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু এই জংলা জায়গাতেই ডারলিং পেলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম। খাবার নিয়ে জবরদস্তি করার কেউ এখানে নেই। কোনো চিকিৎসক নেই যে ঘন-ঘন তাঁর নাড়ি টিপবে বা ওষুধপত্র গেলাবে। একটা উপশমের শান্তি তাঁর শরীরে অনুভূত হল। এখানে সূর্যের উষ্ণ উত্তাপ। তাতেই তিনি অবগাহন করেন। সূর্যকে তাঁর মনে হতে লাগল ধন্বন্তরী—প্রাণদায়ী স্বাস্থ্যের উপাদান। একদিন সত্যিসত্যি তিনি অনুভব করলেন—সূর্যরশ্মির জন্যই তাঁর সমস্ত শরীর উন্মুখ হয়ে আছে। সমস্ত পোশাক-আশাক বিসর্জন দিয়ে তিনি রৌদ্রস্নান শুরু করলেন। দেহমনে এল সুস্থতার অনুভূতি। অনেক মাসের অসহ্য বেদনা থেকে প্রথম স্বস্তির প্রলেপ।

যতোই তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে থাকেন ততোই তাঁর পারিপার্শ্বিকতার দিকে নজর পড়ে। তাঁর চারপাশে প্রকৃতি। পাখির কাকলি, কাঠবিড়ালির দৌড়ঝাঁপ আর কিচমিচ। ওদের স্বাগত আর মুক্তজীবন দেখে তাঁর ঈর্ষা হয়। ওদের কতো সুখী নিরুদ্বেগ জীবন। নিজের জীবনের সঙ্গে তাদের জীবনের অবধারিতভাবেই তুলনা করতে বসেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে ওরা কেন এত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা অথচ তিনি নিজে এক দুর্বল পঙ্গু মুমূর্ষু মানুষের অপভ্রংশ। তাঁর সিদ্ধান্ত হল অত্যন্ত সরল—এরা বাস করে প্রকৃতির মধ্যে সহজ স্বাভাবিক জীবনে, আর তিনি বাস করতেন প্রকৃতিবর্জিত সমাজে। তাই বাঁচবার ইচ্ছে থাকলে তাঁকে প্রকৃতির রাজ্যেই ফিরে যেতে হবে।

একাকী এই জঙ্গলের পরিবেশেই তিনি নিজের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন এবং তার প্রয়োগও শুরু করে দিলেন। লম্ফঝম্প করে নেচে বেড়াতে থাকেন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে। প্রকৃতির শিশুর মতোই চার হাত-পায়ে ছোটেন। গাছে চড়তে থাকেন, অর্থাৎ এক নাগাড়ে দৈহিক পরিশ্রম আর সঙ্গে রৌদ্রস্নান। প্রাণীদের অনু-করণে মেতে ওঠেন তিনি। শুকনো পাতা আর ঘাস দিয়ে তৈরি করেন পাখির বাসার মতো এক বাসস্থান। এখানেই রাত্রিবাস করে আর গাছের বাকল দিয়ে বাসাটা আবৃত করে রাখেন প্রথম হৈমন্তী বর্ষা থেকে বাঁচবার জন্য।

একদিন তিনি দু'পাশে দু হাত ছড়িয়ে দেখালেন। 'এই ছাখ একটা চমৎকার ব্যায়াম। দাঁড়কাকদের দেখে-দেখে শিখেছি।' নারকেলে মুখ ঠেকিয়ে চোঁ-চোঁ করে জল খেতেও দেখেছি তাঁকে। এই পদ্ধতি নাকি তিনি গরুদের কাছ থেকে শিখেছেন।

এইভাবে জল খাওয়ার মধ্যে নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা তিনি যাচিয়ে দেখেছেন, বড়ো ভালো, এখন এই পদ্ধতিতেই পানীয় গ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, কাঠবিড়ালিরা ফল আর বাদাম খেয়ে বেঁচে থাকে। ব্যস্, তাঁরও আহারের পদ হলো ফল আর বাদাম, সঙ্গে একটু রুটি। এর ফলে তাঁর শক্তি আর ওজন বেড়ে গেল। তিন মাস এই আদিম জীবন যাপনের পর অরিগনের প্রচণ্ড বৃষ্টি তাঁকে বাধ্য করল ওখান থেকে মনুষ্য বসতিতে ফিরে আসতে। নব্বুই পাউণ্ডের এক রোগী যার দুবার নিমোনিয়ার আক্রমণ হয়ে গেছে, তার পক্ষে মুক্তাঙ্গনে অরিগনের শীত কাটাবার মত সামর্থ্য থাকার কথা নয়।

তাঁর ব্রত মোটামুটি সিদ্ধ হলেও আবার তাঁকে ফিরে আসতেই হল লোকালয়ে। বাবার কাছেই ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে তিনি আবার হাঁফিয়ে উঠলেন। তাঁর ফুসফুস চাইছে মুক্ত বাতাস। তৃতীয়বার নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন তিনি। আগের থেকেও এবার আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়লেন। তার ওপর মস্তিষ্ক হয়ে পড়ল অচল। মড়ার মত পড়ে রইলেন তিনি, কথা বলবার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। দুর্বল মস্তিষ্কে কারো কথাবার্তা শুনলেই উত্তেজিত ও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। একটি মাত্র মানসিক শক্তিই অবশিষ্ট ছিল—। দু কানে আঙুল চেপে রাখা যাতে বাইরের লোকের বলা কথা যেন আদৌ শুনতে না হয়। আত্মীয়স্বজনেরা উন্মাদরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হল। বিশেষজ্ঞরা তাঁকে পাগল বলে প্রতিপন্ন করে এমন কথাও বলে গেল—বড় জোর এক মাস বেঁচে থাকবেন কিনা সন্দেহ।

এমনই এক মানসিক বিশেষজ্ঞের সাহায্যে তাঁকে পাঠানো হল 'মাউন্ট ট্যাবর'-এর কোনো আরোগ্য কেন্দ্রে। আরোগ্য কেন্দ্রের লোকেরা যখন বোঝে রোগী মারাত্মক ব্যবহার করে না, ক্ষতিকারকও নয়, তখন তারা তাঁকে তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা মতো চলতে দিতে আপত্তি করে না। তাঁর খাদ্যের ব্যাপারে আর তারা হুকুম চালায় না বলে তিনি আবার ফল ও বাদাম খেতে শুরু করেন। সেই সঙ্গে অলিভ তেল, মটরের মাখন ও কলা। এই হল তার প্রধান খাদ্য। ধীরে ধীরে তাঁর শক্তি সামর্থ্য ফিরে আসে। তিনি ঠিক করেন তাঁর পুরনো প্রকৃতির জীবনে ফিরে যাবেন। এভাবে আর সকলের মতো সমাজের বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে বাস করলে তাঁর মৃত্যু অবধারিত। তিনি মরতে চান না। প্রকৃতি-সন্তানের মূল সত্তায় মৃত্যুভয় একটি প্রধান উপাদান। বাঁচতে হবেই। আর বেঁচে থাকতে হলে তাঁর চাই—প্রকৃতিদত্ত খাদ্য, মুক্ত বায়ু এবং জীবনীশক্তিভরা সূর্যালোক।

অরিগনের শীতকাল প্রকৃতির ক্রোড়মুখী মানুষের কাছে বাধাস্বরূপ। ডারলিংকে

তাই ভিন্ন আবহাওয়ার সন্ধান করতে হল। একটা সাইকেলে চেপে তিনি দক্ষিণের দিকে যাত্রা করলেন যেখানে সূর্যের আলো পাওয়া যাবে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে রইলেন একটা বছর। পড়াশুনোর ফাঁকে নিজের পথ ঠিক করে নিতে লাগলেন। ক্লাসের লেকচার শুনতেন যৎসামান্য পোশাক পরে, মানে যতোটা কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয়। যতোটুকু শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাই যথাসম্ভব প্রয়োগ করেন জীবনযাত্রার মধ্যে। তাঁর প্রিয় পাঠপদ্ধতি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে একটা পাহাড়ে উঠে সেখানে ঘাসের ওপর নগ্ন হয়ে শুয়ে সূর্যের কিরণ সর্বাঙ্গে শুষে নেওয়া। এ ভাবেই সূর্যালোক আর স্বাস্থ্যের পাশাপাশি চলছিল তাঁর জ্ঞানের আহরণও।

কিন্তু মধ্য-ক্যালিফোর্নিয়াতেও শীত কম নয়। ফলে প্রকৃতি-মানবের উপযুক্ত আবহাওয়ার অনুসন্ধান অব্যাহত রইল। লস্ এঞ্জেলস ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় সে চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েকবার গ্রেপ্তার হলেন তিনি। পাগলদের বিচারালয়ে হাজির হতে হল। কেননা সত্যি-সত্যি তাঁর জীবনধারা তো বাকি মানুষদের জীবনযাত্রার আদলে নয়। হাওয়াই দ্বীপেও প্রকৃতির সন্ধানে এসেছিলেন তিনি। সেখানে অবশ্য তাঁকে পাগল বলে প্রমাণিত করা না গেলেও তাঁর ওপর বহিষ্কারের আদেশ হল। ঠিক বহিষ্কার নয়। কর্তৃপক্ষ তাঁকে দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে বলেছিল।—হয় বহিষ্কার, নয় এক বছরের কারাবাস। প্রকৃতি-মানবের কাছে জেলখানা মৃত্যুরই সামিল কেননা মুক্তবায়ু আর ঈশ্বরপ্রদত্ত সূর্যালোকেই সে বেঁচে থাকতে পারে। হাওয়াই-দ্বীপের কর্তৃপক্ষকে দোষ দেওয়া চলে না। ডারলিং অবাঞ্ছিত বলে প্রতিপন্ন। এটাকে বরং বলা যায়, দু'পক্ষের মতের অমিল। তাঁর সরল জীবনের দর্শন ওদের হিসেবে

অতএব ডারলিং আবার বেরিয়ে পড়লেন এমন এক আবহাওয়ার সন্ধানে যেখানে তিনি নিজে তো অবাঞ্ছিত হবেনই না, প্রকৃতিও হবে বাঞ্ছনীয়। এবং তাহিতিতে সেই বাঞ্ছিত আবহাওয়ার সন্ধান পেলেন তিনি। তাহিতি হলো সেই স্বর্গোদ্যানের মধ্যে স্বর্গোদ্যান। ডারলিঙের বক্তব্য অনুযায়ী প্রতিটি বিবরণ দিয়ে এভাবেই তিনি তাঁর বইটি লিখেছেন। কটিবস্ত্র ও মাছধরা জালের হাতকাটা গেঞ্জি পরে ঘোরেন। ধরাচূড়া ছেড়েই এখন তাঁর ওজন একশো পঁয়ষট্টি পাউণ্ড। নিখুঁত স্বাস্থ্য। এক সময় যাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, এখন তাঁর চোখের জ্যোতি চমৎকার। ফুসফুস যাঁর তিনবার নিমোনিয়ার আক্রমণে বলতে গেলে খতমই হয়ে গিয়েছিল, সেই ফুসফুস এখন মজবুত, আগের চেয়েও শক্তিশালী।

একদিন আমার বাড়ির দেয়ালে এক সেট মুষ্টিযুদ্ধের গ্লাভ্‌স্ দেখতে পেয়ে তাঁর

চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, 'বক্সিং জানো নাকি?'

'স্ট্যানফোর্ডে থাকবার সময় ছাত্রদের বক্সিং শেখাতাম আমি।' উত্তরে বললেন তিনি।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা গ্লাভ্‌স্ পরে নিলাম। প্রথমেই তাঁর গরিলার মত মজবুত ও লম্বা হাত আমার নাকের ওপর আছড়ে পড়ল। তারপর আমাকে মাথার পাশে আঁকড়ে ধরে তিনি আমায় কাত করে এমন ঘুষি চালালেন যে আমার শরীরের একটা জায়গা ট্যাম হয়ে ফুলে উঠল। সেই ফোলা ছিল এক সপ্তাহ। ওঁর সিধে বাঁ হাতের ঘুষি এড়িয়ে আমিও একটা ডান হাতের ঘুষি চালালাম ওঁর পেটে। সাংঘাতিক ঘুষিটার পেছনে ছিল আমার শরীরের সমস্ত ওজন। উনি ঝুঁকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুষিটা পড়েছিল। আমি অপেক্ষা করলাম কখন উনি পড়ে যান। কিন্তু ঘুষিটা তিনি রীতিমতো হজম করে উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'বাঃ, দারুণ দিয়েছ!' পর-মুহূর্তে ঝড়ের মতো হুক, জোল্ট ও আপারকাটের হাত থেকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি। পরে সুযোগের অপেক্ষায় থেকে মারলাম ওঁর ওপর-পেটের নাইকুণ্ডলী লক্ষ্য করে। প্রকৃতির মানুষের দু হাত ঝুলে পড়ল, হাঁফাতে হাঁফাতে বসে পড়লেন হঠাৎ। বললেন, 'এখুনি ঠিক হয়ে যাব। একটু সবুর।' বলতে বলতে তিরিশ সেকেণ্ড পার না হতেই উঠে পড়ে তিনি আমায় দিলেন পালটা মার। এবারে আমার বসে পড়বার পালা। ওঁর ঘুষিটাও পড়েছে আমার নাভির ওপর-পেটেই।

বক্সিং-এর কথা লিখলাম এজন্য যে, আট বছর আগে ডাক্তাররা যাঁকে জবাব দিয়ে-ছিলেন, যাঁর ওজন ছিল নব্বই পাউণ্ড, অরিগনের পোর্টল্যাণ্ড শহরের এক বন্ধ ঘরে মৃত্যুর সঙ্গে মরণপণ লড়ছিলেন, আজ সেই লোকটির সঙ্গে এই মানুষের কতো তফাত। আর্নেস্ট ডারলিং যে বইটি লিখেছেন, সেটি শুধু সুলিখিত নয়, বইটির বাঁধাই পর্যন্ত ভাল।

প্রকৃতি-মানুষের মতো একজন সাচ্চা মানুষকে স্থান না দিয়ে হাওয়াই দ্বীপ মস্ত ভুল করেছিল। তারা দম্ভভরে যে কী হারিয়েছে তাই আমি তাদের দেখাতে চাই।

তাহিতি এসে ডারলিং এমন এক জমির সন্ধান করতে লাগলেন যেখানে নিজের আহার্য বস্তু তিনি নিজেই ফলিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু স্বল্পমূল্যের জমি পাওয়া মুশকিল। প্রকৃতির মানুষ তো আর টাকায় গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন না। তাই সপ্তাহের পর সপ্তাহ খাড়া পাহাড়গুলোতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অবশেষে কয়েকটা ছোট গিরিখাতের সংযোগস্থলে আশি একরের এক ঝোপঝাড়অলা জমি আবিষ্কার করলেন তিনি। জমিটার কোন মালিক আছে কিনা জানা গেল না। সরকারী দপ্তর তাঁকে জানাল, যদি তিনি ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে তিরিশ বছর চাষাবাদ করেন, তবে তাঁকে জমির স্বত্বাধিকার দেওয়া হবে।

সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন তিনি। আশেপাশে এমন চাষের কাজ কোথাও হয়নি। অত উঁচুতে কারোরই খামার নেই। জমিটা ঝাড় জঙ্গলে ভরা, বুনো শুয়োর ও হাজার হাজার ইঁদুরের বাস সেখানে। এখান থেকে পাপিতি ও সমুদ্রের দৃশ্য অপূর্ব হলেও জমির চেহারা মোটেই উৎসাহজনক নয়। কয়েক সপ্তাহ পরিশ্রম করে একটা রাস্তা বানালেন তিনি, যাতে চাষের জমিতে সহজে যাতায়াত চলে। প্রথম বীজ বোনার পর তা অঙ্কুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুয়োর আর ইঁদুর সব খেয়ে সাবাড় করল। গুলি করে শুয়োর মারা আর খাঁচা পেতে ইঁদুর ধরা চলল। দু'হপ্তায় তিনি পনেরোশো ইঁদুরই ধরে ফেলেছিলেন। সমস্ত জিনিসই তাঁকে পিঠে বয়ে ওপরে নিয়ে যেতে হয়। রাত্রিতেই চলে এই মাল বওয়ার কাজ।

ধীরে ধীরে তাঁর জয়ের পথ সুগম হয়। ঘাসের দেয়াল-ঘেরা একটা বাড়ি বানান তিনি। বন কেটে, বুনো জানোয়ার তাড়িয়ে তিনি উর্বর আগ্নেয়গিরির মাটিতে অসংখ্য নারকেল, পেঁপে, আম, রুটিফল, নাসপাতি প্রভৃতি গাছ তো ফলিয়েছিলেন বটেই, প্রচুর সবজি আর আঙুরের ক্ষেতও করেছিলেন। পাহাড়ের গর্তে জমা জলকে তিনি সেচের কাজে লাগালেন। এর জন্য একের পর এক গিরিখাতগুলোকেই কাটতে হয়েছে তাঁকে। ফলে সরু সরু গিরিখাতগুলো হয়ে উঠল উদ্ভিদের সুদৃশ্য বাগিচা। উদ্ভিদহীন রোদপোড়া পাহাড়গুলো এখন গাছ, ফুল, ফলে ভরে উঠল। এই কৃষিকর্মের ফলে প্রকৃতি-মানবের শুধু নিজস্ব আহারের ব্যবস্থাই হল না, চাষের সম্ভার পাপিতি শহরের বাসিন্দাদের কাছে বেচে বেশ গণমান্য কৃষি-বিশারদও হলেন।

কিন্তু একদিন আবিষ্কার হল—যে জমিকে সরকারী দপ্তর থেকে নিঃস্বত্ব বলা হয়েছিল, সে জমির একজন মালিক আছে সত্যিসত্যিই। দলিলপত্তর নথিও নাকি আছে। ডারলিঙের সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হতে চলল। একদিন যে জমি ছিল মূল্যহীন, সেই জমির মালিক নাকি এক বড় জমিদার, তার নাকি জানাই ছিল না প্রকৃতি-মানুষ জমিটাকে ওইভাবে সুফলা করে তুলেছে। যা হোক জমিটার একটা যুক্তিসঙ্গত মূল্য নিরূপণ করা হল এবং ডারলিঙের পক্ষে আইনানুগ দলিল নেবার বন্দোবস্ত করা হল।

কিন্তু পরবর্তী আঘাত এল আরও মারাত্মকভাবে। যে রাস্তাটা ডারলিং তৈরি করেছিলেন চাষ ও বাজারে মাল নিয়ে যাবার সুবিধার জন্য, সেই রাস্তাটাকে তিন-পরতা কাঁটাতারে বন্ধ করে দেওয়া হল। অসামঞ্জস্যময় সমাজব্যবস্থায় এমন ব্যবহার খুবই সর্বজনিক। এর পেছনে যারা কলকাঠি নেড়েছে, তারা হল সেই লোক যারা প্রকৃতি-মানবকে লস্ এঞ্জেলস ও হাওয়াইতে ঝামেলায় ফেলেছিল। এই সব আত্মতুষ্ট মানুষদের

পক্ষে নিজস্ব পদ্ধতিতে সুখী আর একটি মানুষকে বুঝতে পারাই কষ্টকর। দু'পক্ষের চিন্তাধারাই মূলত বিরোধী। সরকারী কর্মকর্তাদেরও যোগসাজস আছে তাদের সঙ্গে সেটা পরিষ্কার। নইলে আজ পর্যন্ত রাস্তাটা কাঁটাতারে বন্ধ করা থাকত না। এ ব্যাপারে কেউ তো দৃষ্টি দেয়ইনি বরং প্রত্যেক দপ্তরেই দেখা গেল তাদের একগুঁয়ে অনিচ্ছার স্বাক্ষর। কিন্তু প্রকৃতি-মানব দমে গেলেন না। তাঁর নৃত্য ও গীত অব্যাহত রইল। তাঁর প্রতি কী অবিচার করা হল—তা নিয়ে বিনিদ্ররাত কাটাননি তিনি। দুশ্চিন্তার ভার যা কিছু তা তিনি অন্যায়কারীদের মস্তিষ্কের মধ্যেই ছেড়ে দেন। তিক্ত ভাবনাচিন্তার সময় কোথায় তাঁর? সুখী হবার জন্যই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। অন্য দুশ্চিন্তায় অপব্যয় করবাব মত সময় তাঁর নেই।

আগের তৈরি করা রাস্তা বন্ধ। নতুন রাস্তা তৈরি করার মতো জমিই নেই। একটা শুয়োর-চলার খাড়া পথ উঠে গিয়েছিল চাষের জমিতে। সরকারী চাপে বাধ্য হয়ে এই চোরা পথটি ব্যবহার করাও বেশ বিপজ্জনক। আমি ওঁর সঙ্গে অতি কষ্টে চলেছি এই পথে। এই পথটাকে চওড়া সড়কে পরিণত করতে গেলে চাই একজন ইঞ্জিনীয়ার, একটি স্টিম-ইঞ্জিন এবং ইস্পাতের তার। কিন্তু এ সবের পরোয়া করে নাকি প্রকৃতি-মানব? তাঁর ভদ্র নীতিজ্ঞানে নোংবা লোকেরা ক্ষতি করলেও তিনি প্রতিদান দেন সদ্ব্যবহার দেখিয়ে। অতএব তাঁকে অসুখী বলবে কে?

সেই শুয়োর-চলা রাস্তা ধরে চলবার সময় আমরা হাঁফিয়ে উঠে একটা শিলার খাঁজের ওপর বসলাম বিশ্রাম নিতে। উনি বললেন, 'ওদের ওই ঝঞ্ঝাটে-রাস্তার কথা বাদ দাও। শীগগিরই একটা হাওয়াই জাহাজ আনছি, ওদের বোকা বানিয়ে ছাড়ব। হাওয়াই জাহাজ নামবার মত একটা সমতল জায়গা সাফ করে নিচ্ছি, এর পরের বার যখন তোমরা তাহিতি আসবে, সিধে আমার দোরগোড়াতেই নামবে এসে।'

তা বটে! প্রকৃতি-মানুষের কয়েকটি অদ্ভুত ধ্যান-ধারণাও আছে। যার মধ্যে একটি হলো—'শূন্যে ভেসে থাকা'। 'হ্যাঁ মশাই। শূন্যে ভেসে থাকা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। এর গৌরবের কথাটা ভেবে দেখুন একবার। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে একজন জমি থেকে শূন্যে উঠছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, সৌরজগৎ মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে। কোন অঘটন না ঘটলে, এই সৌরজগৎ এমন শীতল হয়ে যাবে যে কোন প্রাণীই বাঁচবে না এখানে। বেশ, সেদিন যখন আসবে, তার আগেই এই গ্রহের মানুষ শূন্যে ভেসে থাকার বিদ্যে শিখে নিয়ে এই ধ্বংসোন্মুখ জগৎ থেকে অন্য জগতে আতিথ্য গ্রহণ করবে। প্রশ্ন হলো, কী করে এটা করা সম্ভব হবে? উপবাস—ক্রমান্বয়ে উপবাস করে যেতে হবে। আমিও এভাবেই চেষ্টা করে দেখেছি। উপোস করবার পর শরীর

সত্যিই হাল্কা হয়ে যায়। তা আমি বুঝতে পারি।'

মানুষটা সত্যিই পাগল—ভাবি আমি।

'তবে এসব অবশ্যই আমার তত্ত্ব মাত্র,' তিনি বলতে থাকেন, 'মানুষের গৌরবময় ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবতে ভালবাসি আমি। শূন্যে ভ্রমণ হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু এটা একদিন বাস্তব হয়ে দাঁড়াবে তাই আমি ভাবতে চাই।'

এক সন্ধ্যায় তিনি হাই তুলছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলাম—দিনের কতোটুকু সময় তিনি ঘুমের জন্য রেখেছেন।

'সাত ঘণ্টা।' জবাবে তিনি বলেন, 'কিন্তু আগামী দশ বছরে ছ ঘণ্টা করে ঘুমোব। পরের কুড়ি বছর পাঁচ ঘণ্টা করে। বুঝলেন, প্রতি দশ বছরে এক ঘণ্টা করে ঘুম কমিয়ে দেব।'

তাঁর বক্তব্যের মাঝেই বলেছি, 'তার মানে তোমার যখন একশো বছর বয়স হবে তখন ঘুমোবে না মোটেই।'

'ঠিক বলেছেন। খাঁটি কথা। একশো বছর বয়সে আমার আর ঘুমের প্রয়োজনই হবে না। আমি বায়ু ভক্ষণ করে বাঁচব—জানেন তো কিছু উদ্ভিদ আছে যারা একেবারেই বায়ুভুক।'

'আজ পর্যন্ত এ কাজে সফল হয়েছে কেউ?'

মাথা নাড়লেন তিনি।

'কেউ সফল হয়ে থাকলেও আমি তার খবর জানি না। এই বায়ু ভক্ষণ করে বেঁচে থাকা আমার একটা তাত্ত্বিক চিন্তামাত্র। ব্যাপারটা ঘটলে মন্দ হয় না—তাই না? অবশ্য অসম্ভবই হয়তো ব্যাপারটা—সেটাই বেশি স্বাভাবিক। বুঝলেন তো, আমি অবাস্তব কাজে বিশ্বাসী নই। বর্তমানকে কখনো ভুলি না। ভবিষ্যতের অতলে এগিয়ে গেলেও সর্বদাই এমন একটা সূত্র রেখে দি, যে সূত্র ধরে আমি বর্তমানে ফিরে আসি।'

এক সময় মনে হয় লোকটা একটা ভাঁড়। তবে তিনি যাই হোন, খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করেন। নিজের আবাদে থাকতে তাঁর ফল-ফলারের দৈনিক মূল্য ছিল পারিশ্রমিক হিসেবে পাঁচ সেণ্ট। আজকাল তাঁর আবাদে যাবার পথ বন্ধ। এই কারণে, এবং শহরের লোকদের মধ্যে সমাজবাদ প্রচার করবার জন্য শহরেই তাঁকে থাকতে হচ্ছে বলে তাঁর দৈনিক ব্যয় ঘর-ভাড়া ধরে পঁচিশ সেণ্ট। আর এই খরচ তিনি যোগাড় করেন স্থানীয় চীনাদের জন্য এক নৈশ বিদ্যালয় চালিয়ে।

খাবারের ব্যাপারে প্রকৃতি-মানবের কোন গোঁড়ামি নেই। জেলে অথবা জাহাজের ডেকে মাংস ছাড়া কিছু জোটে না বলে শুধু মাংস খেয়েই কাটিয়ে দিতে পারেন, অবশ্য

তাঁর প্রিয় খাদ্য বাদাম আর ফলের ঘাটতি হলে। একমাত্র সূর্যকিরণের অভাব ছাড়া তাঁর অন্য কোনো অভাববোধ নেই।

'জলে নোঙর ফেললে কোথাও না কোথাও ওটা বাঁধবেই। তবে তোমার হৃদয় হতে হবে সীমাহীন অতলস্পর্শী সমুদ্র। কুকুর-চানের পুকুর হলে চলবে না।' তিনি বলতেন—'দেখেছ তো, আমার নোঙর কোথাও পাকাপোক্ত হয়ে গেঁথে থাকে না। মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রগতির জন্য আমি বেঁচে আছি। সেই পথেই আমার নোঙর ওঠা-নামা করে। এ ভাবেই আমি বেঁচে থাকব। আর এই পন্থাই আমাকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছে। জঙ্গলে বাস করে ডাক্তারদের বোকা বানিয়েছি। স্বাস্থ্য ও শক্তি সংগ্রহ করেই আমি প্রচার আর বাস্তব উদাহরণ দেখিয়ে অভিযান শুরু করেছিলাম নারী-পুরুষকে প্রকৃতির সন্তান হবার প্রেরণা দিতে। কিন্তু আমার কথায় কেউ কান দেয়নি।'

একটু থেমে তিনি আবার বলেন, 'তারপর, তাহিতি আসবার পথে, জাহাজের এক কোয়ার্টার-মাস্টার আমাকে সমাজবাদে দীক্ষা দিল। আমাকে পথ দেখাল সে। প্রকৃতির মানব-মানবী তৈরি করতে গেলে অর্থনৈতিক সুবিচার আনা আগে দরকার। তাই আমাকে আবার নোঙর করতে হল। এখন আমি সমবায়মূলক যৌথ ধনভোগের জন্য কাজ করে চলেছি। সেই সামাজিক পর্যায়টি এলে তবেই প্রকৃতির ক্রোড়ে স্বভাবত বসবাস সম্ভব হয়ে উঠবে।'

আবার তিনি থামেন। চিন্তার ছাপ কেটে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। বলেন—'কাল রাতে আমি এক স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম—ক্যালিফোর্নিয়া থেকে স্টীমারে চেপে পঁচিশজন প্রকৃতির মানব-মানবী এসেছে। আমি ওদের নিয়ে সেই শুয়োর-চলা পথ ধরে আমার আবাদের দিকে চলেছি।'

আর্নেস্ট ডারলিং! সূর্যোপাসক, প্রকৃতির সন্তান আপনি। একেকটা সময় আসে যখন আপনাকে ঈর্ষা করি আমি। আপনাকে এবং আপনার বন্ধনহীন জীবনকে ঈর্ষা করতে বাধ্য হই। আপনাকে কখনও ভুলব না। আজও স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাই ডারলিংকে। তাহিতি ছেড়ে 'স্নার্ক' যাত্রা করেছে। বন্দরে দাঁড়িয়ে-থাকা সবাইকে বিদায় জানাচ্ছি আমি। গভীর আবেগে বিদায় জানালাম তাঁকেও—এক টুকরো লেংটি-পরা সূর্যের কাঙাল মানুষটিকে। তাঁর ছোট্ট ক্যানোটাতে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।

বারো

প্রাচুর্যের শীর্ষাসনে

'স্নার্ক' নোঙর করে আছে রাইয়াতিয়া দ্বীপে। উতুরোয়া গ্রাম ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে।

গত রাতে অন্ধকারের মধ্যেই স্নার্ক এখানে ভিড়েছে। এখন ডাঙায় যাবার উদ্যোগ করছি আমরা। খুব ভোরেই একটা ছোট্ট কিনারা-তোলা ক্যানো দেখেছিলাম, পাল-দণ্ডটা যার বেয়াড়াভাবে বসানো—লেগুনের ওপর দিয়ে তরতরিয়ে জল কেটে আসছে। ক্যানোটার আকার যেন একটা শবাধারের মতো। মাঝখানটা শুধু খুবলে বের-করা, চোদ্দ ফুট লম্বাই, চওড়ায় বড়ো জোর বারো ইঞ্চি। ভেতরের গভীরতা ফুট দুয়েকই হবে। দুটি প্রান্ত ছুঁচলো, আর দুটো পাশই সিধে খাড়া। কিনারা না থাকলে নৌকোটা বোধহয় এক সেকেণ্ডেই জলে ডুবে যেত। কিনারাজোড়াই নৌকোটাকে যেন সোজা ভাসিয়ে রেখেছে।

আগেই বলেছি, ক্যানোটির পাল বড়ো অদ্ভুত ধরনের। না দেখলে বিশ্বাস তো হবেই না, দেখার পরও বিশ্বাস হতে চাইবে না। পাল উঁচিয়ে-রাখা দণ্ডটা তো এমনিতেই আতঙ্কজনক, তার ওপর মিস্ত্রি নৌকোর মাথাটিকে বানিয়েছে জগদ্দল করে—হালকা হাওয়ায় কোনো পালেরই সাধ্য হবে না ওটাকে নড়াতে। তাই ক্যানোর পেছনদিকে একটা ডাণ্ডা বাঁধা, তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে পালের চালকদণ্ড। এটি শুধু নৌকো নয়, কেবল ক্যানোও নয়—যেন একটি যান্ত্রিক জলযান। এর চালক শুধু শরীরের ওজন ও স্নায়ু সম্বল করেই চালাচ্ছে। বিশেষ করে স্নায়ুর ওপরেই তার নির্ভর।

ক্যানোটা দ্বীপের দিক থেকে বেরিয়ে এ গ্রামের দিকে ছুটে আসছে দেখতে পাই। একজন মাত্র আরোহী কানাতের ওপর ঝুঁকে দমকে-দমকে পালে হাওয়া তুলে ছেড়ে দিচ্ছে।

'নাঃ, ওই ক্যানোটাতে না চড়া অবধি আমি রাইয়াতিয়া ছাড়ছি না!'—আমি জানাই সবাইকে।

কয়েক মিনিট পরেই ওয়ারেন আমাকে ডাকল, 'ক্যানোটার কথা বলছিলেন, ওটা এখানেই এসে গেছে।'

এক দৌড়ে ডেকে উঠে গেলাম। অভ্যর্থনা জানালাম ক্যানোর মালিককে। লম্বা ছিপছিপে গড়নের একজন পলিনেশিয়ান। উজ্জ্বল নির্মল চোখে বুদ্ধির ছাপ। লাল ডগডগে কটিবস্ত্র পরনে, মাথায় খড়ের টুপি। হাতে রয়েছে উপহার সামগ্রী—একটা

মাছ, একগোছা বরজি আর বড়-বড় মিষ্টি আলু। পলিনেশিয়ার একেকটা এলাকায় এখনো যে বৈশিষ্ট্য চালু আছে সেইভাবে হাসিমুখে বারবার করে উচ্চারণ করলাম 'মাউউরু' (মানে তাহিতির ভাষায় 'ধন্যবাদ')।

ইশারা করে জানালাম—ওর ক্যানোতে চড়ে ঘুরে আসতে চাই। খুশিতে ওর মুখ উজ্জ্বল হল। একটিমাত্র শব্দে সে জবাব দিলে—'তাহা'। হাতের ইঙ্গিতে দেখাল তিন মাইল দূরে মেঘে-ঢাকা উঁচু পর্বতের সানুদেশে 'তাহা' নামের দ্বীপটিকে।

সামনের দিকে বাতাস তো সুন্দর, তবে পেছন থেকে মাঝেমাঝে ঝাপটা হাওয়া আসছে। আমার অবশ্য তাহা যাবার ইচ্ছে নেই। রাইয়াতিয়াতে কিছু চিঠিপত্র পৌঁছে দিতে হবে, সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করারও কথা। তার ওপর চার্মিয়ান ডাঙায় যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। অনেক অঙ্গভঙ্গি করে বোঝালাম—ওর ক্যানোতে চড়ে লেগুনে এক চক্কর দিতে পারলেই আমার হবে। ওর মুখ দেখে মনে হল হঠাৎ একটু নিরাশ হয়েছে, তবু হাসি মুখেই সম্মতি জানালো সে।

চার্মিয়ানকে ডাক দিয়ে বললাম, 'নৌকোয় ঘুরবে তো চল। তবে সাঁতারের পোশাকটা পরে নিও, জলে তো ভিজে যেতেই হবে।'

সত্যি! এ যেন বাস্তব নয়, স্বপ্ন। ক্যানোটা জলের ওপর দিয়ে সরসরিয়ে চলেছে রূপোর ছটার মতো। আমি কানাতের ওপর ঝুঁকে শরীরের ভার দিয়ে বসলাম যাতে ক্যানোটা ওজনের চাপে স্থিরভাবে থাকে। ওদিকে ক্যানোর মালিক তেহেঙ্গি নৌকো বাইছে স্রেফ স্নায়ুর জোরে। কিছুটা কিনারায় ঝুঁকে সেও দু হাতে একটা বড় হাল চেপে পা দিয়ে ধরে রেখেছিল প্রধান পালের মাস্তুল গোড়া। এবার পর পর তিনটে ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করল সে। 'রেডি অ্যাবাউট'—বলতে আমি সাবধানে ভেতর দিকে সরে বসি, পালের হাওয়া কমেছে বুঝে ভারসাম্য রাখতে হয়, তারপর 'হার্ড-এ-লী!' বলতেই পুরো ঝুঁকি অপর দিকে। এবার সে বলে, 'অল রাইট!'

তেহেঙ্গির মুখে এই শব্দগুলো শুনে আমার মনে হল কখনো হয়তো সে দেশীয় (কানাকা) মাল্লা হিসেবে কোনো মার্কিনী জাহাজে কাজ করেছে। আমি আকারে ইঙ্গিতে এবং মুখেও বারে বারে প্রশ্নের সুরে বলতে থাকি—'সেলর?' তারপর বিশ্রী ফরাসী উচ্চারণে জিজ্ঞেস করি, 'মেরিন? মাতেলো?' কিন্তু হয় আমার ফরাসী উচ্চারণ বাজে, নয়তো এসব তার অচেনা শব্দ বলেই মনে হল। আশেপাশের দ্বীপগুলোর নাম বলতে লাগলাম আমি। ও মাথা নেড়ে বোঝালো সবগুলো দ্বীপেই সে গেছে। তাহিতির কথা বললাম। ওর চিন্তাভাবনার গতিটা এবার ওর মুখেই দৃশ্যমান। জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে জানালো—তাহিতিতে সে গিয়েছে। আরও কতকগুলো দ্বীপের নাম

সে বলল। তিকিহাউ, রাঙ্গিরোয়া, ফাকারাভা। বুঝলাম—সে পমোটাস পর্যন্ত গিয়েছে এবং নিশ্চয়ই কোন সওদাগরী স্কুনারের মাল্লা হিসেবেই।

লেগুনে স্বল্পকাল চক্কর দিয়ে আমরা জাহাজে ফিরে আসতে সে ইশারায় প্রশ্ন করল—স্নার্ক কোথায় কোথায় যাবে। আমি ভূগোলের পারম্পর্যে সাজিয়ে জানালাম—সামোয়া, ফিজি, নিউগিনি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ক্যালিফোর্নিয়া। 'সামোয়া' শব্দটি উচ্চারণ করে সে অঙ্গভঙ্গির ইশারায় জানালো সেও আমাদের সঙ্গে যেতে চায়। অনেক কষ্ট করে ওকে বোঝালাম জাহাজে আর লোক নেবার মত অবস্থা নেই। ফরাসীতে 'ছোট বোট' বলতে সে বুঝল বটে তবে নিরাশ হল। কিন্তু নীরবে মেনে নেওয়ার হাসিটুকু লেগেই রইল মুখে। তারপর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে পালটা আমন্ত্রণ জানালো ওর সঙ্গে 'তাহা' যাবার জন্য।

আমি আর চার্মিয়ান পরস্পরের দিকে চাই। কিছুক্ষণ আগেকার উল্লসিত ভ্রমণের স্মৃতি দুজনের মনেই এখনও অমলিন। তাই, ভুলে গেলাম রাইয়াতিয়ায় চিঠিপত্র দেবার কথা, সরকারী কর্তাদের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপার। তাড়াতাড়ি জুতো, জামা, প্যান্ট, সিগারেট, দেশলাই আর পড়বার মতো একটি বই রবারের চাদর মুড়ে একটা বিস্কুটের খালি টিনে ভরা হলো। তারপরই আবার আমরা উঠে পড়েছি ক্যানোতে।

ক্যানোর পাল হাওয়ায় ফুলে ওঠে। আমরা সবে হুড়মুড় করে কিনারায় জায়গা নিয়ে বসেছি, এমন সময় ওয়ারেনের গলা শোনা গেল, 'কখন ফিরবেন আপনারা ?'

'বলতে পারব না। ফিরে না আসা পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না।' জবাবে জানাই আমি।

ভেসে চলেছি আমরা। বাতাসের গতি বেড়েছে। পালের জোরে বাতাসকেও হার মানাচ্ছি আমরা। ক্যানোর দুই কানাত (পাটাতন থেকে কিনারা) এত ছোট যে আড়াই ইঞ্চিও হবে না। ছোট ছোট ঢেউগুলো ক্রমাগত লাফিয়ে নৌকোয় উঠছে। অতএব নৌকোর মধ্যেকার জল ছেঁচে বের করা দরকার। এখন ওদের নিয়ম, এই জল ছেঁচে ফেলবার কাজ হল একমাত্র 'ভাহাইন'দের। তাহিতিতে 'ভাহাইন' মানে স্ত্রীলোক। আর নৌকোয় এখন একজন স্ত্রীলোকই আছে, অর্থাৎ কাজের দায়টা প্রকৃতপক্ষে চার্মিয়ানেরই। এ কাজ তেহেঈ আর আমি এমনিতেও করতে পারতাম না, কারণ ক্যানোর কিনারার দিকে বসে আমরা দুজনেই ভারসাম্য বজায় রাখছি যাতে তা উল্টে না যায়। তা, চার্মিয়ান এ কাজ যোগ্যতার সঙ্গেই করল। একটা মান্ধাতা যুগের কাঠের চামচ দিয়ে সে নৌকোর জল বাইরে ছেঁচে ফেলেছে, চমৎকার ভাবে কাজটা সেরে খানিকটা সময় বিশ্রামেরও অবসর পেয়েছে।

রাইয়াতিয়া আর তাহা—ছুটো দ্বীপই এক চক্রাকার ডুবন্ত শৈলপ্রাচীরের মাঝখানে। ছুটোই আগ্নেয়গিরি থেকে উত্থিত। এবড়োখেবড়ো দিগন্তরেখা, আকাশ-মুখী পাহাড়ের চূড়া আর মিনারসদৃশ শৈলশৃঙ্গ। রাইয়াতিয়ার পরিধি তিরিশ মাইল, আর তাহা পনের মাইল বেড় নিয়ে, অতএব যে ডুবো শৈলপ্রাচীর এদের ঘিরে রেখেছে তার বিপুলতাটুকু আন্দাজ করা যায়। দ্বীপ থেকে শৈলপ্রাচীর অবধি এক-দু মাইল জলের বিস্তৃতি—তাই নিয়ে গড়ে উঠেছে সুন্দর লেগুন। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের শাখা সাগর-উপসাগরগুলো তাদের একটানা জলরেখা ধরে আছড়ে পড়ছে শৈলপ্রাচীরের উপর ; প্রবল জলোচ্ছ্বাস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অথচ প্রবালের ভঙ্গুর দেহ তা সহ্য করে বাঁচাচ্ছে দ্বীপগুলোকে, প্রতিহত করছে সমুদ্রের জলাঘাত ! এই বৃত্তের বাইরে ভয়ঙ্কর সমুদ্র যে-কোনো শক্তসমর্থ জাহাজকেও ধ্বংস করে দিতে পারে, অথচ ভেতরে শান্ত স্থির জল। নইলে এমন একটা সরু কানাতওয়ালা ক্যানোর মতো নৌকো পাল তুলে চলতেই পারত না।

লেগুনের জলে আমরা যেন উড়ে চলেছি। আঃ, কি জল ! ঝর্ণার জলের থেকেও পরিষ্কার, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। জলের ভেতর কতো কিছু দৃশ্যমান, কী রঙের বাহার ! দেখলে পাগল হয়ে যেতে হয়। যেন আসল রামধনুকেও হার মানায় সেই রঙীন রামধনুর রেখা, আর জলের রঙ পালটায় ক্ষণে-ক্ষণে। এই হয়তো ক্যানোটা বেগুনি-লাল জলের উপর দিয়ে সাঁতরে গেল। তারপরেই পড়ল ঝলমলে ধবধবে সাদা জলের উপর, কারণ নিচে জমে আছে প্রবালের চূর্ণ বালি। আর উপরে নড়ে বেড়াচ্ছে দানবাকৃতি মন্থরগতি সমুদ্র-শামুকেরা। যে মুহূর্তে আমরা প্রবালের আজব বাগান অতিক্রম করছি দেখি রঙীন মাছেরা সমুদ্রের প্রজাপতির মতো ছুটে পালাচ্ছে। পরের মুহূর্তেই হয়তো আমরা গভীর খাতের ওপর দিয়ে কালো জল পার হলাম। সেখানে আমাদের সাড়া পেয়ে অসংখ্য উড়ুক্কু মাছ রুপোলি ডানা মেলে শূন্যে ঝাঁপ দিল। পরমুহূর্তে আমরা হয়তো জ্যান্ত প্রবালের বাগানে ঢুকে গেলাম যার একেকটা দৃশ্য আগের চেয়েও বিস্ময়কর। এদের সবার ওপর দিয়ে ছেয়ে রয়েছে নিরক্ষীয় আকাশ—বাণিজ্য বায়ু তাড়িত ফুলো-ফুলো মেঘের পাল সেই উঁচু আকাশের সীমা ছুঁয়ে দিগন্তে গিয়ে জমা হচ্ছে তুলোর পাঁজের মতো।

কিছু বোঝবার আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম 'তাহা'র কাছে (ছুটো অক্ষরেই জোর দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়—তাঃ হাঃ)। তেহেঈ দাঁত বের করে হেসে তারিফ জানাচ্ছিল 'ভাহাইনে'র জল ছেঁচার কেরামতিতে। অগভীর পাড়ে ভিড়েছিল ক্যানোটা —ডাঙা থেকে কুড়ি ফুট দূরেই। জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পায়ের তলায় নরম

ঠেকে—বড়ো সমুদ্র-শামুকেরা সেখানে এঁকেবেঁকে মোচড় খাচ্ছে, আর ক্ষুদে অক্টোপাসের দল অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে তাদের অতি নরম দেহের ওপর আমাদের পা পড়লেই।

সমুদ্রের পাড় ঘেঁষেই তেহেঙ্গর বাড়ি। নারকেল, পাম আর কলাগাছে ঘেরা বাড়িটা বাঁশের তৈরি, যেন রণ-পা'র ওপরে খাড়া। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তেহেঙ্গর 'ভাহাইন'। পাতলা ঋজু শরীর, সহৃদয় নয়ন। আদলটা মঙ্গোলিয়ান বটে—তবে নিশ্চয়ই উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মতো নয়।

'বিহাউরা!' ওকে ডাকল তেহেঙ্গ। প্রত্যেকটা অক্ষরেই জোর : বি-হা-উ-রা। তেহেঙ্গর স্ত্রী এসে চার্মিয়ানের হাত ধরে তাকে নিয়ে চলল বাড়ির ভেতরে। পিছনে চললাম আমি আর তেহেঙ্গ। এখানে, ইশারার ভাষায় ভুল বোঝাবুঝি নেই—আমরা পরিষ্কার জানলাম যে, ওরা যা কিছুর মালিক সে সব কিছুই আমাদেরও সম্পত্তি। পৃথিবীর কোনো অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিও বোধহয় এত উদার হবে না। আর আমার এটুকুও জানা আছে, অভিজাতরা ব্যবহারিক জীবনে কজনই বা এত উদার হয়! কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বুঝে নিলাম—ওদের জিনিসপত্তরের প্রশংসা না করাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ, কেননা, কোনো একটা কিছুর প্রশংসা করতে-না-করতেই বস্তুটি আমাদের উপহার দেওয়া হচ্ছে।

আর, দুটি 'ভাহাইন'—ভাহাইনদের চিরাচরিত নিয়মেই—মত্ত হয়ে গেছে মেয়েলি সাজপোশাক গেরস্থালির আলোচনায়। এদিকে আমি আর তেহেঙ্গ পুরুষোচিত ঢঙে মেতে উঠলাম মাছধরা বঁড়শি আর বুনো শুয়োর শিকারের বিষয় নিয়ে—জোড়া ক্যানোতে চড়ে কীভাবে চল্লিশ ফুট লম্বা ছিপ দিয়ে বনিটা-মাছ ধরা যায়।

এর মধ্যে চার্মিয়ান একটা সেলাই জিনিস রাখা ঝুড়ির প্রশংসা করে ফেলেছে। ঝুড়িটা পলিনেশিয়ার বুননশিল্পের একটি সেরা নমুনা বলে তার মনে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা চার্মিয়ানের হয়ে গেল। আমি তারিফ করেছিলাম মুক্তো-ঝিনুকের গোটা খোল থেকে তৈরি একটা বনিটা ধরা বঁড়শির। সঙ্গে সঙ্গে ওটা 'আমার' হয়ে গেল।

চার্মিয়ানের দৃষ্টি পড়েছিল নজর-কাড়া একটি ঘাসের বোনা পাটির ওপর। তিরিশ ফুট লম্বা গোটানো পাটিখানা যা দিয়ে স্বচ্ছন্দে যে কোনো নকশার মহিলা-টুপি বানানো চলে। তা সেটি এখন চার্মিয়ানের সম্পত্তি হয়ে গেল। প্রস্তর-যুগের আমলের একটা 'পোই' কুটবার আধারের দিকে আমার খানিকক্ষণের জন্য নজর পড়েছিল। ব্যাস, ওটি এখন আমার হয়ে গেল। চার্মিয়ান বুঝি একটু বেশিক্ষণ একটা কাঠের তৈরি 'পোই'-পাত্রের দিকে তাকিয়েছিল। ক্যানোর আকারের পাত্রটির চারটি পায়াই একটি খণ্ড কাঠ কুঁদে তৈরি। সেটাও চলে এল চার্মিয়ানের দখলে। একটা বিশালাকৃতি

নারকেলের মালার উপর আমার দৃষ্টি দুবার পড়েছিল, অতএব সেটি এখন আমার দখলে।

চার্মিয়ান আর আমি এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম। আর কোনো জিনিসের তারিফ করা হবে না এই হল স্থির। বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তা ছাড়া এতসব জিনিসের প্রতিদানে উপহার দেবার মতো উপযুক্ত সামগ্রী স্নার্কেই বা কতোটুকু আছে? পলিনেশিয়ার উপহার বিতরণ উৎসবের কাছে আমাদের ক্রিস্‌মাসের উপহার দেওয়ার ঝামেলা তো একেবারেই নগণ্য!

আহারের জন্য যখন রান্নাবান্না চলছে, বিহাউরার সেরা মাদুরটি আমরা পেতে বসেছি শীতল আঙিনায়। গ্রামের লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও চলছে। কখনো দু-তিনজন, কখনো দল বেঁধে তারা আমাদের করমর্দন করে—আর তাহিতির ভাষায় সম্ভাষণ জানায় 'ইয়োরানা' বলে। পুরুষরা ভারিক্কি আর দীঘল চেহারার। কটিবস্ত্র পরা। দু-একজনের আবার উর্ধ্বাঙ্গে জামাও নেই। এদিকে মহিলাদের সবারই পরনে 'আহু' (আঙরাখা), কাঁধ থেকে মাটি অবধি লুটিয়ে-পড়া মনোরম পোশাক।

কিন্তু দেখে ব্যথা পেলাম—কারুর কারুর দেহে গোদের আক্রমণ হয়েছে। কোনো মহিলাকে হয়তো দেখা গেল, কী কমনীয় সুঠাম গড়নের শরীর, মহারানীর মতো চলাফেরা, অথচ সব নষ্ট করেছে একটা হাত, অন্য হাতটার চেয়ে হয়তো সেটা চার গুণ, চার গুণ কেন বারো গুণ, মোটা। তার পাশেই হয়তো দাঁড়িয়ে আছে ছ ফুটের এক মানুষ, ঋজু, পেশীসমৃদ্ধ, ব্রোঞ্জের মতো রঙ, মনে হয় যেন দেবতার শরীর। কিন্তু পায়ের দিকে তাকাও—বিশ্রীভাবে ফোলা। যেন দুটো পা নয়, একটাই। আকার-বিহীন দানবের পা। হাতির পায়ের মতো।

মনে হয় দক্ষিণ-সমুদ্রের এই এলিফ্যানটিয়াসিস্ রোগটির প্রকৃত কারণ কেউই ভাল করে জানে না। একটি মত অনুযায়ী পানীয় জলের দূষণই এর কারণ। ভিন্ন মতে, মশার কামড় থেকেই এ রোগের উৎপত্তি। তৃতীয় তত্ত্ব হল—একটা পূর্ব-প্রবণতার সঙ্গে যোগ হয়েছে পরিবেশের সঙ্গে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে যাবার প্রবৃত্তি।

অন্যপক্ষে আবার—এই রোগ বা এধরনের অন্য রোগের ভয়ে যারা কম্পমান তারা কোনোদিনই দক্ষিণ-সমুদ্রে ভ্রমণের উপযুক্ত হবে না। এমন ভ্রমণকারীকে তো এক সময় জলপান করতেই হবে। মশার কামড়ও হয়তো মাঝে মাঝে বন্ধ থাকবে, কিন্তু ভয়কাতুরে মানুষের সব রকমের সাবধানতাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। সমুদ্রে কেউ খালি পায়ে চান করতে গেলে তাকে মাড়িয়ে যেতে হবে এমন জায়গা যেখানে একটু আগেই একজন আক্রান্ত ব্যক্তি হেঁটে গেছে। কোনো লোক রোগের ভয়ে নিজের ঘরে বন্দী

থাকলেও তার প্রত্যেকটি সুপরিষ্কৃত তাজা খাদ্যেও থাকবে বীজাণুর সংক্রমণ—তা সেই খাদ্য মাংস, মাছ, পাখি বা সবজি যাই হোক না কেন। পাপিতির বাজারে দুজন সর্বজনপরিচিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত লোক দোকান চালায়। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন প্রতিদিন বাজারে যে শাক-সবজি, মাছ, ফল, মাংস আসে, তা কোথা থেকে, কার হাত দিয়ে আসে।

দক্ষিণ-সমুদ্রে ভ্রমণ করতে হলে একটাই নিশ্চিন্ত পথ আছে। কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে, আগে থেকেই কিছু আশঙ্কা না করে নিজের গ্রহের ওপর ভাগ্যকে ছেড়ে দিন প্রকৃতি-নিরাময়ে বিশ্বাসী সাধুদের মতো। আপনি হয়তো কোনো গোদ-রোগাক্রান্ত মহিলাকে দেখছেন আপনার জন্য নারকেলের শাঁসের দুধ বের করে দিচ্ছে খালি হাত দিয়ে। আপনাকে সেই দুধ-নিংড়োনো হাতের কথা ভুলে স্রেফ পানীয়টার তারিফ করতে হবে, ভাবতে হবে কী খাসা জিনিস খেলাম। আর এটাও মনে রাখবেন যে এলিফ্যানটিয়াসিস্ এবং কুষ্ঠ ব্যারামগুলো হয়তো স্পর্শ থেকে সংক্রামিত ব্যাধিই নয়।

একটি রারাটোঙ্গান মেয়েকে দেখেছিলাম আমাদের জন্য ফুলো বিকৃত হাতে নারকেলের শাঁস বের করেই চলে গেল রান্নাঘরের দিকে যেখানে বিহাউরা আর তেহেঙ্গি আমাদের রান্নার কাজে ব্যস্ত। এবার সেই খাবার পরিবেশন করা হল একটা শুকনো কাঠের বাক্সের ওপর। যতোক্ষণ না আমাদের ভূরিভোজন শেষ হল ততোক্ষণ গৃহস্বামীর লোকজন সবুর করে রইল, তারপর তাদের খানা সাজানো হল মেঝেব ওপর আসন পেতে। আমাদের সেই ভূরিভোজন? প্রাচুর্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না—একেবারে শীর্ষাসনের প্রাচুর্য! প্রথমে এল লোভনীয় কাঁচা মাছ, কয়েক ঘণ্টা আগে ধরা হয়েছিল সমুদ্র থেকে, তারপর লেবুর রস আর জলে জারিত হয়েছে অনেকটা সময়। এর পর এল ঝলসানো মুরগি। পানীয় হিসেবে ছিল দুটো করে তীব্র মিষ্টি নারকেলের জল। সঙ্গে কলা, স্ট্রবেরির মতো যার স্বাদ, মুখে দিলেই গলে যায়। কলা দিয়ে তৈরি 'পোই'। কোন ইয়াঙ্কীর উর্ধ্বতন পুরুষরাও এমন পুডিং বানাবার কথা ভাবতেই পারতেন না। পাতে পড়ল সেদ্ধ মিষ্টি আলু, কন্দ। কলার মতই দেখতে, বেশ বড় আর রসভরা ভাজা 'ফেই'। এই বিপুল খাদ্যসম্ভার দেখেই যখন আমরা তাজ্জব বনে যাচ্ছি এমনি সময়ে এল শুয়োর। পুরো একটি বাচ্চা শুয়োর, পাতায় জড়িয়ে স্থানীয় প্রথায় গরম পাথরের তন্দুরে ঝলসানো। পলিনেশিয়ার খাদ্যতালিকায় এটি শীর্ষস্থানীয় খাবার, অতিথিকে সর্বোচ্চ সম্মান জানাবার পন্থা। সবশেষে পরিবেশিত হলো কফি। কালো অপূর্ব স্বাদের এই কফি তাহার পাহাড়ের ঢালে চাষ করা হয়। তেহেঙ্গিয়ের

মাছধরা সরঞ্জাম আমাকে দারুণ আকৃষ্ট করেছিল। তাই মাছ ধরতে যাবার ব্যবস্থা করে চার্মিয়ান আর আমি রাতটা এখানে থেকে যাওয়াই সাব্যস্ত করি। তেহেঈ আবার সামোয়া যাবার কথা তুলল। আবার আমি 'ছোট নৌকার' দোহাই দিতে সে ক্ষুণ্ণ হল, কিন্তু তবু তার সেই মেনে-নেওয়ার হাসি ঠিক রয়েছে। আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল বোরা-বোরা। এখান থেকে দূর বেশি নয়, তবে স্থানীয় বোটগুলো শুধু রাইয়াতিয়ার দিকেই চলাচল করে বেশি, তাই তেহেঈকে আমন্ত্রণ জানাই অন্তত সেটুকু পথ সে স্নার্কে চড়েই যেতে পারে। পরে জানতে পারলাম বিহাউরা নাকি বোরা-বোরাতেই জন্মেছে, এখনও ওদের একটা বাড়ি আছে সেখানে। অতএব, তাকেও আমন্ত্রণ জানানো হল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের পালটা আমন্ত্রণ এল, বোরা-বোরায় ওদের বাড়িতেই থাকতে হবে। আজ সোমবার। কাল মাছ ধরে রাইয়াতিয়া ফিরব। পরশু বুধবার আমরা তাহা'র পাশ দিয়ে যাবার সময় মাইল খানেক দূরে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তেহেঈ ও বিহাউরাকে তুলে নেব। তারপর একসঙ্গে যাওয়া যাবে বোরা-বোরা।

এই সব ব্যবস্থা বিশদভাবে করা হল, আরো অনেক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হল, কিন্তু সবই আমাদের 'বহুভাষিক' ভাষায়। ইংরেজির তিনটি মাত্র কথা জানে তেহেঈ। চার্মিয়ান আর আমার জানা আছে বড় জোর এক ডজন তাহিতি শব্দ আর চারজনেরই ফরাসী শব্দ কিছু জানা আছে যা সকলের বোধগম্য। অবশ্য এমন বহুভাষিক আলোচনার গতি শ্লথই হবার কথা, তবে কাগজ-পেন্সিলের সাহায্যে চার্মিয়ান যখন ঘড়ির ছবি আঁকলো আর আমরা অজস্র অঙ্গভঙ্গি করে সবকিছু বোঝালাম, তখন বলতেই হবে সুন্দরভাবে কথাবার্তা চালানো গিয়েছে।

এবার আমাদের ধরনধারণে ঘুম পেয়ে যাবার ইঙ্গিত পেতেই বাসিন্দারা 'ইয়োরানা' জানিয়ে বিদায় নিল। তেহেঈ ও বিহাউরাও চলে গেল। বাড়িতে একটাই বড়ো কামরা, আমাদের জন্য সেটি ছেড়ে দিয়ে গৃহস্থরা অন্যত্র শুতে চলে গেছে। সত্যি বলতে ওদের প্রাসাদটাই আমাদের দখলে। এখানে একটা কথা বলে রাখছি। পৃথিবীতে বহু মানুষ ও জাতির কাছে বহু আদর অভ্যর্থনা পেয়েছি, কিন্তু তাহা'র এই বাদামী দেহবর্ণের দম্পতিটির আদর অভ্যর্থনার সঙ্গে সে-সবের তুলনাই হয় না। আমি উপহার, অনায়াস উদারতা বা ভোজনপ্রাচুর্যের কথা বলছি না। বলছি তাদের সূক্ষ্ম সৌজন্যবোধ, উপলব্ধি, বিচক্ষণতা আর সহানুভূতির কথা—এ সহানুভূতি পারস্পরিক বোধ থেকেই আসে। ওদের নিরিখ অনুযায়ী, আমাদের জন্য করতেই হবে এমন কাজ তারা করেনি, কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রয়োজনগুলো জ্ঞানচক্ষু দিয়ে ঠিকমতো বুঝে নিয়েছে।

ওদের এই অনুভূতি সর্বত্রই সফল প্রতিপন্ন হয়েছে। এই ক'দিনের সাহচর্যে ওদের অসংখ্য ছোটখাটো উপলব্ধিময় কাজের যা নমুনা পেয়েছি, তার পরিমাপ করা অসম্ভব হবে। এটুকুই শুধু বলা যায় যে ওদের অতিথিপরায়ণতা ও সহমর্মিতার সমকক্ষ কিছুই তো দেখিনি, আমাদের ধারণায় এমন ধরনের জিনিসই প্রায় নজরে পড়েনি। অথচ সবচেয়ে আনন্দের কথা, এর পেছনে ওদের কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না, সামাজিক কোনো জটিল আদর্শও অনুপস্থিত। এই শিক্ষাহীন অতিথিবাৎসল্য ওদের হৃদয়ের অন্তস্তল থেকেই উৎসারিত।

পরদিন সকালে তেহেঙ্গি, আমি আর চার্মিয়ান মাছ ধরতে গেলাম সেই শবাধার আকৃতির ক্যানোতে চড়েই। তবে বিরাট পালখানা আমরা ছেড়ে এসেছি। নৌকো বাওয়া ও মাছধরা—দুটো কাজ একসঙ্গে ওই ছোট ক্যানোটাতে হয় না। বেশ কয়েক মাইল দূরে, শৈলপ্রাচীরের ভেতরে কুড়ি হাত গভীর একটা প্রণালীর মধ্যে আদিম কায়দায় তেহেঙ্গি তার টোপ-গাঁথা বড়শি আর ভারি সীসা ফেলেছে। অক্টো-পাসের টুকরো হল মাছ ধরবার টোপ। ভাসন্ত বাঁশের ফাত্‌নার সঙ্গে সুতো বেঁধে সে ন'টা ছিপ ফেলেছে। মাছ পড়লে সে কী উত্তেজনা আমাদের! দু'তিন ফুট লম্বা চমৎকার মাছ ধরা হল কয়েকটা। কিন্তু খানিক বাদেই নামল জোর বৃষ্টি। আমরা তাড়াহুড়ো করে ফিরে চলি। খাড়ির সৈকতে বিহাউরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। চার্মিয়ানকে ধরে সে এমনভাবে বাড়িতে নিয়ে গেল যেন একটা দুষ্টু মেয়ে এতক্ষণ কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করছিল—তার মা তাকে ধরেছে এবার!

জামাকাপড় ছেড়ে শুকনো পোশাক পরে আমরা নীরবে ধূমপান করে চলেছি। এই ফাঁকে তৈরি হচ্ছে আমাদের 'কাই-কাই'। পলিনেশিয়ার ভাষায় 'কাই-কাই' মানে খাওয়া বা খাবার। তা, মানে যাই হোক না কেন, বৃষ্টির মধ্যে দীর্ঘ পথ বৈঠা চালিয়ে এসে এ শব্দটাকে আমরা স্বাগতই জানাই। আবার চলল সেই খানাপিনা—আমাদের প্রাচুর্যের উচ্চাসন। জিরাফ বা উটের মতো আমাদেরও লম্বা গলা কেন হল না বলে আপসোসই হচ্ছিল।

'স্নার্ক'-এ ফিরে যাবার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি এমন সময় আবার আকাশ কালো করে ঝোড়ো বৃষ্টি। তবে এবারে বৃষ্টি কম কিন্তু হাওয়ার জোর বেশি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে হু-হু করে বয়ে চলল বাতাস, তালগাছগুলোকে দুলিয়ে, আর্তনাদ তুলে, গুড়িয়ে গুড়িয়ে। বাঁশের তৈরি এই ঠুনকো বাড়িটাকে যেন সজোরে ঝাঁকাতে লাগল। আর লেগুনের শৈলপ্রাচীরে জাগল বজ্রনাদ—উত্তাল সমুদ্রের প্রচণ্ড আছড়ানি সামলাবার প্রয়াসে। লেগুনের ভেতর দিকটা নিরাপদ আশ্রয়ে থেকেও যেন ক্ষেপে শাদা হয়ে

উঠেছে। তেহেঙ্গীর মত দক্ষ ক্যানো চালকের হাতেও এখন তার নৌকো ভরাডুবি থেকে বাঁচে কিনা সন্দেহ।

বিকেলের দিকে ঝড়ের বিষ দাঁত ভাঙল বটে তবু ক্যানোটার পক্ষে এ যাত্রা এখনও দুরূহ। শেষ পর্যন্ত তেহেঙ্গীর সহায়তায় রাইয়াতিয়া যাবার জন্য একজন স্থানীয় লোকের 'কাটার' (ডিঙি নৌকো) পাওয়া গেল। মাত্র দু'ডলারে সে এই ঝুঁকি নিতে রাজি। আমাদের দেশে এর মূল্য নব্বই সেন্ট। অর্ধেক গ্রামবাসী আমাদের জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে এসেছিল তেহেঙ্গী আর বিহাউরার তাগিদে। মুরগি, কচি পাতায় মোড়া রান্না মাছ, সোনালি রঙের বড় বড় ছড়া কলা, পাতার ঝুড়ি থেকে উপচে পড়ছে কমলালেবু আর অন্যান্য লেবু। বড় বড় ঝুড়িতে মিষ্টি আলু, কন্দ আর নারকেল। অবশেষে এল গাছের গুঁড়ি আর ডালপালা, যা স্নার্কের রান্নার জ্বালানি কাজে লাগবে।

ডিঙি নৌকোয় চড়বার আগে দেখা হলো তাহা'র একমাত্র শ্বেতকায় মানুষের সঙ্গে —জর্জ লাফকিন—নিউ ইংলণ্ডের বাসিন্দা। ছিয়াশি বছর বয়সের মধ্যে ষাট বছরই কাটিয়েছেন সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জে। মাঝে মাঝে শুধু কয়েকবার বাইরে গেছেন যেমন এল ডোরাডোয় সোনার সন্ধানে। ১৮৪৯ সালে কিছুদিন ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে খামার বাড়িও করেছিলেন। ডাক্তারদের মতে ওঁর আর তিন মাসের বেশি আয়ু নেই শুনে তিনি দক্ষিণ-সমুদ্রেই আবার ফিরে আসেন। এখন তো তাঁর বয়স ছিয়াশি। উনি এখন মুখ টিপে হাসেন—সেই ডাক্তাররাই এখন কবরের নিচে চলে গেছে। লাফ-কিনেরও গোদ আছে—স্থানীয় ভাষায় যাকে বলা হয় 'ফে-ফে' বা এলিফ্যানটিয়াসিস্। পঁচিশ বছর আগে এই রোগ তাঁকে ধরেছিল, আমৃত্যু সঙ্গী হয়েই থাকবে। ওঁর আত্মীয়-স্বজনের কথা জিজ্ঞেস করা হলো। লাফকিনের পাশেই বসেছিল একজন ষাট বছর বয়েসী ফুর্তিবাজ মহিলা—ওঁর মেয়ে। 'আমার যা কিছু বলতে তো ও-ই।' বিষণ্ণকণ্ঠে লাফকিন বলেন, 'আর ওরও কোনো সন্তান বেঁচে নেই।'

কাটার ডিঙিটা ছোটখাটো হলেও তেহেঙ্গীর ক্যানোর পাশে বড়োই দেখায়। তবুও লেগুনে পৌঁছে যখন আর এক ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় পড়ি তখন ওটাকেই খুদে বলে মনে হচ্ছিল, আর সে তুলনায় স্নার্ক কতো মজবুত। ওর মাল্লারা অবশ্য সবাই নিপুণ। তেহেঙ্গী আর বিহাউরা সঙ্গে চলেছে আমাদের এগিয়ে দিতে। বিহাউরা এবার প্রমাণ দিল সেও নৌকো চালনার কাজে কম নিপুণ নয়। কাটারটা ভালোভাবেই তাল বজায় রেখে পুরো পাল তুলে ঝড়ের মুখোমুখি হল। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছিল। লেগুনের মাঝে মাঝেই প্রবালের ঢিবি, কিন্তু সবকিছু বাঁচিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই প্রবালের ঢিবি বাঁচিয়ে পাশ কাটাতে গিয়ে জলের সামান্য

নিচের প্রবাল-চড়ায় আটকে গেল কাটার। পালগুলো আলগা করে তবে এই বাধা পেরিয়ে যাওয়া হলো। তিন-তিনবার এই অবস্থায় পড়েছি আমরা এবং উদ্ধারও পেয়েছি পালগুলো আলগা ছেড়ে দিয়ে।

আবার নিজের পথে যাত্রা করার আগেই অন্ধকার নেমে এল। আমরা অনুকূল হাওয়ায় স্নার্কের দিকেই এগোচ্ছিলাম। এদিকে প্রবল বাতাসও গজরাচ্ছে। অন্ধকার, ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে স্নার্ককে আমরা খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। প্রবালের ঢিবিতে ঠেকে গিয়েছিলাম। এক ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের পর স্নার্কের পাশে কাটারটাকে ভেড়াতে পেরেছিলাম নিরাপদে!

যেদিন বোরা-বোরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম সেদিন বাতাসের আর জোর নেই। ইঞ্জিন চালিয়ে লেগুন পার হয়ে সেখান থেকে তেহেঙ্গ আর বিহাউরাকে তুলে নেবার কথা। সেখানে তো হাজির হলাম, কিন্তু উঁচু প্রবালঘেরা জায়গাটাতে অনেক খুঁজেও আমাদের সেই বন্ধুদের সন্ধান পেলাম না। তাদের কোনো চিহ্নই নেই।

'আর অপেক্ষা করা চলে না।' বলি আমি, 'বাতাসের যা হাল তাতে বোরা-বোরা পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। খুব প্রয়োজন ছাড়া গ্যাসোলিনের ব্যবহার করতে চাই না আমি।' দক্ষিণ-সমুদ্রে গ্যাসোলিন এক বড় সমস্যা। কখন আবার কোথায় যে নতুন করে মজুত করে নেওয়া যাবে কেউ বলতে পারে না।

সেই মুহূর্তে তেহেঙ্গকে দেখা গেল গাছের ফাঁক দিয়ে জলের দিকে নেমে আসতে। শার্টটা গা থেকে খুলে সেটা পাগলের মতো নাড়ছে। ওকে তুলে নেওয়া হলো। আসলে বিহাউরা তৈরি হতে পারেনি বলেই এই দেরি। তেহেঙ্গ ইশারা করে জানালো—জাহাজ একেবারে ওদের বাড়ির সামনে ভেড়াতে হবে। সে নিজেই জাহাজের হাল ধরল। প্রবালের একেকটা ঢিবি এড়াতে এড়াতে শেষ ঢিবিটাও ডিঙিয়ে যাওয়া গেছে। পাড় থেকে স্বাগত-ধ্বনি আসছিল। কিছু গ্রামবাসীর সহায়তায় দুটি ক্যানো বোঝাই করে বিপুল খাদ্যসামগ্রী নিয়ে হাজির হয়েছে বিহাউরা। আবার সেই মিষ্টি আলু, কন্দ, ফেই, রুটিফল, নারকেল, লেবু ও কমলালেবু, আনারস, তরমুজ, বেদানা, মাছ, প্রচুর মুরগি। মুরগিগুলো চিৎকার চেঁচামেচি করছে। কয়েকটা তো জাহাজের ডেকেই ডিম পেড়ে দিল। আর আছে জ্যান্ত একটা শুয়োর। ওটা বোধ হয় জেনেই ফেলেছিল ওর জবাই আসন্ন, তাই বিচ্ছিরিভাবে চেঁচাচ্ছে।

উদীয়মান চাঁদের আলোয় বোরা-বোরার বিপজ্জনক শৈলপ্রাচীরের পথ পেরিয়ে আমরা নোঙর ফেললাম ভাইতাপে নামে একটা গ্রামের অদূরে। আমাদের জন্য

বিপুল ভোজ তৈরি করতে হবে, তাই আর তর সইছিল না বিহাউরার—গৃহকর্ত্রীর যা দুশ্চিন্তা। বাড়ি যাবার জন্য ছটফট করছিল সে। জাহাজের লঞ্চ তেহেঙ্গ আর ওকে নিয়ে ছুটল ছোট জেটিটার দিকে। শান্ত লেগুনের পাড় থেকে ভেসে আসছে গান বাজনার হৈ-হল্লা। সোসাইটি দ্বীপের সর্বত্রই আমাদের একনাগাড়ে জানানো হয়েছে, বোরা-বোরার অধিবাসীরা নাকি খুব ফুর্তিবাজ। চার্মিয়ান আর আমিও এবার দেখবার জন্য ডাঙায় নেমেছি। গ্রামের সবুজ মাঠে দেখা গেল নৃত্যরত যুবক-যুবতীদের। সর্বাঙ্গে ফুলের সজ্জা, গলায় ফুলের মালা। ওদের মাথার চুলে গোঁজা রয়েছে অদ্ভুত এক ধরনের ফুল যা স্বয়ংপ্রভ, জোছনার আলোয় কখনো স্তিমিত, কখনো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সমুদ্রপাড় ধরে আরো খানিক এগোতে আমরা এসে পড়লাম একটা ঘাসে-ছাওয়া বিশাল কুটিরের সামনে—সত্তর ফুট লম্বা, ডিম্বাকৃতি বাড়িটা। এখানে গাঁয়ের বুড়োবুড়ীরা ধর্মসঙ্গীত গাইছিল। এরাও ফুলের মালা গলায় পরেছে, খুশিতে ঝলমল। এমনভাবে তারা আমাদের নিজেদের দলে টেনে নিল যেন আমরা কতোকালের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া মেষশাবক।

পরদিন ভোরেই তেহেঙ্গ জাহাজে উঠে এল, সঙ্গে সুতোয় বাঁধা সদ্যধরা একসার মাছ। সেদিন সন্ধ্যের সময় ওদের নৈশভোজে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ করে গেল আমাদের। নৈশভোজে যাবার পথে বুড়োবুড়ীদের সেই 'ধর্মগীত ভবনে' দাঁড়ালাম। সেই বয়স্ক লোকরাই গান গাইছে, শুধু মাঝেমধ্যে আছে দু'একজন তরুণ-তরুণী যাদের আগের রাতে দেখিনি। চারদিক দেখে মনে হলো একটা ভোজের আয়োজন চলছে। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ফল ও শব্জির রীতিমতো পাহাড়, তার দু পাশেই নারকেলের দড়িতে বাঁধা অজস্র মুরগি। বেশ কয়েকটি স্তবগানের পর একজন উঠে ভাষণ দিতে শুরু করল, আমাদের উদ্দেশেই, অবশ্য তার ভাষা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হলেও তা যে আমাদের সঙ্গে এই বিপুল ভোজের আয়োজনের একটা সম্পর্ক বোঝাবার জন্যই তাতে সন্দেহ রইল না। চার্মিয়ান ফিসফিস করে চাপা গলায় বলে—'এত সব জিনিস আমাদেরই উপহার দিচ্ছে না তো?'

'অসম্ভব।' বিড় বিড় করে জবাব দিই, 'আমাদের কেন উপহার দেবে? তাছাড়া স্নার্কে এত মাল রাখবার জায়গাই বা কোথায়? এর সামান্য অংশটুকুও তো আমরা খেতে পারব না। বাকি সব নষ্টই হবে। আমাদের ডেকে খাওয়াচ্ছে এই পর্যন্তই মনে হয়—যাহোক এগুলো আমাদের উপহার বলে মোটেই মনে হচ্ছে না।'

মোটের ওপর আবার সেই মহাপ্রাচুর্যের উঁচু মসনদে বসেছি আমরা। সেই বক্তা লোকটি এবার নির্ভুল ইশারার সাহায্যে প্রথমে প্রতিটি পদের একেকটি করে রাখল

আমাদের সামনে। তারপর সমস্ত খাদ্যসামগ্রীই পুরোপুরি ধরে দিলে উপহার হিসেবে। আমাদের তখন যে বিব্রত অবস্থা সে আর কী বলব! স্নার্কে এত সব রাখবার জায়গাই নেই, তাহা'র অঢেল উপহারেই ঠাসা হয়ে আছে। তার ওপর এই নতুন সরবরাহ বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। খাদ্যসামগ্রীর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা অস্বস্তিতে ভুগি, কথায় তোতলামি এসে যায়। বারে বারে আমরা ধন্যবাদ জানাই ওদের। এতে আমাদের বিহ্বলতা আর অশেষ কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পায় শুধু। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আকারে-ইঙ্গিতে এও জানাই যে এই উপহার আমরা গ্রহণ করতে অপারগ। সেটাই হয়ে গেল আমাদের গুরুতর অভদ্রতার প্রকাশ। স্তব-গায়করাও অসন্তোষ জানালে সরাসরি ভাবভঙ্গি করে। অবশেষ সেই রাত্তিরে, তেহেঈর মধ্যস্থতায় আমরা এক সমঝোতায় এলাম। একটি মুরগি, একছড়া কলা, একগুচ্ছ কন্দ— এমনি ভাবে সমস্ত জিনিসেরই এক একটা করে গ্রহণ করে তবে রেহাই পেলাম।

কিন্তু প্রাচুর্যের হাত থেকে কি রেহাই আছে? গ্রাম দেশে একজন স্থানীয় লোকের কাছ থেকে এক ডজন মুরগি কিনেছিলাম। পরের দিন সেই লোকটি আমাদের মুরগি উপহার দিল, সঙ্গে এক ক্যানো ভর্তি ফল। ফরাসী স্টোর-কিপার আমাদের উপহার দিলেন ডালিম ফল, আর সেই সঙ্গে তার সব থেকে সেরা ঘোড়াটা চড়তে দিলেন। ফরাসী রক্ষীবাহিনীর লোকটিও একটি ঘোড়া দিল চড়বার জন্য, সেটি তার নয়নের মণি। সকলেই আমাদের ফুল পাঠিয়েছে। স্নার্কের অবস্থা দাঁড়িয়েছে—যেন একটা ফল ও মুদিখানার দোকান। আর আমরা গলায় মালা ঝুলিয়ে কেবলই এদিক ওদিক ঘুরি। ধর্মসঙ্গীত-গাইয়ের দল যখন জাহাজে এল গান গাইতে, ওদের কুমারী কন্যারা আমাদের আবাহন জানিয়ে চুম্বন করল। আর সেই মুহূর্ত থেকে আমাদের ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে কেবিন বয় পর্যন্ত সবাই হৃদয় সমর্পণ করল বোরা-বোরার কুমারীদের কাছে। আমাদের সম্মানে তেহেঈ মস্ত এক মাছ-ধরা অভিযানের আয়োজন করেছিল। একটা জোড়া-ক্যানোতে চড়ে আমরা বেরুলাম। দাঁড় বাইছে এক ডজন দীর্ঘাঙ্গিনী বীর কন্যা। আমাদের সৌভাগ্য যে একটা মাছও ধরা পড়েনি। নইলে সমস্ত বোঝা নিয়ে এখানেই ভরাডুবি হত স্নার্ক।

দিনের পর দিন যায়। কিন্তু স্নার্কের অঢেল প্রাচুর্যে কিছু ঘাটতি পড়ে না। আমাদের যাত্রার দিনে একের পর এক ক্যানোর ভিড় লেগে গিয়েছে। তেহেঈ নিয়ে এসেছে শশা, সঙ্গে চমৎকার ফল বোঝাই একটা আস্ত পেঁপে গাছ। আমার জন্যও এনেছে মাছ ধরবার পুরো সরঞ্জামসহ একটা ছোট জোড়া-ক্যানো। তাছাড়াও তাহা'র মতোই দরাজ হাতে ফল আর শবজি। চার্মিয়ানের জন্য বিহাউরা এনেছিল বিশেষ

উপহার—মোলায়েম বালিশ, হাতপাখা আর সুদৃশ্য মাদুর। তাছাড়া সবাই নিয়ে এসেছে ফুল, ফল আর মুরগি। বিহাউরার বাড়তি উপহার একটি শুকরছানা। যাদের আমি চিনি না বা একবারও দেখেছি বলে মনে পড়ে না, তারাও আমাকে মাছ ধরা ছিপ, ঝিনুকের তৈরি বঁড়শি ইত্যাদি উপহার দিয়েছে।

প্রবাল প্রাচীরের পথটুকু পার করে দেবার জন্য স্নার্কের সঙ্গী হয়েছে একটা কাটার নৌকো। এই নৌকোটাই বিহাউরাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তাহায়। তেহেঙ্গি কিন্তু ফিরে যাবে না। ওর অদম্য ইচ্ছার কাছে আমাকে নতি স্বীকার করতেই হয়েছে। সে এখন স্নার্কের নাবিক।

আমাদের ছেড়ে কাটার পূর্ব দিকে বিদায় নিলে, আর স্নার্ক চলল পশ্চিমদিকে। ককপিটের ধারে হাঁটু গেড়ে বসে নিঃশব্দে প্রার্থনা করছিল তেহেঙ্গি; দু'গাল বেয়ে চোখের জল। এক সপ্তাহ পরে মার্টিন ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলোকে ডেভেলপ আর প্রিন্ট করে তেহেঙ্গিকে কিছু ফটো দেখালো। একটার মধ্যে তার প্রিয় বিহাউরার ছবিও রয়েছে দেখে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কিন্তু জাহাজের এন্তার ভোজ্য বস্তুর কথা কী আর বলব! ফলমূলের ভিড়ে আমাদের হাঁটাচলাই দুষ্কর হয়ে উঠল। ফলের যেন ডাঁই লেগে গেছে। লাইফবোট আর লঞ্চেও ঠাসা ফল। তাদের চাপে তেরপলের দড়িগুলো চড়চড় করে আর্তনাদ করছে যেন। জাহাজ খোলা সমুদ্রের বাণিজ্যবায়ুতে পড়তেই কিন্তু 'প্রাচুর্যে'র বোঝা হালকা হতে শুরু করল। প্রত্যেক বার দোলানি খেতেই, হয় কলার ছড়া নয় নারকেল কিম্বা লেবুর ঝুড়ি ঝুপঝাপ জলে পড়তে থাকে। মিষ্টি আলুর বড় ঝুড়িগুলো ফেটে যায় আর ডেকে গড়াগড়ি খায় আনারস, ডালিম। মুরগিগুলো কোনোক্রমে ছাড়া পেয়ে জাহাজময় ছড়িয়ে পড়েছে। মাস্তুল পালের দড়ি আর পালদণ্ডে চড়ে তারা ভারসাম্যের বিপজ্জনক পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে ডানা ঝাপটিয়ে কক্কঁক্ করে। ওগুলো বুনো মুরগি তো, তাই উড়তেই অভ্যস্ত। ওদের ধরবার চেষ্টা করতেই আকাশে উড়ে যায় আর চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে জাহাজে। কোনো-কোনোটা আবার ফিরেও এল না। আর এ সব কাণ্ড-কারখানার মাঝখানে অলক্ষিতেই ছোট শুকর ছানাটি ছাড়া পেয়ে পা হড়কে পড়ে গেল একেবারে সমুদ্রে।

বোরা-বোরায় মাছ ধরা

এর আগে লিখেছিলাম—বোরা-বোরা দ্বীপে মাছ ধরতে যাবার কথা। একটি মাছও ধরা পড়েনি বলে সেবার আমরা বেশ স্বস্তি পেয়েছিলাম, নইলে 'স্নার্ক' তার অতিরিক্ত ওজন নিয়ে ওখানেই ডুবে যেত। এবার সেই মাছ ধরার ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে বলি।

সেদিন ভোর পাঁচটার সময় প্রবল শঙ্খনাদের চোটে জাহাজে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। সারা সমুদ্রসৈকত জুড়ে শাঁখের অদ্ভুত শব্দটা যেন প্রাচীনকালের যুদ্ধের আহ্বান। শঙ্খধ্বনি করে সমস্ত মানুষকে জাগিয়ে তারা অভিযানে বেরুতে বলছে। এই আওয়াজে আমাদেরও বিছানা ছেড়ে উঠতেই হল। তা ছাড়া আমাদের এখন মাছ ধরার উৎসবে যাবার জন্য প্রস্তুত হবার কথা।

এই বিশেষ উৎসবের একটা নাম আছে 'তাউ-তাই-তাওরা', মানে 'পাথর দিয়ে মাছ ধরা'। এতে পাথরটাই আসল অস্ত্র যা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে হয়। আসলে ঠিক খরগোশ বা জানোয়ার তাড়া করে এনে ফাঁদে ফেলার মতোই পাথর ছুঁড়ে তাড়া করে মাছগুলোকে ফাঁদে ফেলা—এই হল মূল নিয়মটা। সমস্ত ক্যানোগুলো একশো দু'শো ফুট দূরে দূরে সার বেঁধে দাঁড়ায়। প্রত্যেক ক্যানোর গলুইয়ের মাথায় একজন করে লোক হাতে ছোট-ছোট দড়িতে বাঁধা ভারি পাথর নিয়ে বসে। তার একমাত্র কাজ হল সেই পাথরগুলো জলের ওপর আছাড় মারা। আবার তুলে নিয়ে ফের জলে ছোঁড়া। এভাবে সে সমানে জলে আঘাত করতে থাকবে। ক্যানোর পেছন দিকে বৈঠা চালাবে আরেকজন—সামনের দিকে চালাবার সঙ্গে অন্য ক্যানোগুলোর পাশাপাশি সার বজায় রেখে চলবে। একই ভাবে দ্বিতীয় আরেক সারি ক্যানো এগিয়ে আসতে থাকবে দু'মাইল পেছনে থেকে। দু'সারির ক্যানো তাড়াতাড়ি তাদের প্রান্ত দুটো জুড়ে তীরের দিকে এমনভাবে ছুটে আসবে যেন তার ফলে একটা বৃত্ত রচনা হয়। এই বৃত্ত ক্রমশই ছোট হতে হতে পাড়ের দিকে এগিয়ে আসবে—কিনারাটা ঠেকবে পাড়ে।

পাড় থেকে লম্বা সার বেঁধে জলের মধ্যে নেমে পায়ে-পায়ে লাগিয়ে স্থানীয় রমণীরা একটা বেড়া রচনা করে দাঁড়িয়ে থাকবে। এ রকম পায়ের বেড়া করবার উদ্দেশ্য পলায়ন-মুখী মাছগুলোকে ফাঁদে আটকে রাখা। সঠিক মুহূর্তে, ক্যানোর বৃত্ত যখন যথেষ্ট

সংকুচিত, সেই সময় তীর থেকে দ্রুত ছুটে আসবে আরেকটা ক্যানো। সেটি নারকেল পাতার লম্বা লম্বা জালি ছুঁড়ে ছুঁড়ে জলে বিছিয়ে দেবে বৃত্তটাকে ঘিরে।

মেয়েদের পায়ের বেড়ার ওপরেও সেটা হবে বাড়তি ফাঁদ। বলা বাহুল্য মাছ ধরার ব্যাপারটা সব সময়েই চলে লেগুন-প্রাচীরের ভেতরের দিকে।

দ্বীপের ফরাসী সেনাবাহিনীর কর্তা আকারে ইঙ্গিতে ব্যাখ্যা করে আমাকে বোঝালেন —এই মাছ ধরা অভিযানে যে হাজারো মাছ ধরা পড়বে, কুচে মাছটি থেকে বৃহদাকারের হাঙ্গর পর্যন্ত, সবই শেষ অবধি সেদ্ধ হয়ে যাবে এই সমুদ্র-পাড়ের বালির ওপরেই।

বোরা-বোরার মাছ ধরার ব্যাপারটা শুধু শাদামাটা খাদ্যের সন্ধান নয়, বরং বলা যায় এটি মুক্ত পরিবেশে আমোদের উৎসব। প্রতি মাসে একবার এই উৎসব পালিত হয়। প্রাচীন কাল থেকেই এই ধারা চলে আসছে। মাছ ধরবার এই কায়দার যিনি উদ্ভাবক তিনি আজ বিস্মৃতির কবলে। তবে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি একজন প্রগতিবাদীই ছিলেন। যে কোনো উদ্ভাবকের মতো তাকেও প্রথমে হয়তো কঠিন সমালোচনা ও বিদ্রূপতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

আমাদের প্রিয় বন্ধু তেহেঙ্গ ও বিহাউরা এসেছিল আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। এই উৎসবের আয়োজন ওরাই করেছে আমাদের সম্মানার্থে। ডেকে এসে আমরা তাজ্জব বনে গেলাম। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সুদৃশ্য পলিনেশীয় বজরা। দীর্ঘাকার একটা যমজ-ক্যানো, মোটা বাহাদুরি কাঠ দিয়ে জুড়ে দেওয়া। মাঝখানে অবশ্য দাঁড় বাইবার মতো ফাঁক আছে। গোটা বজরাটাই ফুল আর সোনালি ঘাসে সাজানো। ফুলের মুকুটপরা এক ডজন বীরাঙ্গনা দাঁড় বাইবার জন্য বসেছে। দুটি ক্যানোতেই হাল ধরবার জন্য একেকজন দীর্ঘাকৃতি যুবক। সকলেরই গলায় সোনালী, লাল, নারঙী ফুল। সকলেরই পরনে রক্তাভ কটিবস্ত্র। চতুর্দিকে শুধু ফুল আর ফুল। যেন রঙের আগুন লেগেছে। ক্যানোর গলুইয়ের ওপর একটা মঞ্চে তেহেঙ্গ আর বিহাউরা নাচছিল। আমাদের দেখে সমস্ত কণ্ঠ উল্লসিতভাবে অভ্যর্থনা জানালো।

চার্মিয়ান ও আমাকে ক্যানোতে তুলবার আগে তিনবার ওরা স্নার্ককে চক্কর দিল। তারপর শুরু হল আমাদের যাত্রা—মাছ ধরবার জায়গাটির উদ্দেশ্যে। হাওয়ার অনুকূলে দাঁড় বাইলে এখান থেকে তা পাঁচ মাইলের মতো।

সবাই আনন্দে বিভোল। সমস্ত ক্যানোগুলো থেকে খালি গান আর গান ভেসে আসছে—ক্যানো সঙ্গীত, হাঙ্গর সঙ্গীত, মাছ ধরার সঙ্গীত। দাঁড়ের ওঠা-নামার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সম্মিলিত সঙ্গীত। মাঝে মাঝে 'মাও!' বলে একটা চিৎকার ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। আর, সঙ্গে সঙ্গে আরো জোরে পাগলের মতো দাঁড় বাইছে সবাই।

ওদের ভাষায় 'মাও' মানে হাঙ্গর। দ্বীপবাসীরা গভীর সমুদ্রের এই 'বাঘ'টিকে মাথা জাগাতে দেখলে পাগলের মতো নৌকো ছোটায় প্রাণের দায়ে, কারণ ওদের ভালো করেই জানা আছে হালকা ক্যানো একবার উলটে গেলে ওরা নির্ঘাত হাঙ্গরের পেটে যাবে। অবশ্য আমাদের এখানে সত্যিকারের হাঙ্গরের ব্যাপার নেই। শুধু মাল্লাদের উত্তেজিত করবার জন্যই এই 'মাও' ডাকের ব্যবস্থা!

বজরার মঞ্চের ওপর তেহেঙ্গ ও বিহাউরা নাচছিল গান আর সমবেত সঙ্গীতের তালে তালে—মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ হাততালির সঙ্গত। একেকবার আবার নৌকোর কিনারায় দাঁড় মেরে চড়া-তালও ঠোকা হচ্ছে বাজনার মতো। একটি তরুণী দাঁড় ছেড়ে মঞ্চে লাফিয়ে উঠে 'হুলা' নৃত্য জুড়ে দিল। নাচতে নাচতেই কোমর বেঁকিয়ে ঝুঁকে চুমু খেল আমাদের গালে স্বাগতম জানিয়ে। ওদের কিছু গান ধর্মগীতের। বিশেষ করে সুন্দর লাগছিল গম্ভীর পুরুষকণ্ঠের গলা মিলিয়ে মেয়েদের সরু কণ্ঠের উচ্চতান—যা শুনলেই মনে পড়ে যায় অর্গানের সুরের কথা। আবার অন্যদিকে কয়েকটা স্তবগাথা বা চারণগান তো রীতিমত আদিম যুগের—যা প্রাকখৃষ্টীয় আমল থেকে এসেছে।

এইভাবে নৃত্য গীত আর দাঁড়ের তালের ভেতর দিয়ে ফুর্তিবাজ পলিনেশীয়রা আমাদের নিয়ে যাচ্ছে মাছ ধরবার এলাকায়। স্থানীয় ফরাসী শাসনকর্তা সপরিবারে নিজস্ব জোড়া-ক্যানোতে চেপে বসেছেন আমাদের সঙ্গী হয়ে। তাঁর জেলখানার কয়েদীরাই হলো দাঁড়ি। তাছাড়া এই ফুর্তিভরা দ্বীপে যখনই কেউ মাছ ধরতে যায়, তার সঙ্গে সবাই সামিল হয় মাছ ধরতে। আমাদের দু'পাশেই এক-কুড়ি ছুটকো ক্যানো দাঁড় বেয়ে চলেছে। একটা মোড় ঘুরতেই বড়সড় একটা পাল-তোলা ক্যানো সবেগে এসে হাজির। নৌকোর কিনারায় অতি সাবধানে ভারসাম্য বাঁচিয়ে তিনটি তরুণ বিপুলভাবে ঢাক বাজিয়ে আমাদের অভিবাদন জানাল।

আর আধমাইল ক্যানো-যাত্রার পরই সমবেত হবার জায়গাটায় পৌঁছে গেলাম। ওয়ারেন আর মার্টিন আমাদের লঞ্চটিকে নিয়ে আগেই এসে গেছে। লঞ্চটি দেখে সবাই মুগ্ধ এবং অবাক। দাঁড় ছাড়া জলযানটা যে কীভাবে চলে—এটাই বোরা-বোরাবাসীদের চরম বিস্ময়। একটা বেলাভূমিতে সব ক্যানোগুলো জড়ো হল। সেখানে ডাবের জল পানের সঙ্গে চলল আরেক দফা নৃত্য গীত। কাছাকাছি গ্রাম থেকে আরও লোক এসে জুটল আমাদের সঙ্গে। জোড়ায় জোড়ায় মেয়েরা হাতধরাধরি করে সৈকতভূমিতে নেমে আসছে, মাথায় ফুলের মালা—সে এক অপরূপ দৃশ্য।

দোআঁশলা ব্যবসায়ী আলিকট আমাকে বলেছিল, 'মাছ ধরা শেষ হলে মাছগুলো সবই উপহার পাবেন আপনি।'

'সবটা ?' আঁতকে উঠে বলেছিলাম আমি। কী উপায় হবে ? স্নার্কে তো তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সবটাই।' আলিকটের জবাব—'মাছ ঘেরাও যখন পুরো হয়ে যাবে, সম্মানিত অতিথি হিসেবে আপনারও প্রথম মাছখানা হারপুনে গেঁথে মারতে হবে। এই হলো স্থানীয় প্রথা। তারপর সবাই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছগুলোকে তুলে ডাঙায় ফেলবে। একেবারে মাছের পাহাড জমে যাবে। তারপর ওদের একজন মোড়ল বক্তৃতা দিয়ে সমস্ত মাছগুলোই উপহার দেবে আপনাকে। কিন্তু আপনাকে যে সবটাই নিতে হবে এমন কোন কথা নেই। আপনিও একটা বক্তৃতা দেবেন। জানাবেন কোন্ মাছটি আপনার নিজের জন্য পছন্দ, আর বাকি সব ওদেরই উপহার দেবেন। আপনার সদাশয়তার জয়জয়কার করবে ওরা।'

এবারে স্থানীয় পুরোহিত মৎস্যশিকারে সাফল্যের জন্য প্রার্থনা জানাবার পর এদের প্রধান মেছো সকলকে জানিয়ে দিল কোন্ ক্যানো কোথায় থাকবে। যাত্রা শুরু হলো আবার। বিহাউরা আর চার্মিয়ান ছাড়া ক্যানোতে আর কোনো মহিলার স্থান হয়নি। সাবেক দিন হলে তাদের ওপরেও সামাজিক নিষেধ থাকতো। অন্য মেয়েরা এখানে রয়ে গেল জলে নেমে পায়ে পা লাগিয়ে বেড়া রচনা করবার জন্য।

আমরা এবার বজরা ছেড়ে লঞ্চে উঠি। বাকি ক্যানোগুলোর অর্ধেক পেছনের দিকে চলে যায়, আর বাকি অর্ধেককে সঙ্গে নিয়ে আমরা এগোই সামনে—মাইল দেড়েক গিয়ে প্রবাল প্রাচীরের গায়ে চলে আসি। আর আমাদের সারির মাঝখানের ক্যানোটিতে আছে অভিযানের নেতা। নেতাটি বৃদ্ধ হলেও ঋজু, চমৎকার দেহ কাঠামো। হাতে একটি পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্খধ্বনি করে সে সংকেত জানাচ্ছিল কোন্ ক্যানো কী ভাবে দুটি সারিতে চলবে। সবাই প্রস্তুত হলে সে পতাকা হেলালো ডান দিকে। একসঙ্গে ঝপাং করে আওয়াজ তুলে ডান দিককার প্রত্যেকটা ক্যানো থেকে পাথর পড়ল জলে। পাথরগুলো সামান্য ডোবার সঙ্গেসঙ্গেই মুহূর্তের মধ্যে আবার তুলে ফেলা হল—আর সেই অবসরে পতাকা সংকেত করল বাঁ দিকে। অদ্ভুত তালে সময় রেখে সে দিকের পাথরগুলোও জলে পড়ে। এইভাবে ক্রমাগত চলে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে—ফেলে দেওয়া আর তৎক্ষণাৎ টেনে তোলা। দাঁড়গুলোও সেই সঙ্গে ঝপ ঝপ করে আগে বাড়িয়ে নিয়ে যায় ক্যানোর সারি। এক-দেড় মাইল দূরে আমাদের উলটো তরফ থেকেও আরেক সারি ক্যানো ঠিক একই রকমভাবে এগিয়ে আসছে।

তেহেইও লঞ্চের গলুইতে দাঁড়িয়ে সর্দারের দিকে স্থির নজর রেখে সমান তালে পাথর ফেলছিল জলে। একবার দড়ি ছিঁড়ে পাথরটা জলে পড়ে গেল। মুহূর্তে জলে লাফিয়ে

ডুব দিল সে। পাথরটা জলের নিচে তলিয়ে গিয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু পলকের মধ্যেই দেখলাম তেহেঙ্গ পাথরটা হাতে নিয়ে লঞ্চে উঠে এল। কাছাকাছি ক্যানোগুলোতেও একই ব্যাপার ঘটছিল।

এবার প্রবাল প্রাচীরের কাছে আমাদের সারির প্রান্ত দ্রুত এগিয়ে গেল, আর সৈকতের দিকের প্রান্ত একটু ঢিলে দিল--সর্দারেরই তদারকিতে তারপর দুটো প্রান্ত জুড়ে গিয়ে একটা বৃত্ত রচনা করল। ক্রমে ছোট হতে লাগল বৃত্তটি। ভয়ার্ত মাছগুলো ডাঙার দিকে ছুটেছে পাথর আছড়ানোর ধাক্কায়। পাড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েরা তত-ক্ষণে পায়ের বেড়া রচনা করে ফেলেছে। মেয়েদের মাথাগুলো এক দীর্ঘ সারিতে দেখা যাচ্ছে, শান্ত লেগুনের জলের ওপর কালো একেকটা ফুটকির মতো। মোটামুটি সব মেয়েই গলাজলে ডুবে রয়েছে। এদিকে বৃত্ত ছোট হতে হতে ক্যানোগুলো একেবারে ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়ায়। একটা লম্বা ক্যানো হঠাৎ তীর বেগে ডাঙার দিক থেকে ছুটে আসে বৃত্তের দিকে। গলুইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে একটি লোক নারকেল পাতার লম্বা একটানা জাল বিছিয়ে দিতে থাকে সমুদ্রে। ক্যানোর কাজ ফুরিয়েছে। ক্যানো থেকে লোকেরা এবার জলে নেমে মেয়েদের মতোই পায়ে পা লাগিয়ে আরেকখানা বেড়া রচনা করে দাঁড়ায়। হাত দিয়ে জলের ঝাপটা দিতে থাকে সবাই, আর সেই সঙ্গে চিৎকার। ফাঁদ যতোই ছোট হয়ে আসে ততোই বাড়ে হৈ-হল্লা।

কিন্তু মাছেদের কোনো সাড়া নেই। অবশেষে সর্দার মেছো জলে নেমে খুব সাবধানে নারকেল পাতার জালের মধ্যে ঢোকে, সব দিকটা ঘুরে দেখে। কিন্তু তবু কোনো মাছ লাফিয়ে উঠল না, বালিতে আছড়েও পড়ল না। নাঃ, একটা সামান্য কুচে মাছও নেই। পুরুতের প্রার্থনাতেই নিশ্চয় কোনো গোলমাল ছিল। কিংবা উলটো হাওয়ার ফলে লেগুনেরই অন্য কোথাও চলে গেছে সব মাছ। তাই খেদাবার মতো মাছ আর নেই।

'বুঝলেন, প্রতি পাঁচবার মাছ শিকার করতে গিয়ে একবার ব্যর্থতা আসেই।' আলিকট আমাকে সান্ত্বনা জানায়।

এ আমাদের ভাগ্য যে এবারের ব্যর্থতার সময়টাই আমরা উপস্থিত ছিলাম বোরা-বোরায়। পাঁচবারের একবার। আমাদের তাতে আপসোস নেই, বিধাতাকেও দোষ দিই না। শুধু প্রচুর পরিশ্রমের পর খালি হাতে ফেরা—মেছোদের এই পরিচিত অনুভূতিটাই আমরা বুঝতে পারি।

চোদ্দ

আনাড়ি জাহাজ-চালক

পৃথিবীতে জলযান পরিচালনার জন্য ভালো মন্দ অনেক ক্যাপ্টেন আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই ওস্তাদ মানুষ। কিন্তু স্নার্কের বেলায় যে সব ক্যাপ্টেনদের একে একে দেখলাম তারা চমকপ্রদভাবে আলাদা জাতের। আমার স্নার্কের অভিজ্ঞতায় বলে,—একটা ছোটমোটো জাহাজে একজন ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব নেওয়ার চেয়ে দুটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর দায়িত্ব নেওয়া ঢের বেশি সহজ। অবশ্য এর চেয়ে অন্য কিছু আশাও করা যায়নি। ভালো ক্যাপ্টেনরা বড়ো বড়ো পদে আছেন, হাজার পনের হাজার-টনী জাহাজ ছেড়ে তারা কোন্ দুঃখে স্নার্কের মতো একটা দশ-টনী পাল জাহাজে যোগ দেবেন ?

আমাদের জাহাজে তিন তিনজন ক্যাপ্টেন কাজ করে গেল। ঈশ্বরের দয়ায় এই বোধ হয় শেষ-এর পর আর কাউকে নেওয়া হচ্ছে না।

প্রথমজন এমন বুড়োহাবড়া ছিলেন যে একজন কাঠমিস্ত্রীকে সামান্য কাজও বুঝিয়ে দিতে পারেননি। এমনই অসহায় জবুথবু বুড়ো যে জাহাজের ডেক ধুয়ে দেবার জন্য কোন নাবিককে পর্যন্ত হুকুম দিতে পারেননি। প্রখর ক্রান্তীয় সূর্যের তাপে বারোদিন ধরে স্নার্কের ডেক দগ্ধ হয়েছে, অথচ এই নতুন ডেকের জন্য কত ডলারই না খরচ করতে হয়েছে আমাকে।

দ্বিতীয় ক্যাপ্টেনটি ছিলেন বদমেজাজী। যেন ক্রোধ নিয়েই জন্মেছিলেন। তাঁর দো-আঁশলা ছেলের জবানিতে—'পাপা হরদম রেগেই থাকে।' তৃতীয়জন ছিল অসৎ। সাধারণ সততা, সত্য কথার ধারেকাছেও তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না। ন্যায়বিচার সদ্বিচারের রাস্তাই তার ছিল না। তেমনি আবার রাস্তা ভুল করে স্নার্ককেও প্রায় ধ্বংসের মুখে ফেলেছিল রিংগোল্ড দ্বীপের ওপর।

ফিজি দ্বীপের সুভায় এসে এই তৃতীয় এবং শেষ ক্যাপ্টেনটিকে বরখাস্ত করে আমি নিজের হাতেই জাহাজ পরিচালনার ভার নিলাম। আবার সেই আনাড়ি জাহাজ-চালকের ভূমিকা। একবার আগেও সেটা পরখ করা হয়েছে আমার পয়লা নম্বর ক্যাপ্টেনের তদারকীতে।

আপনারা দেখেছেন—সাহস করে এ কাজের ভার নিয়ে খুব একটা ব্যর্থতার পরিচয় দিইনি। সানফ্রান্সিসকো থেকে হাওয়াই অবধি স্নার্ককে এনে ফেলেছিলাম তো বটে।

তা ভুলভ্রান্তি অনেক হয়েছিল নিশ্চয়ই, তবে পরিস্থিতি আমাদের সহায়ক হয়েছিল বলেও ব্যাপারটা সম্ভব হয়।

৬ জুন, ১৯০৮ সালের এক শনিবারে সুভা থেকে আমরা যাত্রা করেছিলাম। আমাদের নৌ-যন্ত্রপাতি সঠিক ছিল না। ক্রোনোমিটার বারেবারেই ঠকিয়েছে আমাদের। আগেই বলেছি, হিসেবের সামান্য হেরফের হলে সমুদ্রেই ভেসে থাকতে হয়। কপালে আর ডাঙা জোটে না। কয়েকটি মজার অভিজ্ঞতা হলো জাহাজ পরিচালনার সময়। সূর্য বুঝি সব সময় তার নির্দিষ্ট নিয়মে চলে না। আর পৃথিবীতে নিশ্চয় ৩৬৬ দিনে এক বছর হয়। এমনি সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা, যা হেঁয়ালির মতো। কেমন করে এ হেঁয়ালিগুলোর সৃষ্টি হল তা বোধহয় একটু বর্ণনা না করলেই নয়। প্রথম ব্যাপারটা, আগেই বলেছি—ক্রোনোমিটার নিয়ে। মানে আমার জাহাজের ঘড়ি। ফিজিতে (সুভা) এসে অবসর পেলাম অন্য ক্রোনো-মিটারের সঙ্গে আমাদের ঘড়িটা মিলিয়ে নেবার। দু'হপ্তা আগে, সামোয়াতে থাকতে আমার জাহাজের ক্যাপ্টেনটিকে বলেছিলাম একটা মার্কিন ক্রুজারের ক্রোনোমিটারের সঙ্গে আমাদের ক্রোনোমিটারের সময়টা মিলিয়ে নিতে। তা, ক্যাপ্টেন তো বললে কাজটা সে করেছে, পরে বুঝলাম ডাহা মিথ্যে কথা—কিছুই সে করেনি। সময়ের তফাতটা নাকি এক সেকেণ্ডের একটি ভগ্নাংশের সমান। যা ধর্তব্যই নয়। তারপর দেখুন, ১৪ দিন পর এই সুভাতে অন্য এক অস্ট্রেলীয় স্টীমারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি, আমাদের ঘড়ি ৩১ সেকেণ্ড ফাস্ট (আগে) চলছে। এখন ৩১ সেকেণ্ডকে জ্যামিতিক আকারে দেখলে ভূপৃষ্ঠে তা সওয়া সাত কিলোমিটারের সমান। মানে রাতের অন্ধকারে আমাদের ঘড়ি অনুসারে স্নার্ক চললে সে হয়তো ° মাইল দূরের পাহাড়কে ঠাহরই করতে পারবে না, ধাক্কা মেরে বসবে তারই গায়ে। তাই সুভার বন্দর-কর্তাদের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে সময় স্থির করতে গিয়ে দেখি আসলে আমাদের ঘড়ি ৫৯ সেকেণ্ড আগে চলছে! তার মানে, পশ্চিম দিকে চলার সময় যখন ভাবছি ডুবো-পাহাড় থেকে ১৫ মাইল দূরে রয়েছি, তখন একেবারে পাহাড়ের ঘাড়েই চেপে বসেছে স্নার্ক।

যা হোক, ঘড়ি তো কোনোরকমে মিলিয়ে নেয়া হল, এবার দ্বিতীয় হেঁয়ালি জাহাজের কম্পাসটা নিয়ে। ও না হলে তো দিকই ঠিক করা যাবে না। ৬ই জুনের সেই যাত্রার পর আবিষ্কার হল ব্যাপারটা—আমাদের চিরবিশ্বস্ত, বিপদের পরমবন্ধু কম্পাস 'উত্তরদিক'টা একেবারে গুলিয়ে ফেলেছে। কখনো তার কাঁটা 'উত্তর' দেখাচ্ছে, কখনো 'উত্তরপশ্চিম', আবার কখনো উত্তরদিকে লেজ ঘুরিয়ে বেমালুম দক্ষিণ-মুখো! এখন ব্যাপার হল, 'কম্পাসের দিক্‌পথ' তো পৃথিবীর 'সঠিক চৌম্বক দিক্‌পথে'র

বরাবর নয়—তার বিচলনের দিকেও নজর রাখতে হবে। জাহাজে রাখা লোহা-লক্কড়ের টানে পেছনের ককপিটে বসানো কম্পাসের কাঁটা এই বিচলনেরও আওতায় পড়েছে। সঠিক দিকে কাঁটা আগে সেট্ করে নিতে হবে। না হলে পথে হয়তো এমন ধাক্কা খাবো যে চমৎকার সমুদ্রস্নান হয়ে যাবে, কিংবা হাঙ্গরের মুখেই পড়ব।

যেমন কম্পাসের ব্যাপারে হেঁয়ালি, তেমনি আবার আকাশের বেলায়—আমাদের সূর্যদেব। তিনি কখন যে কোন্ দিকে থাকছেন, কোন্ দিকে উঠছেন, এ বোঝাই ঝকমারি। এর পর যখন আবিষ্কার করি, পৃথিবী আসলে বছরে ৩৬৬ বার নিজের অক্ষের ওপর ঘুরছে, অথচ সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত ঘটছে ৩৬৫ বার, তখন আর আমার মাথার ঠিক থাকে না।

সূর্য দেখে হিসেব করার ঝকমারি থেকে বাঁচবার জন্যই মানুষ সঠিক নিয়মিত সময় রাখবার জন্য আবিষ্কার করেছে যান্ত্রিক ঘড়ি। সূর্য নির্দিষ্ট সময়ে কোথায় আছে আর কোথায় তার থাকা উচিত, অবস্থিতির এই ব্যবধানটিকেই মানুষ বলে 'সময়ের সমীকরণ'। সেটা নির্ণয়ের মাপকাঠি হল গ্রীনিচের মধ্যরেখা। জাহাজের ক্রোনোমিটার গ্রীনিচের মাপকাঠি ধরেই স্থির করে ফেলে সূর্যের বর্তমান অবস্থিতি—অর্থাৎ স্থানীয় সময়।

এ সবই না হয় বুঝলাম কিন্তু তত্ত্বটা কাজে প্রয়োগ করতে গিয়ে হিমসিম খাই। সাতুই জুন আমরা একেবারে খোলা সমুদ্রে। কোন্ দ্রাঘিমারেখায় রয়েছি তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি। সকালে সূর্য দেখেছি দিগন্তের ২১ ডিগ্রি ওপরে। নৌ-পঞ্জিকা দেখে ৭ই জুনের সূর্যের অবস্থিতি বুঝি, গ্রীনিচ মধ্যরেখা অনুযায়ী পেছনে চলছে। অনেক অঙ্ক-টঙ্ক কষে বের করি এখন ক্রোনোমিটারে ৮:১৫ মিনিট। কিন্তু সকাল না বিকেল, AM না PM ? সে না-হয় বোঝা গেল সকালই, কারণ একটু আগে প্রাতরাশ খেয়েছি। তাহলে স্নার্কের ঘড়িতে যে আটটা দেখাচ্ছে এটা কি সেই আট ঘটিকা, না গ্রীনিচের হিসেবে আটটা ? নাকি আজ সন্ধ্যার আটটা, অথবা গতরাতের আটটা ? মহা ফাঁপরে পড়া গেল দেখি। যদি পুব দ্রাঘিমাংশে থাকি, তাহলে গ্রীনিচের আগে আছি। যদি গ্রীনিচের পেছনে থাকি, তাহলে যে আজটা 'গতকাল' হয়ে যাচ্ছে! তাহলে আজকের দিনটা কী ? আমার মধ্যে দুটি মনের ঝগড়া শুরু হয়। যুক্তিবাদী মন বলে, কালকের সময়ের সঙ্গে আজকের "সময়ের সমীকরণ"টা শুদ্ধ করে নাও। সহজ বুদ্ধি বলে, আজ তো আজই। আজকের সূর্য যা বলবে তাই মেনে নাও। পরে অনেক কসরত করে পাশাপাশি হিসেব করে দেখি জাহাজের স্থানীয় সময় আর ক্রোনোমিটারে গ্রীনিচ সময়ের পার্থক্য অতি নগণ্য। শুধু সমস্যা দাঁড়াল আরেকটা। আমাদের দ্রাঘিমা রেখা হয়ে যাচ্ছে "১৮৪" পশ্চিম !—যার কোনো মানেই হয় না। আমি হতভম্ব।

১৮৪° ডিগ্রি আবার হয় নাকি ? ১৮০° ডিগ্রির ওপর পূব বা পশ্চিম কোনো দ্রাঘিমা-রেখাই তো যেতে পারে না। যদি কেউ বলে, আরে পৃথিবীটাই তো ৩৬০° ডিগ্রিতে ভাগ, অতএব গোলার্ধ ১৮০° ডিগ্রির ওপর হয় না। তাহলে ১৮০ থেকে বাড়তি ৪ ডিগ্রি বিয়োগ কর, পাবে ১৭৬° ডিগ্রি পূর্ব। হ্যাঁ, একটা কথা তো ঠিকই। এই যে ফিজি থেকে জাহাজ ছাড়লাম, এও তো সেই পূর্ব দ্রাঘিমাংশেই ? বরাবরই জানি আমরা আছি পূব দ্রাঘিমায়।

কিন্তু এ তো শুধু একটা হেঁয়ালি শেষ হল। এবার যে অক্ষাংশের হেঁয়ালি। আমরা এখন রয়েছি দক্ষিণ গোলার্ধে—সূর্য আছে উত্তরদিকে, বিষুবরেখার ওপারে। যে অক্ষাংশে আছি সেটাই ধরে নাক-বরাবর ঘণ্টায় ছয় নট্ বেগে স্নার্ক পশ্চিমমুখো চললে কোনো পরিবর্তন নেই সে জানি। কিন্তু যদি দক্ষিণমুখো চলি, তাহলে কি প্রতি চব্বিশ মাইলে এক ডিগ্রি করে অক্ষাংশরেখা বদল হবে ? আর দক্ষিণ-পশ্চিমমুখো চললেই বা কী হবে ? ঘণ্টায় ২৪ মাইল চলেই বা এতগুলো দ্রাঘিমারেখা পার হয়ে যাচ্ছি কেন ? অক্ষাংশ বদল না করে সোজা পশ্চিমদিকে চললে ২৪ মাইল, অথচ দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে ঝটপট্ দ্রাঘিমারেখা বদলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা সমাধান যে চাই, কারণ স্নার্ক এদিকে তীরবেগে নিউ হেব্রাইডিসের টান্নার দিকে ছুটছে।

হঠাৎ মগজটা যেন খুলে গেল। দক্ষিণে যাওয়া মানেই তো অক্ষাংশ পার হবার ব্যাপার। দ্রাঘিমা অনুযায়ী মাইলের হিসেব না কষে অক্ষাংশের হিসেব কষি। কে না জানে, একমাত্র বিষুব রেখাতেই দ্রাঘিমারেখাগুলো ৬০ মাইল দূরে দূরে—আর সেগুলো গিয়ে 0° ডিগ্রিতে জুড়ে গিয়েছে ? বিষুবরেখাতে একেক ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা ৬০ মাইল ব্যবধানে, অথচ যতোই দক্ষিণে যাবে দ্রাঘিমা রেখাগুলো ততোই কাছাকাছি আসবে—দক্ষিণ মেরুতে শূন্যে (0°) পৌঁছোবার আগে একেকটা অক্ষাংশে তাদের পরস্পরের দূরত্বটা আধ মাইল হতে পারে, তিন, পাঁচ, দশ, ত্রিশ মাইলও হতে পারে।

এখন তো সব পরিষ্কার। স্নার্ক রয়েছে ১৯ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে। পৃথিবীটা এখানে বিষুব রেখার মতো পেটমোটা নয়। তাই এখানে একেক মাইল চললেই দ্রাঘিমার কয়েক 'মিনিট' অংশ পার হওয়া যায়, বিষুবরেখার মতো ষাট মিনিটে ষাট মাইল নয়। জুল ভার্নের 'চল্লিশ দিনে পৃথিবী ভ্রমণ' এখান থেকে কতো সহজ বলুন তো ?

এর পর অবশ্য অবস্থাটা পুষিয়ে নিয়েছি।

১০ই জুন সন্ধ্যেবেলায় আমি স্নার্কের যাত্রাপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। হ্যাঁ, ডাঙাকে স্পর্শ না করেই। নিউ হেব্রাইডিসের একেবারে পূব দিকে ফিউটুনা আগ্নেয়গিরি আমাদের কাছ ঘেঁষে। দু হাজার ফুট উঁচু তার খাড়া চূড়া। স্নার্ক যেন আছড়ে না পড়ে,

একথা ভেবেই এটিকে দশ মাইল দূরে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম। আমাদের জাপানী রাধুনি ওয়াডাকে বললাম—'কাল সকালেই ডাঙা পাব আমরা।' ওয়াডা রোজ সকালে হাল ধরে বসে। বললাম, 'একটু নজর রাখলেই দেখতে পাবে।' আমি ঘুমোতে গেলাম। শুয়ে শুয়ে মাথায় চিন্তাগুলো কিলবিল করতে লাগল। জাহাজ পরিচালনার ভার নিয়েছি আমি, মান তো রাখতেই হবে। অথচ ধরুন, কথার কথা বলছি, কাল সকালে যদি ডাঙার মুখ সত্যিই দেখা না যায়? মুখ রাখব কোথায়? জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলাম—দিনের পর দিন স্নার্ক ভেসে চলেছে। অসীম নিঃসঙ্গ সমুদ্র। সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষিত। বিষণ্নমুখে সবাই বসে আছি। ভাবছি কে কার মাংস খাবে—এই সম্ভাবনাই যে আসন্ন হয়ে উঠল!

রাত তিনটেয় আমি ডেকে উঠে গেলাম। রাপা দ্বীপের অধিবাসী হেনরী এখন স্টীয়ারিং ধরে বসেছে। স্নার্ক তার নির্দিষ্ট গতিতেই চলেছে, ঘণ্টায় ছয় নটের একটুও কম নয়। ৪২ মাইল এসেছে অথচ ফিউটুনাতে আছড়ে পড়েনি জাহাজটা। ভোর সাড়ে পাঁচটায় আবার ডেকে এলাম। ওয়াডা এবার হালের চাকা ধরেছে। ডাঙার কোন ইঙ্গিতই পায়নি সে। আমি কক্‌পিটের রেলিঙে বসলাম। মিনিট পনের পরে আমিই দেখলাম ডাঙা। জল থেকে মাথা জাগিয়ে আছে ছোট অথচ উঁচু একটুকরো ডাঙা। ঠিক যেখানে তার থাকার কথা। ছ'টা নাগাদ আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম—এই সেই চমৎকার আগ্নেয়গিরি শৃঙ্গ ফিউটুনা। বেলা আটটার সময় যখন সেটা পাশের দিকে চলে এল, আমি সেক্সট্যান্ট দিয়ে তার দূরত্ব মাপলাম। ৯·৩ মাইল। তবে আমি তো গতরাতে এটাকে এড়াবার জন্য সত্যিই ১০ মাইল দূরত্বে জাহাজ চালাতে বলেছিলাম। আমার হিসেবে কিছু গলদ হয়নি তাহলে। ধীরে ধীরে উত্তরে আর দক্ষিণে আরও কয়েকটি নামজানা স্থলভাগ দৃশ্যমান হলো। এনেটিয়াম, আনিওয়া; এবং সিধে সামনের দিকে তান্না। তান্নাকে ভুল করবার কোন কারণ নেই, আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া সোজা হয়ে উঠেছে আকাশমার্গে। চল্লিশ মাইল দূরে রয়েছে। বিকেলের দিকে আমরা ওটার কাছাকাছি এসে দেখি। উঁচুনিচু পাহাড়ময় অস্পষ্ট স্থলরেখা—আপাতদৃষ্টিতে উপকূলে জাহাজ ভেড়াবার মতো কোনো জায়গাই দেখা যাচ্ছে না। 'রেজোলিউশন' নামে এখানে একসময় একটা বন্দর ছিল। সেটা এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। তবু ওখানেই কোনো নোঙরের জায়গা খুঁজছি। চল্লিশ বছর ধরে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, গতবার ভূমিকম্পের ফলে বন্দরটিতে আগের মতো বড়োবড়ো জাহাজ দূরে থাক, সামান্য স্নার্ককে দাঁড় করাবারও বোধহয় জায়গা নেই সেখানে। শেষবার খবর বেরুবার পর আবার যে সেখানে আরেকটা ভূমিকম্পের ফলে গোটা বন্দরটাই সম্পূর্ণ বুজে যায়নি তা

কে বলতে পারে? একটানা অভগ্ন উপকূল ধরে ধরে স্নার্ককে চালিয়ে নিয়ে যাই। কিনারার রুক্ষ পাথরের ওপর ক্রুদ্ধ সমুদ্র লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে। দূরবিন চোখে লাগিয়ে মাইলের পর মাইল খুঁজি, কিন্তু প্রবেশ করবার মতো কোনো পথ নজরে পড়ে না। রাপাই হাল ধরে বসেছিল। অলক্ষ্যে ইঙ্গিত জানিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সে বললে, 'এখানে কোনো বন্দর নেই।' ডেকে উঠে দেখি স্নার্ক প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে অভগ্ন তটরেখার ওপর। অনেক কষ্টে ফেনিল সমুদ্রস্নাত শিলাগুলো থেকে স্নার্ককে টেনে আনি দুশো গজ দূরে।

দিক বদল করে উপকূলের সমান্তরালে জাহাজ চালালাম। চার্মিয়ান বসেছে স্টিয়ারিঙে। মার্টিন ইঞ্জিন ঘরে, প্রয়োজন হলেই ইঞ্জিন চালাবে। হঠাৎ একটা সরু খাড়ি নজরে পড়ল। দূরবিন দিয়ে দেখি সমুদ্রের ঢেউ গল্‌গল করে তার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। রাপার মানুষ হেনরী আর তাহার তেহেঈ ওদিকে তাকিয়ে আছে উদ্বিগ্ন চোখে। 'ওদিকে পথ নেই।' হেনরী বললে, 'ওখানে গেলে আমরা জলদি খতম। নির্ঘাৎ।'

স্বীকার করি, কথাটা আমিও ভেবেছি। ওদের পাশে ছুটে গিয়ে লক্ষ্য করি প্রবেশমুখের একপাশ থেকে সমুদ্রের বড়ো ঢেউ এসে অন্যপাশের তরঙ্গরেখার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে কিনা। তা তো হচ্ছে বটেই। তবে একটা সংকীর্ণ জায়গায় দেখা যাচ্ছে সমুদ্রজল শান্ত, নিস্তরঙ্গ। চার্মিয়ান হাল ছেড়ে ভালো করে খাড়িমুখটা দেখে প্রবেশ করবার জন্য তৈরি হল। ইঞ্জিন চালু করল মার্টিন। নিমেষের মধ্যে বাকি সকলে লাফিয়ে উঠল জাহাজের পাল খুলে নিতে। এমনকি রাঁধুনি লোকটাও।

উপসাগরের বাঁকের মুখেই একটি ব্যবসায়ীর বাড়ি দৃষ্টিগোচর হলো। উপকূল থেকে একশো গজ দূরে একটা উষ্ণ প্রস্রবণ বাষ্পের কুণ্ডলি ঠেলে তুলছে। নৌকো ভেড়াবার মত ছোট্ট একটা জায়গাও দেখা যাচ্ছে।

জল মাপবার দড়ি হাতে ওয়াডা চেঁচিয়ে বলল, 'তিন ফ্যাদম।'

তারপর গভীরতা দ্রুত কমতে লাগল। তিন থেকে দুই ফ্যাদম। হালের চাকা নিচের দিকে ঘুরিয়ে দিল চার্মিয়ান। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে মার্টিন। ঘুরে গিয়ে তিন ফ্যাদম গভীরতায় নোঙর ফেলল স্নার্ক।

আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার আগেই পাড়ে ভিড় জমিয়েছে অনেকগুলো কালো কালো মুখ। তাস্লার বাসিন্দা। বনমানুষের মত দাঁত বের করে হাসছে। জট পাকানো চুল, ভীরু চোখ, কানের ফুটোয় সেফ্‌টি-পিন আর মাটির পাইপ গোঁজা। পরনে কিছুই নেই, সামনেও না, পেছনেও নয়।

বলতে বাধা নেই, সেই রাত্তিরে, জাহাজের সবাই যখন ঘুমে অচেতন, আমি চুপিচুপি

ডেকে উঠে আসি। গর্বের সঙ্গে চারদিকের প্রশান্ত দৃশ্যের দিকে চেয়ে ভাবি জাহাজ-চালনায় আমার কেরামতির কথা—হ্যাঁ, সত্যিই গর্ববোধ করি।

পনেরো

সলোমন দ্বীপপুঞ্জে পর্যটন

'আমাদের সঙ্গে এখুনি আসুন না কেন ?'

গুয়াদালকানার দ্বীপের পেণ্ডুক্রীনে 'মিনোটা' জাহাজের ক্যাপ্টেন জানসেন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন।

চার্মিয়ান আর আমি পরস্পরের দিকে আধমিনিট তাকিয়ে নীরবে মত বিনিময় করি, তারপর একসঙ্গেই মাথা নেড়ে সায় জানাই। কোনো কাজ করতে গিয়ে আমরা দু'জন এভাবে মন স্থির করে থাকি। পদ্ধতিটা খুবই ভাল। বিশেষ করে যখন ঘন-দুধের শেষ কৌটোখানা উল্টে গেলেও কেঁদে কূল পাবার পথ থাকে না! (ইদানীং টিনে পোরা খাদ্যই তো খেয়ে কাটাচ্ছি, আর শুনতে পাই মন নাকি বস্তুরই প্রকাশ মাত্র, তাই আমাদের উপমাগুলো স্বাভাবিকভাবে মন-বর্জিত বস্তাঠাসা ভাঁড়ার ঘরের মতো)।

'সঙ্গে আপনাদের রিভলবার নেবেন। আর গোটা দুই রাইফেল।' ক্যাপ্টেন জানসেন বললেন, 'আমাদের জাহাজে পাঁচটা রাইফেল আছে। একটা মাউজারের আবার গুলি নেই। আপনাদের কাছে অতিরিক্ত গুলি আছে কি ?

আমাদের রাইফেলগুলো মিনোটা জাহাজে তোলা হলো। মাউজারের কার্তুজও বেশ কিছু আনা হয়েছে। সঙ্গে এল স্নার্কের পাচক ও কেবিন বয়—ওয়াডা আর নাকাতা। দু'জনেই খানিকটা ভীতসন্ত্রস্ত। বলতে গেলে ওদের মোটেই উৎসাহ নেই, যদিও অবশ্য বিপদের সময় নাকাতা আগে কখনো দুর্বলতা দেখায়নি।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ওদের প্রতি বড়ো একটা সহৃদয়তাও দেখায়নি। প্রথম ধাক্কাতেই ওদের এক রকমের ঘা হয়ে গিয়েছিল যার নাম 'সলোমন ঘা'। আমাদের বাকি সকলেরও হয়েছিল। (আমারই তো দুটো ঘায়ে তখনো 'করোসিভ সাবলিমেট' সহযোগে শুশ্রূষা চলছে) কিন্তু জাপানী দুজনের ঘা যেন আরো বেশি—ঘাগুলোও মোটেই ভাল নয়।

বলা যেতে পারে 'অতি-সক্রিয়' আলসার। মশার একটা কামড়, কেটে যাওয়া বা

সামান্য ছড়ে-যাওয়া জায়গায় বিষ জমে ওঠে। এখানে বিষ যেন সারা বাতাসেই ছড়িয়ে আছে। অবিলম্বে আলসারের বিষ আক্রান্ত জায়গাটিকে খেতে শুরু করে। খেতে থাকে সর্বদিকেই। চামড়া ও মাংসপেশীর ক্ষয় হতে থাকে অবিশ্বাস্য দ্রুত-গতিতে। আলসারের আজ যা সূচীমুখ—কাল তা একটা সিকির আকার ধারণ করবে। সপ্তাহ শেষে একটা রুপোর ডলারমুদ্রা দিয়েও তাকে পুরো ঢেকে রাখা যাবে না। ঘায়ের থেকেও মারাত্মক সলোমন দ্বীপের জ্বর। দুজন জাপানীই এই জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। বারে বারে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল, কিছুটা বল ফিরে পেলেও ক্লিষ্ট মুহূর্তগুলো ওরা জড়াজড়ি করে কাটাতো স্নার্কের ডেকে। ওদের চোখ সেদিকেই নিবদ্ধ থাকত যেদিকে রয়েছে সুদূর জাপান। দৃষ্টির মধ্যে ফুটে উঠতো কাতর আকুতি। এবার সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার—মিনোটা জাহাজটি আসলে মালাইটার বন্য সমুদ্রোপকূল ঘুরে ঘুরে ইওরোপীয় খেত-খামারের জন্য কালো শ্রমিক সংগ্রহের কাজে বেরিয়েছে। আর এই জাহাজেই চড়ানো হয়েছে ওদের দুজনকে। সব থেকে বেশি ভীত হলো ওয়াডা। মিনোটায় আমাদের রাইফেল,গুলিকার্তুজ তোলার সময় নিরুৎসাহ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে ছিল ওইদিকে। মিনোটা জাহাজ এবং তার মালাইটা সফরের ব্যাপারটা ওয়াডার অজানা ছিল না। এও জানতো যে এই জাহাজটাকে দু'মাস আগে আদিম অধিবাসীরা দখল করে নিয়েছিল মালাইটার উপকূলে, আর জাহাজের ক্যাপ্টেনকে 'টোমাহক' কুঠার দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটেছিল তারা। ওদের নিজস্ব ন্যায্য বাঁটোয়ারার হিসেবে আদিম অধিবাসীদের পাওনা ছিল আরো দুটো জাহাজীর মাথা। পেণ্ডুফ্রিন বাগিচার একটি ছোকরা মজুর আগেই আমাশারোগে মারা যায়, তাই একটি মাথা ওদের উদ্বৃত্ত পাওনা—তাও ওয়াডা জানে। এসব ঘটনার ফলে ওয়াডার মনে ধারণা হয়েছিল জীবনে সে আর বুঝি জাপানের মুখই দেখতে পাবে না।

আমাদের মালপত্রগুলো ক্যাপ্টেনের ছোট কেবিনে তোলার সময় ওয়াডার নজর পড়ে কেবিনের দরজায়। কুড়োল দিয়ে কেটে দরজা খুলেছিল বিজয়ী জংলী মানুষেরা, সেই কুড়োলের দাগ এখনো স্পষ্ট। রান্নাঘরে উনোনের পাইপটাও নেই, লুটের সামগ্রী হিসেবে ওটা এখন জংলীদের দখলে।

মিনোটা জাহাজ সেগুন কাঠের তৈরি শক্তসমর্থ গড়নের অস্ট্রেলীয় ইয়ট—লম্বা এবং সরু। কালো শ্রমিক যোগাড়ের কাজ থেকে বরং প্রতিযোগিতামূলক দৌড়ের জন্যই বেশি উপযোগী। চার্মিয়ান আর আমি মিনোটায় উঠে দেখি জাহাজভর্তি লোক। জোড়াবোটে পনেরজন মাল্লা। যাত্রী হিসেবে যাচ্ছে এক কুড়িরও বেশি শ্রমিক যারা আবাদের চুক্তিমাফিক কাজ শেষ করে তাদের বুনো গ্রামগুলোতে ফিরে যাচ্ছে।

ওদের দিকে চোখ পড়লেই মনে হয় সত্যি ওরা মুণ্ডুশিকারী নরখাদক। ওদের ফুটো করা নাকে শোভা পাচ্ছে হাড়ের টুকরো আর কাঠের গোঁজ, যার আকার একেকটা পেন্সিলের মত। কয়েকজনের ফুটোকরা নাকের নরম ডগায় ঝুলছে কাছিমের খোলার শলাকা আর শক্ত তারেগাঁথা মালার গুটি। কয়েকজনের নাক থেকে ঠোঁট অবধি সারি করে ফুটো করা। প্রত্যেকটি মানুষের কানেই অনেক ছ্যাঁদা। তিন ইঞ্চি মোটা কাঠের গোঁজ থেকে মাটির পাইপ অবধি স্বচ্ছন্দে এঁটে যাবে ফুটোগুলোতে। সত্যি বলতে কানের অতোগুলো ফুটো ভর্তি করবার মত অলঙ্কার সকলের জোটেনি। পরদিন আমরা মালাইটার কাছাকাছি এসে রাইফেলগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা পরীক্ষা চালাবার জন্য গুলি ছুঁড়েছি আর সঙ্গেসঙ্গে কার্তুজের খালি খোলগুলো সংগ্রহ করার জন্য ওদের মধ্যে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। যারা পেল তারা তক্ষুনি তাদের কানের খালি ফুটোয় সেগুলো ভরে যেন স্বস্তি পেল।

রাইফেলগুলো পরখ করার সময় জাহাজের চারপাশ কাঁটাতারে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। মিনোটার রেলিং মাত্র ছ'ইঞ্চি উঁচু; জাহাজে ওঠা যায় অনায়াসে। তাই পিতলের বড় বড় দণ্ড বসিয়ে দু'পাল্লায় কাঁটাতার ঘেরা হয়েছে। সামনের গলুই থেকে পিছনের হাল, আবার পিছনের হাল থেকে গলুই। বুনোদের হাত থেকে রেহাই পাবার ভাল ব্যবস্থা সন্দেহ নেই, কিন্তু মিনোটার আরোহীদের সেটা বড়োই অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছে। বিশেষ করে সমুদ্রের মাঝে যখন ঢেউয়ের সঙ্গে লাফঝাঁপ করতে হয় জাহাজটিকে। জাহাজ একদিকে কাত হল তো গড়িয়ে পড়লাম কাঁটাতারে। ওটাই আকড়ে ধরে পতন থেকে বাঁচতে গেলে কাঁটাতারে খোঁচা লাগে। আবার গড়াতে গড়াতে খোলা ডেকে এসেও জাহাজ যখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে কাত হয়—তখন টের পাওয়া যায় সলোমন দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ-সুখ কাকে বলে! আরেকটা কথাও মনে রাখতে হবে। কাঁটাতারে পড়লে শুধু কেটেছড়েই যাবে না, প্রত্যেকটা কাটা বা ছড়া নিশ্চয় বিষাক্ত আলসারে পরিণত হবে। সতর্কতা নিলেও কি কাঁটাতারের হাত থেকে রেহাই আছে? এক সুন্দর সকালবেলা মালাইটার উপকূল ধরে যাবার সময় পেলাম তার নমুনা। চমৎকার বাতাস, ঢেউগুলোও ধীর শান্ত। একটা কালো ছেলে জাহাজের হাল ধরে আছে। ক্যাপ্টেন জানসেন, জাহাজের মেট জ্যাকবসেন, চার্মিয়ান আর আমি ডেকে বসে প্রাতরাশ সারছি। আচমকা তিনটে অস্বাভাবিক বড়ো ঢেউয়ের পাল্লায় পড়ি আমরা। হাল-ধরা কালো ছেলেটা বিষম ঘাবড়ে যায়। তিনবারই মিনোটার ওপর দিয়ে আছড়ে গড়িয়ে যায় ঢেউ। এদিকে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে গলে গেল আমাদের প্রাতরাশও। সঙ্গে গেল ছুরি কাঁটা চামচ। পেছন ডেকের

একটি ছেলে সোজা জলে পড়ে গেছে। তক্ষুনি টেনে তোলা হলো তাকে। আমাদের জাহাজপরিচালক মশাইয়ের শরীর অর্ধেক জাহাজে, অর্ধেক বাইরে, কাঁটাতারে জড়িয়ে আটকে গেছে। এ ঘটনার পর আমাদের বাকি সফরে যে'কটা থালাবাসন বেঁচেছিল তাই সবাই মিলে 'যৌথভাবে' ব্যবহার করি—আদিম সাম্যবাদী সমাজের চমৎকার নমুনা। 'ইউজিনী' জাহাজে তো আরও খারাপ অবস্থা হয়েছিল। আমাদের সকলের খাবার জন্য অবশিষ্ট ছিল মাত্র একটি চামচ। ইউজিনীর ব্যাপার অবশ্য ভিন্ন এক কাহিনী।

মালাইটার পশ্চিম উপকূলে স্যু-উ হল আমাদের প্রথম বন্দর। সলোমন দ্বীপপুঞ্জে হাজারো ঝামেলা। একেই তো রাতের অন্ধকারে জাহাজ চালানো কঠিন কাজ—খোঁচা খোঁচা ডুবো পাহাড়ে ভরা প্রণালী, তায় আবার উল্টোপাল্টা স্রোত, যেখানে কোনো আলোই নেই জাহাজকে পথ দেখাবার জন্য। সলোমনের উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল হাজার মাইল লম্বা, আর এই হাজার মাইলের উপকূলে একটিও বাতিঘর নেই। কিন্তু অবস্থা শুধু এই নয়। আরো কঠিন ব্যাপার হলো, এই উপকূল ভূমির কোনো নির্ভুল মানচিত্র নেই। স্যু-উ বন্দরটাই একটি উদাহরণ। সরকারী নৌবহরের ম্যাপে মালাইটার উপকূলে দেখানো হয়েছে সিধে অভগ্ন রেখা দিয়ে। অথচ, এই উপকূল ধরে মিনোটা চলেছে কুড়ি ফ্যাদম গভীর জলের উপর দিয়ে! যেখানে মাটি আছে বলে ম্যাপে দেখানো হয়েছে, সেখানে গভীর খাঁজকাটা খাড়ি। আর তারই একটাতে আমরা ঢুকে পড়ি। চারদিক থেকে আমাদের ওপর ঝুঁকে রয়েছে ম্যানগ্রোভ গাছ। শেষে নোঙর ফেলা হল আয়নার মত স্বচ্ছ এক জলাশয়ে। এখানে নোঙর করা ক্যাপ্টেন জানসেনের মোটেই পছন্দ হয়নি। জীবনে প্রথম এখানে এসেছেন জানসেন, আর স্যু-উ'রও খুব বদনাম। হঠাৎ আক্রান্ত হলে পালাবার মতো অনুকূল বাতাসই পাওয়া যাবে না। তখন মাল্লারা যদি তিমি শিকারের নৌকো নিয়ে সরে পড়ার চেষ্টাও করে, তবু ওদের শেষ মাল্লাটা অবধি জংলীদের হাতে কচুকাটা হবে। সত্যিকারের বিপদ দেখা দিলে বেশ ভালো ফাঁদ হয়ে দাঁড়াবে জায়গাটা।

'আপনার মিনোটা যদি ডাঙায় ভিড়ে যায় তাহলে কী করবেন? ক্যাপ্টেন জানসেনকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'জাহাজ মোটেই ডাঙায় ভিড়বে না।' ক্যাপ্টেনের উত্তর।

'ধরুন, যদি ভিড়েই যায়?' আমি নাছোড়বান্দার মত বলি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্যাপ্টেন একবার তাকালেন রিভলবার কোমরে আঁটতে

থাকা মেটের দিকে, তারপর চোখ ফেরালেন মাল্লাদের দিকে—তারা একেকজন একেকটা রাইফেল নিয়ে তিমি শিকারী নৌকোয় উঠছে। এবার একটু দেরি করে তিনি জবাব দিলেন—

'আমরা ওই তিমি-শিকারী নৌকোটাতে চেপে যতো তাড়াতাড়ি পারি কেটে পড়ব এখান থেকে।'

পরে সব কথাই খুলে বললেন ক্যাপ্টেন। কোনো সাদা মানুষই মালাইটার মাল্লাদের বিশ্বাস করে না, বিশেষ করে এরকম একটা বিচ্ছিরি জায়গায়। এখানকার বুনো মানুষরা সমস্ত ভাঙা জাহাজকেই নিজেদের সম্পত্তি বলে গণ্য করে। বুনো লোকগুলোর আছেও প্রচুর স্নাইডার রাইফেল। এই জাহাজেই সু-উ'তে নামার মতো ডজনখানেক 'আবাদ-ফেরত' মালাইটাবাসী আছে যারা লুট করবার সময় তাদের ভাই বেরাদারদের সঙ্গে অবশ্যই হাত মেলাবে।

তিমি-শিকারী নৌকোটার প্রথম কাজ হলো মালাইটার আবাদ-ফেরত লোকগুলো এবং তাদের বোঁচকাবুঁচকি ডাঙায় নামিয়ে দেওয়া। এভাবে একটা বিপদ তো কাটানো গেল। এই কাজ যখন চলছে তখন জাহাজের পাশে একটা ক্যানো এসে দাঁড়াল। তিনটি উলঙ্গ বুনো তার আরোহী। আমি যখন উলঙ্গ বলেছি তখন আক্ষরিক অর্থেই তারা উলঙ্গ। পরনে একটুকরো কাপড় নেই—অবশ্য যদি না ওদের কান-নাকের সেই রিং, গোঁজ আর ঝিনুকখোলার বাজুবন্ধগুলোকেই পোশাক বলে চালানো যায়! ক্যানোর মোড়ল একজন বুড়ো সর্দার। তার একটা চোখ কানা। তবে বন্ধুভাবাপন্ন বলে নাকি তার সুনাম আছে। সর্বাঙ্গে এত ময়লা যে সাফ করতে গেলে জাহাজের ডেক-মাজা বুরুশও বিলকুল ক্ষয়ে যাবে। বুড়ো সর্দারের এখানে আসার কারণ ক্যাপ্টেনকে সতর্ক করে দেওয়া—যেন জাহাজের কোনো লোক ডাঙায় না নামে। সেই রাতে বুড়ো আরেক বারও এসে সতর্ক করে গিয়েছিল।

তিমি-শিকারী নৌকোটা বৃথাই উপকূল ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে নতুন মজুর যোগাড় করার উদ্দেশ্যে। জঙ্গলে বিস্তর সশস্ত্র স্থানীয় মানুষ। তারা সবাই রংরুটদারের সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক, কিন্তু কেউই বছরে ছ' পাউণ্ডের বিনিময়ে আবাদে তিন বছরের খাটুনি খাটতে রাজি নয়। এদিকে আমাদের লোকেরা ডাঙায় নামুক—এটাও তারা চায়। যথেষ্ট আগ্রহই দেখায়।

দ্বিতীয় দিনে উপসাগরের মুখে সমুদ্রসৈকতের ওপর তারা একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি তুলে সংকেত জানাল। সংকেতের অর্থ—তারা আবাদে কাজ করতে ইচ্ছুক। নৌকো পাঠানো হল। কিন্তু কোনো ফল হল না। ভর্তি তো কেউ হলই না, আমাদের

লোকদেরও আর ডাঙায় নামবার জন্য লোভ দেখানো হল না। কিছুক্ষণ পরে সমুদ্র-তীরের এখানে ওখানে জনাকয়েক সশস্ত্র স্থানীয় বাসিন্দাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। কিন্তু জঙ্গল ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে যে কতো বুনো মানুষ ওৎ পেতে রয়েছে তার হিসেব নেই। আদিম ওই বনজঙ্গল চোখের দৃষ্টির পক্ষে একেবারেই দুর্ভেদ্য।

দুপুরের পর ক্যাপ্টেন জানসেন, চার্মিয়ান আর আমি ডিনামাইট দিয়ে মাছ শিকার করতে গেলাম। নৌকোর প্রত্যেকটি মাল্লাই সঙ্গে লী-এনফিল্ড রাইফেল রেখেছে। জনি নামে মজুরসংগ্রাহক স্থানীয় আদিবাসীটিও সঙ্গে একটি উইনচেস্টার রাইফেল নিয়ে সামনের গলুইতে বসল।

পাড়ের খুব কাছাকাছি এমন একটা জায়গা ঘেঁষে নৌকোর দাঁড় বাইছি যেখানে দেখলে মনে হয় জনশূন্য। এখানেই নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে পেছন দিকটা ডাঙার দিকে ফেরানো হল যাতে আক্রান্ত হলে ছুটে পালিয়ে যাওয়া যায়। যতদিন মালাইটা ছিলাম, দেখেছি কোন নৌকোর গলুই ডাঙার দিকে ফেরানো থাকে না। বরং বাস্তব ক্ষেত্রে, মজুর যোগাড়ের জাহাজগুলো দুটো নৌকো ব্যবহার করে থাকে—প্রথম নৌকোটির মাল্লারা ডাঙায় নামে, অবশ্যই সশস্ত্র হয়ে। দ্বিতীয় নৌকোটি ডাঙা থেকে কয়েকশো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকে প্রথমটিকে "পাহারা" দেবার জন্য। মিনোটা ছোট জাহাজ বলে পাহারার আলাদা নৌকো রাখতে পারেনি।

আমাদের নৌকো যখন ডাঙার উল্টোদিকে গলুইর মুখ রেখে ডাঙার খুব কাছাকাছি চলছে তখন পাওয়া গেল প্রথম মাছের ঝাঁকেব দর্শন। পলতে জ্বালিয়ে ডিনামাইট ছোঁড়া হলো। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে নিস্তরঙ্গ জল ভেঙে বিদ্যুতের ঝলক দিয়ে মাছগুলো লাফিয়ে উঠছে। আর সেই মুহূর্তে জঙ্গল ঝোপঝাড়ে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গেল। পাড়ে ছুটে এসে হাজির হলো জনা কুড়ি উলঙ্গ বুনো, সঙ্গে তীরধনুক, বল্লম, স্নাইডার। আমাদের নৌকোর মাল্লারাও সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছে। দু'পক্ষই যখন মুখোমুখি সেই অবসরে আমাদেরই কয়েকটি ছোকরা ডিনামাইটের শব্দে ভেবড়েযাওয়া মাছগুলো ধরবার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তিনটি নিষ্ফল দিন কেটে গেল সু উ'তে। মিনোটা কোনো নতুন শ্রমিক সংগ্রহ করতে পারল না, বুনো মানুষদের সংগ্রহেও জমা পড়ল না মিনোটার কোনো কাটা মুণ্ড। ইতিমধ্যে ওয়াডাই যা হোক কিছু পেয়েছে—সে জ্বর বাধিয়ে বসেছে। তিমিনৌকো উপকূল ধরে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে লাঙ্গা-লাঙ্গার দিকে।* লাঙ্গা-লাঙ্গা নোনাজলের মানুষদের বড় একটা গ্রাম, আশ্চর্য পরিশ্রমে প্রবালের বালুসৈকতভূমিতে গড়া। সত্যি বলতে কি, মানুষের হাতে গড়া দ্বীপটি আসলে কৃত্রিম দ্বীপই। রক্তপিপাসু জংলী

মানুষদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একটা আশ্রয়স্থল।

এখানে, লেগুনের সৈকতের দিকে বিনু নামে আর একটা জায়গায় ছ'মাস আগে মিনোটা জাহাজ চলে গিয়েছিল বুনোদের দখলে, আর মিনোটার ক্যাপ্টেনকে খুন করেছিল তারাই।

আমরা যখন একটা সরু জলপথ ধরে এগোচ্ছি, নৌকোর কাছে এল একটা ক্যানো। ক্যানো-চালকের কাছে শুনলাম একটি মানোয়ারী জাহাজ (রণতরী) আজ সকালেই এখান থেকে চলে গেছে। নাম 'ক্যাম্ব্রিয়ান'। জাহাজটি তিনটি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, তিরিশটি শুয়োর মেরেছে, আর একটি শিশুকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে। এ সেই ক্যামব্রিয়ান জাহাজ যার অধিনায়ক ক্যাপ্টেন লিউইস্। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় কোরিয়াতে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। সেই থেকে আজ আবার অনেক বার পরস্পরের পথ ডিঙিয়েছি কিন্তু একবারও দেখা হয়নি। স্নার্ক যেদিন ফিজির সুভায় প্রবেশ করে, দূর থেকে ক্যাম্ব্রিয়ানকে দেখেছি বন্দর ছেড়ে চলে যেতে। নিউ হেব্রাইডিস-এর ভিলা দ্বীপে একটি দিনের ব্যবধানে ক্যাম্ব্রিয়ানের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি।

স্যান্টো দ্বীপের কাছে এক রাতের অন্ধকারে আমরা পরস্পরকে অতিক্রম করেছি। 'ক্যাম্ব্রিয়ান' যেদিন তুলাগীতে প্রবেশ করে, সেদিনই আমরা মাত্র বার মাইল দূরে পেণ্ডুফীন বন্দর ছেড়ে রওনা হই। আর এই লাঙ্গা-লাঙ্গাতে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই তারা আমাদের ফস্‌কে চলে গেল! ক্যাম্ব্রিয়ান এসেছিল মিনোটার ক্যাপ্টেনের হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে। কিন্তু কতদূর কী করতে পেরেছে তার বিবরণ সন্ধ্যার আগে জানতে পারিনি। নিজস্ব তিমিনৌকোয় চেপে মিঃ অ্যাবট নামে এক মিশনারি আমাদের নৌকোর পাশে এলেন। জানা গেল, গ্রামগুলো পোড়ানো হয়েছে, শুয়োরও মারা হয়েছে, তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈহিক ক্ষয়-ক্ষতি কিছু হয়নি। বুনো হত্যাকারীদের ধরা যায়নি, যদিও মিনোটার পতাকা ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। শিশুটির মৃত্যু হয়েছে ভুল বোঝাবুঝির ফলে। বিনু দ্বীপের মোড়ল জনি রাজি হয়নি আগন্তুক দলকে জঙ্গলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে। ওর সঙ্গীরাও কেউ এ কাজ করতে চায়নি। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে ক্যাপ্টেন লিউইস্ জনিকে ভয় দেখান, তার গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ারই যোগ্য। এখন জনির সামান্য জগাখিচুড়ি ইংরেজিতে "যোগ্য" কথাটি নেই। তাই সে সোজাসুজি অর্থে বুঝে নিল গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়াই হবে। গ্রামের লোকেরা খবর পেতেই তাদের মধ্যে এমন হুড়োহুড়ি লেগে যায় যে মাঝখান থেকে শিশুটি জলমগ্ন হয়ে মারা যায়। এই সময় মোড়ল জনি ছুটে আসে মিঃ অ্যাবটের কাছে। তাঁর হাতে

চোদ্দটা স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিয়ে অনুরোধ করে যেন তিনি ক্যাপ্টেন লিউইস্‌কে মুদ্রাগুলো দিয়ে শান্ত করেন। ক্যাপ্টেন লিউইস্ জনির গ্রামকে রেহাই দেন, কিন্তু লিউইস্‌ও চোদ্দটা স্বর্ণমুদ্রা পাননি, কারণ আমি পরে ওই মুদ্রাই দেখেছি জনির হাতে, যখন সে মিনোটাতে এসেছিল। জনি অবশ্য কাপ্টেন লিউইস্‌কে জঙ্গলের পথ দেখিয়ে সাহায্য না করবার অন্য একটা ওজর দেখিয়েছিল। আসল কারণটা যদিও সে প্রকাশ করেনি তবে আমরা জেনেছি—ওই কাজটা করলে বুনো বাসিন্দারা তাকে খতম করে দিত। ক্যাম্‌ব্রিয়ান এখান থেকে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই জংলী মানুষেরা রক্তাক্ত প্রতিশোধে মেতে উঠত।

বৃথাই সুদূর সলোমন দ্বীপপুঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছি না আমি। একটা ব্যাপারে অবশেষে দেখলাম চার্মিয়ানের অহংকার আর 'সম্রাজ্ঞীসুলভ' মেয়েলিপনা ধুলোয় লুটিয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছিল লাঙ্গা-লাঙ্গায়, সেই আদিবাসীদের নিজের হাতে গড়া দ্বীপটিতে। ওখানে কয়েকশো লজ্জাবোধহীন উলঙ্গ পুরুষ, নারী ও শিশুদের দঙ্গলে ঘেরাও হয়ে দর্শনীয় জিনিসগুলো ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছিলাম। আমাদের সকলের কোমরেই রিভলভার গোঁজা। একটু দূরেই দাঁড় তুলে নৌকোয় বসে আছে আমাদের সশস্ত্র মাল্লারা। যদিও বিপদের আশংকা ছিল না, তবু মানোয়ার জাহাজটির হালের ধ্বংসলীলার জন্যই এই সতর্কতা। সর্বত্র পায়ে হেঁটে ঘুরে সব কিছু দেখেশুনে অবশেষে অল্পজলের একটা খালের কাছে এলাম। একটা গাছের গুঁড়ি ফেলে তার ওপর সাঁকো বানানো হয়েছে। পার হতে গিয়ে বাধা পেলাম। কালো মানুষেরা আমাদের পথ রোধ করে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। জানতে চাইলাম, কেন আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে? আদিবাসীরা জানালো—আপনারা যেতে পারেন। আমরা ভুল বুঝে পার হতে গিয়েই এবার বুঝতে পারলাম বাধা দেবার সঠিক কারণ। ক্যাপ্টেন জানসেন ও আমি—পুরুষ বলে সঁাকোর ওপর দিয়ে ওপারে যাবার অধিকারী। কিন্তু কোনো "মেরী" পার হওয়া দূরে থাক, সঁাকোর পাশ দিয়ে জলে হেঁটেও যেতে পারবে না। এখন জগাখিচুড়ি ইংরেজিতে "মেরী" মানে হলো স্ত্রীলোক। চার্মিয়ান একজন "মেরী" তাই তার কাছে ওই সঁাকো হল ট্যাবু। ওদের ভাষায় 'ট্যাবু'—নিষিদ্ধ।

গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল—সাবাশ্! শেষ পর্যন্ত আমার পৌরুষেরই জয় দেখছি! আমি তো আসলে সেই প্রভুজাতেরই একজন। চার্মিয়ান আমাদের পায়ে পায়ে ধুঁকে ধুঁকে চলতে পারে বটে, কিন্তু আমরা হলাম 'বেটাছেলে'। আমরা সঁাকোটার ওপর দিয়ে সোজা হেঁটে যেতে পারব, কিন্তু চার্মিয়ানকে যেতে হলে নৌকোয়

চেপে ঘুরে যেতে হবে।

কিন্তু তাই বলে পরবর্তী ঘটনাগুলো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ দেয় তা আমি চাই না। সলোমন দ্বীপপুঞ্জে সবারই এটা জানা কথা যে 'মানসিক আঘাতের' ফলে প্রায়ই এখানকার মানুষ জ্বরে আক্রান্ত হয়। চার্মিয়ানকে সাঁকো পেরুতে বাধা দেবার আধ-ঘণ্টার মধ্যেই তাকে ঠেলেঠুলে মিনোটায় তোলা হলো। কম্বলের পর কম্বল চাপিয়ে ও কুইনাইন খাইয়ে চলল তার চিকিৎসা। ওয়াডা ও নাকাতার কী ধরনের মানসিক আঘাত লেগেছিল তা আমার জানা নেই, তবে তারাও তখন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ধুঁকছিল। হয়তো এবার সলোমন দ্বীপ অসুখবিসুখ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

এই জ্বরের মধ্যেই চার্মিয়ানের শরীরে দেখা দিল 'সলোমন ঘা'। আমাদের মধ্যে সেই একমাত্র ব্যক্তি যার এই ঘা আগে হয়নি। বাকি সকলেই ভুগেছে। আমার পায়ের বিষাক্ত ঘাটার জন্য মনে হতো পায়ের পাতাই হয়তো গোড়ালি থেকে উপে যাবে। হেনরী ও তেহেঈর হয়েছিল অনেকগুলো করে ঘা। ওয়াডারও একই অবস্থা। নাকাতার একেকটা ঘাই তো তিন ইঞ্চির মত লম্বা। মার্টিনের নিশ্চিত ধারণা ওর হাঁটুর নিচে হাড় পচেছে ওখানে ও যে ঘায়ের উপনিবেশ পুষে রেখেছিল তার বীজাণু থেকেই। কিন্তু এতদিন চার্মিয়ান ছিল মুক্ত। দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ-ক্ষমতার গুণে, আমাদের প্রতি ওর একটা অবজ্ঞা ভাবই এসে গিয়েছিল। ওর অহমিকা এমনই বেড়ে গিয়েছিল যে এক-দিন আমাকে লাজুকভাবে বলেই ফেলল—এসবই হল বিশুদ্ধ রক্তের ব্যাপার। আমাদের সকলেরই হয়েছে, ওরই এসব ঘা-ফা হয় না, ইত্যাদি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরও কিনা একটা রুপোর ডলারের আকারে ঘা হল। এমনই ওর রক্তের বিশুদ্ধতা যে কয়েক হপ্তা একনাগাড়ে কঠোর শুশ্রূষা করে তবে সে ঘা সারল। করোসিভ সাবলিমেটের ওপরেই এখন ওর অগাধ ভক্তি। মার্টিনের ভরসা আয়োডোফর্মে। কাঁচা লেবুর বিশুদ্ধ রস লাগাতে থাকে হেনরী। আর আমার বিশ্বাস হাইড্রোজেন-পারঅক্সাইড দিয়ে অনবরত ক্ষতস্থান পরিষ্কার করলে সুফল পাওয়া যায়—করোসিভ সাবলিমেটে তেমন কাজ হয় না। আবার সলোমনের শ্বেতকায় লোকেরা এক্ষেত্রে হয় বোরিক অ্যাসিড, নয়তো লাইসল ব্যবহার করে। আমার সর্বরোগহর ওষুধটির নাম অবশ্য 'ক্যালিফোর্নিয়া'—জাঁক করে বলতে পারি, সেখানে কারো 'সলোমন ঘা' হয় না।

আমরা লাঙ্গা-লাঙ্গা থেকে বিদায় নিয়ে ম্যানগ্রোভ গাছের ঝোপের ফাঁক দিয়ে লেগুন পেরিয়ে আসি। সরু জলপথ মিনোটার চেয়ে একটুও চওড়া নয়। পেরিয়ে আসি প্রবালপ্রাচীরের গ্রাম কালোকা ও আউকি হয়ে। ভেনিস যারা গড়েছিল, তাদের মতোই এই নোনাজলের মানুষেরাও একসময় মূলভূমি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এখানে এসেছিল।

জংলী গ্রামগুলোতে অনবরত খুনখারাপির মধ্যে টিকতে না পেরে অবশিষ্ট প্রাণীগুলো লেগুনের বালুকা সৈকতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই বালুকা তটকে ওরা নিজস্ব দ্বীপে পরিণত করে নেয়। তাদের একমাত্র সঙ্গী বলে মেনে নিতে হয় সমুদ্রকেই। ফলে কাল-ক্রমে তারা হয়ে পড়ে নোনা-জলের মানুষ। তারা শিখেছিল মাছ ও ঝিনুকের চালচলন জীবিকা রহস্য। আবিষ্কার করেছিল মাছ ধরার বঁড়শি, সুতো, জাল আর ফাঁদ। ক্যানো তৈরি করার কায়দাও জেনে ফেলেছিল। হেঁটে চলে বেড়াবার মত জায়গার অভাবে, দিনের বেশির ভাগ সময় ক্যানোতেই কাটাতো বলে তাদের শারীরিক গঠনেরও পরিবর্তন হল। মোটা মোটা হাত, চওড়া কাঁধ, সরু কোমর আর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও লম্বা লগ্‌বগে পা।

সমুদ্র-উপকূল দখলে থাকার ফলে নোনা-জলের মানুষেরা হল ধনী, কারণ দেশের ভেতরের এলাকার সঙ্গে ব্যবসার লেনদেন, বেশির ভাগ ওদের মারফতই চলে। কিন্তু জংলী মানুষদের সঙ্গে ওদের তো চিরকালের শত্রুতা। দু'পক্ষের শর্তসাপেক্ষ সন্ধির দিন শুধু হাটবারের দিনগুলোতে। সপ্তাহে দু'দিন নিয়মিত তা ঘটে। হাটগুলোতে দু'পক্ষের মেয়েরাই পণ্যবিনিময়ের মাধ্যমে লেনদেন চালায়। হাট থেকে শতখানেক গজ দূরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে সশস্ত্র জংলী মানুষরা লুকিয়ে পাহারা দেয়, আর ওধারে সমুদ্রের দিকে ক্যানোতে বসে প্রস্তুত থাকে নোনা-জলের মানুষেরা। হাটবারের এই সাময়িক সন্ধি কদাচিৎ ভঙ্গ হতে শোনা গেছে। এদিককার মাছ খুবই লোভনীয় জংলী মানুষদের কাছে। অন্যদিকে ছোট ছোট জনাকীর্ণ দ্বীপগুলোতে চাষ দুঃসাধ্য বলে নোনাজলের মানুষদের কাছে শাক-শবজির দারুণ চাহিদা। শারীরিক প্রয়োজনেই।

লাঙ্গা-লাঙ্গা থেকে তিরিশ মাইল পথ উজিয়ে আমরা এলাম মূল ভূখণ্ড ও বাসুকান্না দ্বীপের মাঝখানের প্রণালীটায়। সন্ধ্যে হতেই বাতাস ঝিমিয়ে গেল। ফলে সমস্ত রাত ধরে তিমি-নৌকো আমাদের সামনে টেনেছে, জাহাজের মাল্লারা সজোরে জাহাজ ঠেলতে গিয়ে গলদঘর্ম, আমরা তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি এগিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু বাগড়া দিল আমাদের উল্টোদিক থেকে জোয়ারের জল। মাঝরাতে প্রণালীর মাঝামাঝি এসে দেখা পেলাম ইউজিনী জাহাজের। শ্রমিক সংগ্রহকারী স্কুনার। দুটি তিমিশিকারী নৌকো জাহাজটাকে আগে ঠেলে চলছে। ইউজিনীর চালক ক্যাপ্টেন কেলার স্বাস্থ্যবান, বাইশ বছরের তরুণ জার্মান। আমাদের জাহাজে উঠে এলেন দু'দণ্ড গল্প-গুজব করবার জন্য। আমরা মালাইটার বর্তমান অবস্থা নিয়ে খবর বিনিময় করি। ওঁর বিশেষ সৌভাগ্য যে 'ফিউ' গ্রাম থেকে ওঁরা কুড়িজন মজুর যোগাড় করতে পেরেছেন।

ফিউ গ্রামে ক্যাপ্টেন কেলার থাকতেই একটা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। একটি মজুর যুবককে খাওয়ার নাম করে ফুসলিয়ে জংলী মানুষরা গুলি করে তার মাথা ফুটো করে দেয়, আর পেটে বল্লম ঢুকিয়ে মোচড় দিয়ে তাকে মারে। 'বুঝলেন!' ক্যাপ্টেন কেলার বলেন, 'আমাকে যেন কেউ স্নাইডার দিয়ে গুলি না করে! বাবাঃ! ছেলেটার মাথায় ইয়া বড় এক ফুটো হয়ে গিয়েছিল! ঘোড়ার গাড়িও স্বচ্ছন্দে গলে যেতে পারত সেই ফাঁক দিয়ে।'

আর একটা দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ডের কথা আমি শুনেছি। মালাইটাতেই সম্প্রতি এই ঘটনা ঘটে। এক বুড়ো জংলী মোড়লের স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়। কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যুতে জংলীদের বিশ্বাস নেই। ওরা তা জানেই না। ওদেশে মৃত্যু হয় গুলিতে, কুঠারের আঘাতে, নয়তো বল্লমের ফলায়। অন্যভাবে মরা মানেই ওরা ধরে নেবে এই মৃত্যুর পিছনে কোন তুকতাক কাজ করেছে। বুড়ো জংলী মোড়লের স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও উপজাতির লোকেরা অপরাধের দায়িত্ব চাপিয়ে দিল একটি পরিবারের ওপর সেই পরিবারের কোন্ ব্যক্তি এই অপকর্মটি করেছে সেটা কোনো কথা নয়—চেপে ধরল এক বুড়োকে যে নিজের মতোই একলাটি থাকে। এটাই সহজ পন্থা। তা ছাড়া বুড়োটির কাছে কোনো স্নাইডার বন্দুকও নেই। তায় আবার অন্ধ। বুড়ো ব্যাপারটা খানিকটা আঁচ করতে পেরে ধনুক আর বিস্তর পরিমাণ তীর যোগাড় করে রেখেছিল। স্নাইডার-হাতে তিনজন বেপরোয়া লড়াকু রাতের অন্ধকারে চড়াও হল তার ওপর। সারা রাত ধরে বুড়োর সঙ্গে বীরের মতো লড়াই করল তারা। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ওরা কেউ শব্দ করে বসলেই সেই শব্দ লক্ষ্য করে বুড়ো তীর ছোঁড়ে। সকাল বেলায় যখন বুড়োর শেষ তীরটিও ফুরিয়ে গেছে তখন তিন বীরপুঙ্গব বুড়োর কাছে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসে স্নাইডার চালিয়ে তার মগজ উড়িয়ে দিল।

এদিকে সকাল হয়ে গেছে, আমরা তবু বৃথাই জলপথের ভেতর দিয়ে জাহাজটাকে হন্যে হয়ে টানছি। অবশেষে হতাশ হয়ে নৌকোর পেছন ঘুরিয়ে বেরিয়ে এলাম সমুদ্রের ফাঁকা জায়গায়। ঘুরে বাস্‌কাম্না সম্পূর্ণ এড়িয়ে চললাম আমাদের লক্ষ্যস্থল 'মালু'র দিকে।

মালুতে নোঙর করা হল ভালভাবেই, তবে এর খাড়িতে ঢোকা যেমন সহজ, বের হওয়া তেমনি কঠিন। ডাঙা আর বিশ্রী শৈলপ্রাচীরের মাঝখানেই নোঙর করতে হয়েছে। মালুর একজন মিশনারী মিঃ কলফিল্ড, উপকূল এলাকায় তাঁর তিমিশিকারী নৌকোয় সফর সেরে সবে ফিরেছেন। পাতলা ছিমছাম দেহ, নিজের কাজে প্রচুর

উৎসাহ, ঠাণ্ডামাথার বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। বিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরের এক সত্যিকারের সৈনিক।

মিঃ কলফিল্ড যখন প্রথম মালাইটাতে কাজে নিযুক্ত হয়ে আসেন, ঠিক ছিল ছ'মাস এখানে থাকবেন। কথা ছিল, এই মেয়াদের পরেও যদি তিনি বেঁচেবর্তে থাকেন, তাহলে আগের মতোই কাজ চালিয়ে যাবেন। ছ'বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনও তিনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে ছ'মাসের বেশি বাঁচবেন না বলে তাঁর যে সন্দেহ ছিল, সেটা নেহাৎ অমূলক নয়। কলফিল্ডের আগে তিনজন মিশনারী মালাইটাতে এসেছিলেন। ছ'মাস শেষ হবার আগেই দু'জনের মৃত্যু হয় জ্বরে, তৃতীয়জন ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কোনো রকমে দেশে ফিরে যান।

ক্যাপ্টেন জানসেনের সঙ্গে এলোমেলো কথাবার্তার মাঝখানে ফস্ করে মিঃ কলফিল্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ খুনখারাপির কথা বলাবলি করছেন আপনারা?' ক্যাপ্টেন জানসেন বুঝিয়ে বললেন। মিঃ কলফিল্ড বলে ওঠেন, 'ও হো! আমি সে-খুনটার কথা বলছি না। সে ঘটনা তো এরই মধ্যে পুরনো হয়ে গেছে। বলছি দু'সপ্তাহ আগে যা ঘটেছে তার কথা।'

লাঙ্গা-লাঙ্গায় চার্মিয়ানের 'সলোমন ঘা' হয়েছিল বলে আমি উৎকট উল্লাস প্রকাশ করেছিলাম! আর এখন এই মালুতে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। পরোক্ষভাবে মিঃ কলফিল্ডই এর জন্য দায়ী। উনি একটা মুরগি দিলেন আমাদের, যেটার পেছনে রাইফেল হাতে তাড়া করে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকেছি। ইচ্ছে ওটাকে জবাই করার। সেই কাজ করতে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। হাঁটুর নিচের চামড়া ছড়ে গেল। ফল হল : সেই সলোমন ঘা। আরো তিনটে। এই নিয়ে পাঁচ পাঁচটি ঘা আমার দেহে বিরাজ করছে। এর মধ্যে আবার ক্যাপ্টেন জানসেন ও নাকাতাকে ধরেছে 'গারি গারি' ব্যারাম। 'গারি গারি' মানে 'চুলকোও চুলকোও!' আক্ষরিক তর্জমায়। তা, ওদের দুজনের হাত-পা নিয়ে নানা ভঙ্গির লম্ফঝম্প দেখলে আর ভাষায় তর্জমার প্রয়োজন হয় না।

না, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের স্বাস্থ্যের অবস্থা যতোটা ভাল হতে পারত, তেমনটা মোটেই নয়। এই লেখা আমি এখন লিখছি ইসাবেল দ্বীপে বসে। এখানে স্নার্ককে ধোয়া মোছা পরিষ্কার করা চলছে। আজ সকালে আমার জ্বর ছেড়েছে। এর আগে জ্বরের আক্রমণ থেকে রেহাই মিলেছিল মাত্র একদিন। চার্মিয়ানের জ্বর আসে এককেবারে দু'সপ্তাহের বিরাম দিয়ে। ওয়াডা তো জ্বরে ভুগে-ভুগে বিধ্বস্ত। গতরাত থেকে আবার নিমোনিয়ার সব লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছে তার শরীরে। বিশালদেহী তাহিতিবাসী

হেনরীর সবে জ্বর ছেড়েছে। সে এখন গেল-বছরের কড়া টক বুনো আপেলের মতো ডেকময় গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সে আর তেহেঈ—দু'জনের শরীরই এখন দেখবার মতো, সলোমন ঘায়ের প্রদর্শনী। তা ছাড়াও এক নতুন ধরনের 'গারি-গারি' রোগ ধরেছে তাদের। এটা হয় শাকশব্জীর বিষাক্ততা থেকে। তবে ওরাই শুধু ভুগছে না। কিছুদিন আগে চার্মিয়ান, মার্টিন আর আমি গিয়েছিলাম ছোট্ট একটা দ্বীপে পায়রা শিকার করতে। সেই থেকে টের পাচ্ছি নরকের জ্বালা কাকে বলে! ওই দ্বীপেই আবার মার্টিন একটা হাঙ্গরকে তাড়া করতে গিয়ে প্রবালের ঘষায় পায়ের তলার চামড়া প্রায় ফালাফালা করে ফেলেছিল। সে অবশ্য তাই বলে, তবে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আসলে—উলটো! আসলে হাঙ্গরের তাড়া খেয়েই ওর এই বিপত্তি। ওর সেই প্রবাল-কাটা অঙ্গে দেখা দিয়েছে সলোমন ঘা। শেষবারের জ্বর হবার আগে বঁড়শির সুতোয় আমার আঙুলের গাঁট কেটে গিয়েছিল। ওখানে এখন তিনটি তাজা ঘা। আর নাকাতা! বেচারা তিন সপ্তাহ ধরে একেবারে বসতে পারেনি, সে ক্ষমতাই তার নেই। মাত্র গতকাল পনের মিনিটের জন্য প্রথম একটু বসেছিল সে। খুশি হয়ে এখন বলছে আর মাসখানেকের মধ্যেই তার 'গারি-গারি' সেরে যাবে। প্রবল উদ্যমে চুলকোনোর ফলেই ওর 'গারি-গারি'র জায়গায় এখন সলোমন ঘা ভর্তি। তার ওপর সে আবার জ্বরে কাত—এই নিয়ে সাতবার জ্বর হল তার। ভাবি, আমি যদি রাজা হতাম, তা হলে আমার শত্রুদের চরম শাস্তি দেবার জন্য নির্বাসন দিতাম এই সলোমন দ্বীপপুঞ্জে। আবার পরে ভাবি রাজা হই বা না হই, এমন কাজ করার মতো মনই বোধহয় কখনো আমার হবে না।

একটা ছোট্ট সরু ইয়ট নৌকো, যেটা বন্দরের কাজের জন্যই তৈরি, তার পক্ষে আবাদী মজুর ভর্তি করার কাজ মোটেই সুবিধাজনক নয়। ডেক জুড়ে এই মজুর আর তাদের পরিবারবর্গ। প্রধান কেবিনটিও তাদের পুরো দখলে। রাতে তারা ওখানেই ঘুমোয়। আমাদের নিজেদের ছোট কেবিনে ঢুকতে হলে প্রধান কেবিনটার ভেতর দিয়েই একমাত্র পথ। যাতায়াতের সময় তাদের ভিড় ঠেলে বা ডিঙিয়ে যেতে হয়। এটা বাঞ্ছনীয় কাজও নয়। এদের প্রত্যেকটি লোক মারাত্মক চর্মরোগে আক্রান্ত। কারো আছে দাদ। কারো আছে 'বুকুয়া' নামে এক রোগ। শাকশব্জির কোনো বিশেষ পরজীবী চামড়া আক্রমণ করে খেয়ে ঘা বানায়। এর চুলকোনিও অসহ্য। 'বুকুয়া' হলে এমনভাবে চুলকোতে থাকে যে বাতাসে সূক্ষ্ম শুকনো চামড়ার খোসা ছড়িয়ে পড়ে। তারপর আছে গ্রীষ্মমণ্ডলের ফোস্কা ও অন্যান্য চর্মরোগ। পায়ে সলোমন ঘা নিয়ে যারা জাহাজে উঠেছে, তারা পা পেতে হাঁটতে পারে না। আর

কারো ঘায়ের গর্ত এত বড় যে, একজন মানুষের মুঠো ওর হাড় অবধি ঢুকে যেতে পারে। রক্ত বিষিয়ে যাওয়ার ঘটনা তো আকছার দেখা যায়। ক্যাপ্টেন জানসেন এগুলো নির্বিচারে 'অপারেশন' করেন। তার অস্ত্র হলো চাকু আর পাল সেলাই করবার ছুঁচ। অবস্থা যতই মারাত্মক হোক, কাঁটাছেঁড়ার পর ঘায়ে পুলটিশ তিনি লাগাবেনই। একেকটা ভয়ানক দৃশ্য দেখার পরই ডেকের এক কোণে বসে আমরা নিজেদের ঘাগুলোতে একেবারে ঢেলে করোসিভ সাবলিমেট লাগাই। এ ভাবেই মিনোটায় আমরা খাইদাই, থাকি আর ঘুমোই, ভাগ্যের ভরসায় নিজেদের সঁপে দিয়ে। আর ভান করি যেন কতো ভালোই না আছি আমরা!

এবার মানুষের গড়া আরেকটি দ্বীপ সুয়াভাতে এসে নতুন করে চোট পেল চার্মিয়ান। সুয়াভার সর্বোচ্চ আদিবাসীপ্রধান আমাদের জাহাজে এসেছিলেন। কিন্তু আসার আগে তিনি একজন দূত পাঠিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন জানসেনের কাছে—মহামান্য দ্বীপপ্রধানের রাজকীয় নগ্নতা ঢাকবার জন্য অনেক গজ কাপড় চাই। ইত্যবসরে তিনি ক্যানোতেই বসে অপেক্ষা করছেন। তাঁর রাজকীয় শরীরে যে ময়লা জমেছে তা অন্তত আধ ইঞ্চি পুরু। আর তার নিচের ময়লার স্তরটি কম করেও দশ থেকে কুড়ি বছর ধরে তো জমেছে নিশ্চয়ই। মোড়ল-শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয়বার দূত পাঠালেন। দূত এসে জানালো—সুয়াভার মহান অধিকর্তা (হু বিগ ফেলা মারস্টার বিলং সুয়াভা) স্বেচ্ছায় ক্যাপ্টেন জানসেনও আমার সঙ্গে করমর্দন করতে রাজি আছেন, তবে বেসাতির তামাকের কিছু ভাগ তাঁর চাই। কিন্তু তাই বলে এই তামাকের জন্য তিনি তাঁর অতি-উচ্চ বংশজাত আত্মার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এক সামান্য 'মেয়েছেলে'র সঙ্গে করমর্দন করতে রাজি নন।

বেচারা চার্মিয়ান! সেই মালাইটার অভিজ্ঞতার পর থেকে সে অনেক বদলে গিয়েছিল। তার এখনকার বিনয়-নম্র শিষ্টতা প্রায় শঙ্কাজনক পর্যায়েই চলে যাবার অবস্থা। আমি অবাক হব না—যদি দেখা যায় সভ্য জগতে ফিরে গিয়ে সে রাস্তায় হাঁটছে আমার এক গজ পিছনে-পিছনে, অবনত মস্তকে।

সুয়াভাতে তেমন অঘটন কিছু ঘটল না। শুধু বিচু নামে আমাদের দেশীয় রাঁধুনীটি চম্পট দিয়েছে। মিনোটা ভালো করে নোঙরই ফেলতে পারছে না। এদিকে ঝোড়ো বাতাস বইছে, আর সঙ্গে তেমনি বৃষ্টি। জাহাজের মেট—জ্যাকবসেন আর ওয়াডা জ্বরে শয্যাগত। আমাদের সলোমন ঘাগুলো অতিরিক্ত বেড়ে গেছে। সংখ্যায়ও বেড়েছে। জাহাজের আরশোলাগুলো যেন মহোৎসবে মেতেছে। গভীর রাতেই তাদের উৎসবের সময় এবং তার জন্য বেছে নিয়েছে আমাদের ছোট কেবিনটাকেই।

এক-একটার লম্বাই দু' থেকে তিন ইঞ্চি, সংখ্যায় শ'য়ে শ'য়ে, আমাদের গায়ের ওপর দিয়েই ওদের যাতায়াত। যখনই ওদের মারতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে ওরা শূন্যে উড়তে শুরু করে, মধুপায়ী পাখীর মতো ডানা ঝাপটায়। আমাদের স্নার্কের আরশোলাগুলো থেকেও এরা আকারে বড়। আমাদেরগুলো শিশু মাত্র। বাড়বার সুযোগ পায়নি। স্নার্কে আবার তেঁতুলে বিছেও আছে, বড়ো বড়ো ছ' ইঞ্চি লম্বা। কখনো কখনো ওদের মারা হয়, বিশেষ করে চার্মিয়ানের বাক্স থেকে। দু'বার তেঁতুলে বিছের কামড় খেয়েছি আমি। দু'বারই ঘুমের মধ্যে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে কামড়েছে। কিন্তু বেচারা মার্টিনের ভাগ্য আরও খারাপ। তিন সপ্তাহ রোগশয্যায় শুয়ে থাকার পর প্রথম যেদিন উঠে বসল—বসবি তো বস একেবারে বিছের ওপরই!

পরে আমরা আবার মালু ফিরে গিয়েছি। সাতজন মজুর সংগ্রহ করে আবার যাত্রা শুরু করেছি। খাড়িতে প্রবেশ যতো সহজে হয়েছিল, বেরোনো ততোটা সহজ হল না। দমকা বাতাস বইছে, জঘন্য ডুবোপাহাড়গুলোর দিকেই স্রোতের টানটা প্রখর। আমরা সমুদ্রে এসে পড়বার মুখে বাতাসের বেগ সবদিক থেকেই প্রবল হয়ে উঠল। এ সত্ত্বেও মিনোটা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু পালের দড়ি খাটানোই মুশকিল হল। জাহাজটার দুটো নোঙরই তুলাগিতে হারিয়ে যায়। এখানে তার শেষ নোঙরটা জলে ছাড়া হল। লম্বা শেকল বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যাতে প্রবালের খাঁজে আটকাতে পাবে। জাহাজের তলার খোল জলের নিচে ধাক্কা খেল। মাস্তুল এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে দুলতে লাগল যেন এই বুঝি আমাদের ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়ে! নোঙর ঢিলে রেখে যখন সে সিধে হবার চেষ্টা করছে, তখনই বিশাল এক ঢেউ মিনোটাকে আছড়ে ফেলল ডাঙায়। শেকল দু' টুকরো হয়ে গেল। আমাদের একমাত্র নোঙরটাও চলে গেল জলে। জাহাজ এক চক্কর ঘুরে মুখোমুখি সোজা গিয়ে পড়ল প্রবল ঢেউয়ের মাঝখানে। জাহাজে হুলুস্থুল পড়ে গেল। যেন পাগলাগারদের অবস্থা। খোলের মধ্যে যে-সব রংরুট মজুররা ছিল তারা জংলি মানুষ, সমুদ্রকে এমনিতেই তাদের ভয়। সবাই এবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছুটে এল ডেকের ওপর। ওদের দৌড়োদৌড়িতে জাহাজের মাল্লারা কোনো কাজই ভালোভাবে করতে পারছে না। এরই মধ্যে মাল্লাদের আবার ছুটতে হচ্ছে রাইফেলগুলো তুলে নেবার জন্য। কেননা ওরা জানে মালাইটাতে ডাঙায় নামার মানেটা কী—তখন এক হাতে জাহাজ সামলাতে হবে, আর অন্য হাতে লড়ে ঠেকাতে হবে বুনো আদিবাসীদের। কীভাবে ওরা সামাল দিল জানি না। একেই তো মিনোটা তখন গুঁতো খেয়ে টালমাটাল, বেসামাল। বুনো লোকগুলো এমনই হতভম্ব যে মাস্তুলের দিকে খেয়াল না করে রশারশি আঁকড়ে বসেছে। ঢেউয়ের দাপটে প্রবাল পাহাড়ের দিকে ঝুঁকে পড়া মিনোটাকে

টেনে রাখবার জন্য আমাদের তিমি-শিকারী নৌকোটা আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু কতোটুকুই বা তার শক্তি? ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন জানসেন ও তার জ্বরে-দুর্বল শীর্ণ মেট জাহাজের ঝুঁকি-সামলানো ভারী মালের ঘর থেকে একটা বাতিল-করা নোঙর বের করে ওটাকেই কাজে লাগাতে দড়াদড়ি লাগাবার ব্যবস্থা করছেন। এমন সময় তিমি নৌকো নিয়ে মিঃ কলফিল্ড হাজির হলেন আমাদের সাহায্য করতে। সঙ্গে তাঁর মিশনের কয়েকটি ছেলে।

মিনোটা প্রথম প্রবালের ওপর আছড়ে পড়তে ধারে-কাছে একটি ক্যানোও দেখা যায়নি। কিন্তু এখন যেন ভাগাড়ের সন্ধান পেয়ে শকুন পড়ার মতো চারিদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্যানো দেখা দিতে শুরু করল। জাহাজের মাল্লারা রাইফেল তুলে ওদের আটকে রাখল জাহাজ থেকে অন্তত একশো ফুট দূরে। কাছে এগোবার দুঃসাহস দেখালেই মৃত্যু, নিশ্চিত হুকুম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একশো ফুট দূরে, এই কালো অলক্ষুনে লোকগুলো অপেক্ষা করছে, বৈঠার আঘাতে ক্যানোগুলোকে সামাল দিচ্ছে বিপজ্জনক ঢেউয়ের কিনারায় বসে। ইতিমধ্যে পাড়ের পাহাড়গুলো থেকে দলে দলে নামছে জংলী মানুষেরা, সঙ্গে বল্লম, তীর-ধনুক, স্নাইডার, মুগুর। পাড়টা ওদের ভিড়ে ভরে গেল। মুশকিলের ব্যাপার হল, জাহাজেই তো রয়ে গেছে ওই বুনোদেরই দল থেকে সংগ্রহ করা অন্তত দশজন মজুর। তারা লুব্ধ আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন জাহাজের সব মালপত্র লুঠ করতে পারবে। বিশেষ করে আমাদের তামাক আর বেসাতির জিনিসগুলো।

মিনোটা জাহাজটি খুবই মজবুত করে বানানো হয়েছিল বটে। অন্তত ডুবো জাহাজের ধাক্কা থেকে বাঁচাবার মতো করেই এর খোল তৈরি। জাহাজটার সহ্যক্ষমতার আন্দাজ পাওয়া যায় যখন দেখি গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তার দুটো নোঙর-শেকল আর আটটা লোহার কাছি ডুবে গেছে। জাহাজের কয়েকজন মাল্লা তলিয়ে-যাওয়া নোঙর দুটো উদ্ধারের জন্য অনবরত ডুব দিচ্ছে সমুদ্রে। বাকি মাল্লারা নতুন নোঙর-কাছি তৈরি করছে। শেকলগুলো টুকরো হবার সময় জায়গায়-জায়গায় লোহার তারে বাঁধা ছিল। তা সত্ত্বেও মিনোটা ছিল অটুট। ডাঙা থেকে গাছের গুঁড়ি এনে জাহাজের খোলের নিচে বসানো হয়েছিল পানিতরাস আর পাটাতন বাঁচাবার জন্য। কিন্তু অচিরেই গাছের গুঁড়িগুলো ক্ষয় হয়ে ফালাফালা হয়। দড়িগুলোও ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার। এতেও মিনোটা অটুট রইল হাজার আঘাতের মধ্যেও। আমরা অবশ্য 'আইভান হো' জাহাজটার মতো দুর্ভাগ্যগ্রস্ত নই। বড়ো স্কুনারটা শ্রমিকসংগ্রহের কাজ করত। কয়েকমাস আগে মালাইটার উপকূলে আছড়ে পড়বার পর আদিবাসীরা অবিলম্বে ঘিরে ফেলেছিল 'আইভান হো'কে। ক্যাপ্টেন ও মাল্লারা তিমিশিকারী নৌকো করে পালিয়ে

যেতে পেরেছিল বটে কিন্তু নোনাজলের মানুষ ও জংলীরা মিলে জাহাজটাকে একেবারেই সাফ করে দেয়—যা কিছু সরানোর মতো সবই নিয়ে যায় লুঠ করে।

একের পর এক ঝড়ের দাপট, সাঁ-সাঁ বাতাস, আর দৃষ্টি চলে না এমন বৃষ্টিধারা মিনোটার যন্ত্রণা বাড়িয়েই চলেছে। ওদিকে সমুদ্রে উঠছে বড়-বড় ঢেউ। মাত্র পাঁচ মাইল দূরেই ইউজিনী জাহাজ নোঙর করে আছে। অথচ তাদের অবস্থান এমন জায়গায় যে আমাদের বিপদের কথা তারা জানতেই পারেনি। ক্যাপ্টেন জানসেনের পরামর্শমতো আমি ক্যাপ্টেন কেলারকে একটা চিঠি লিখলাম যাতে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য বাড়তি নোঙর ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে চলে আসেন। কিন্তু সেই চিঠি নিয়ে যেতে কোনো ক্যানোই রাজি হল না। আমি আধ পেটি তামাক পুরস্কার দেব বলে লোভ দেখালাম, তবু আদিবাসীরা শুধু দাঁত বের করে হাসল, আর সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে গলুই ঘুরিয়ে ক্যানোতেই বসে রইল। আধ পেটি তামাকের মূল্য তিন পাউণ্ড। মাত্র দু'ঘণ্টার পরিশ্রমে একজন আদিবাসী এই টাকা রোজগার করতে পারছে, অথচ মজুর হয়ে আবাদে কাজ করলে ছ'মাস লাগত এত টাকা রোজগার করতে।

কোনো রকমে একটি ক্যানোতে চড়ে আমি মিঃ কলফিল্ডের কাছে গেলাম। আমার ধারণা, কলফিল্ডের নিশ্চয় প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এ-দেশীয়দের ওপর। উনি সব ক্যানোওয়ালাকে কাছে ডাকলেন। এক কুড়ি ক্যানো এসে ঘিরে দাঁড়াল আমাদের। আধ পেটি তামাক পুরস্কারের ঘোষণা জানিয়ে দেওয়ার পরও কিন্তু সবাই চুপ করেই রইল।

মিশনারী এবার দেশী ভাঙা-ইংরেজিতে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোরা কী ভাবছিস আমি বুঝি। তোরা ভাবছিস স্কুনারে এন্তার তামাকের বাক্স আছে, আর তোরাই সেগুলো দখল করবি। স্কুনারে রাইফেলও আছে এন্তার। ইউ নো গেট টোব্যাকো, ইউ গেট বুলেটস্।'

অবশেষে ছোট একটি ক্যানোর মালিক নিজেই চিঠিটা নিয়ে যাত্রা করল। নতুন করে সহায়তা আসার অপেক্ষায় তাই বলে জাহাজের মাল্লারা হাত গুটিয়ে বসে রইল না। মিনোটার জলের ট্যাঙ্ক খালি করা হল। পালদণ্ড, পাল আর ভারসাম্য রাখার ভারি জিনিসগুলো পাড়ে টেনে তোলা হচ্ছে। মিনোটা যখন এপাশে-ওপাশে কাত হয়ে জাহাজের তলার চওড়া-পাটি ঘোরাচ্ছে, তখন সে এক মজাদার দৃশ্য! ভারি জিনিস-পত্র এক রেলিং থেকে আরেক রেলিংএর দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, পা বাঁচিয়ে প্রাণভয়ে লাফঝাঁপ করছে মানুষগুলো। ডেকের দড়িদড়ায় সমস্ত কিছু জট পাকিয়ে গেছে। জাহাজের খোলেও সব কিছু লণ্ডভণ্ড। জাহাজের ওজনের ঝুঁকি সামলাবার লোহা-

লক্কড় বের করতে গিয়ে কেবিনের পাটাতন খুলে ফেলা হয়েছিল, এখন জাহাজের তলার যতো নোংরা দুর্গন্ধ জল উঠে চারদিকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এক বস্তা লেবু, ময়দা আর জলে মিশে কাই হয়ে আধসেদ্ধ পিঠের মতো ছিটকে পড়ছে একেক দিকে। আমাদের ভেতরের কেবিনে নাকাতা ছিল রাইফেল আর গুলিবারুদের পাহারায়।

আমাদের পত্রবাহক চলে যাবার তিন ঘণ্টা পর ঝড়ের ঝাপটা আর প্রবল বৃষ্টির ভেতর দিয়ে ক্যানভাসে-ঢাকা একটা তিমি-শিকারী নৌকোকে আসতে দেখা গেল। ক্যাপ্টেন কেলার বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে আসছেন কোমরে রিভলবার গুঁজে, নৌকোয় স্তূপীকৃত নোঙর আর লোহার তার। খালাসিরা পুরোপুরি সশস্ত্র। বাতাসের বেগে নৌকো ছুটে এল। এই সেই অপরিহার্য সাদা মানুষ—সাদা মানুষকেই উদ্ধার করতে আসছে বিপদ থেকে।

শকুনের মতো সার দিয়ে যে ক্যানোগুলো অপেক্ষা করছিল, তারা এবার দল ভেঙে চটপট অদৃশ্য হয়ে গেল, ঠিক যেমনি চটপট করে তারা ঘিরেছিল আমাদের। ভাগাড়ে মড়া পড়ল না তা হলে! এবার আমাদের তিমিশিকারী নৌকোর সংখ্যা দাঁড়াল তিনটি। জাহাজ আর ডাঙার মধ্যে একটানা ছোটাছুটি করছে দুটো নৌকো। তৃতীয়টি নতুন নোঙর জলে ছাড়া, লোহার মোটা তার লাগানো, আর হারানো নোঙর উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত। বিকেলের দিকে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আমাদের জাহাজের কয়েক জন মাল্লা আর দশজন মজুরকে নিরস্ত্র করা হল, কারণ এরা সবাই স্থানীয় মানুষ। নিরস্ত্র করার ফলে দু'হাতেই তারা নির্ঝঞ্ঝাটে জাহাজের কাজ করতে পারবে। রাইফেলগুলোর ভার মিঃ কলফিল্ডের মিশনের ছেলেদের হাতে দেওয়া হল, নিচে ভাঙাচোরা কেবিনে বসে মিশনারী সাহেব আর তার ধর্মান্তরিত ছেলেরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল মিনোটার সুরক্ষার জন্য।

সে এক দেখার মতো দৃশ্য! ঈশ্বরের 'নিরস্ত্র' সেবক গ্লানিহীন নির্মল বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করছেন—আর তাঁর বন্য অনুগামীরা রাইফেলের ওপর ঝুঁকে বিড়বিড় করে 'আমেন' ধ্বনি উচ্চারণ করছে। কেবিনের দেয়াল এদিকে ঘোরপাক খাচ্ছে, কারণ প্রতিটি ঢেউয়ের তালে জাহাজ উঁচুতে উঠেই আবার আছড়ে পড়ছে প্রবালে। ওপরের ডেক থেকেও ভেসে আসছে চিৎকার—মাল্লাদের প্রচণ্ড মেহনত আর খাটা-খাটুনির আওয়াজ, যা একদিক থেকে দেখলে প্রার্থনারই ভাষা, যাতে প্রকাশ পাচ্ছে দৃঢ় সংকল্প আর দু'হাতের শক্তি।

সে-রাত্রিতে মিঃ কলফিল্ড একটা সংবাদ দিয়ে আমাদের সতর্ক করলেন। আমাদের যোগাড়-করা একজন মজুরের মাথাটি পেলে জংলীরা তিনশো 'কড়ি' আর চল্লিশটা

শুয়োর দেবে বলে ঘোষণা করেছে। জাহাজ দখল করতে এসে ব্যর্থ হবার ফলে হতাশ জংলীরা এখন এই লোকটির মাথা নেবে বলে স্থির করেছে। একবার খুনোখুনি শুরু হলে কোথায় গিয়ে তার শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। তাই ক্যাপ্টেন জানসেন একটা তিমিশিকারী নৌকো অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে দাঁড় বেয়ে সিধে ডাঙার কাছে গেলেন। উগি নামে তাঁর জাহাজের এক মাল্লা দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের তরফ থেকে বক্তব্য জানাল রীতিমতো জোরালো গলাবাজি করে। উগি ছিল আগে থেকেই উত্তেজিত। ক্যাপ্টেনের হুঁশিয়ারি ছিল—রাতে জাহাজের কাছে কোনো ক্যানোকে দেখলে তা বুলেটে ঝাঁজরা করে দেওয়া হবে। উগি তার ওপর রং চড়িয়ে যুদ্ধই ঘোষণা করে বসল। ওর বক্তব্যের সারমর্ম দাঁড়াল এই রকম: 'আমার ক্যাপ্টেনকে যে মারবে আমি তার রক্তপান করব, সেই সঙ্গে আমিও মরব।'

জংলী মানুষেরা চুপিচুপি ফিরে গেল জঙ্গলে। কিন্তু যাবার আগে মিশনের একটা বসতিহীন বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েই তুষ্ট হল তারা। পরদিন ইউজিনী জাহাজ এগিয়ে এসে নোঙর ফেলল এখানেই। তিন দিন দু' রাত ধরে মিনোটা প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে চলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জাহাজ রয়েছে অটুট। শেষ পর্যন্ত জাহাজের খোল ডুবো পাহাড়ের খাঁজ থেকে টেনে বের করা হল। জাহাজ নোঙর করল নিস্তরঙ্গ জলে। এইখানেই আমরা মিনোটা জাহাজের সবাইকে জানাই বিদায় সম্ভাষণ এবং আলাদা হয়ে যাই। আমরা, স্নার্কের যাত্রীরা, আরোহী হলাম ইউজিনীর। মিনোটা এখন যাত্রা করছে ফ্লোরিডা দ্বীপের উদ্দেশে।

পাদটীকা: আমাদের নানা রকম দুঃখযন্ত্রণার বিবরণ শুনে যেন কেউ ধারণা না করেন যে আমরা স্নার্কের যাত্রীরা, নেহাতই একদল অকর্মণ্য দুর্বল মানুষ। ইউজিনী জাহাজের লগ বই থেকে যেসব ঘটনার ফিরিস্তি আমি উদ্ধার করেছি, তাই থেকেই বোঝা যায় সলোমন দ্বীপপুঞ্জে সফর করা কী ভয়ংকর ব্যাপার। ১৯০৮ সালের ১২ই মার্চ থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত লগ-বইয়ে লিপিবদ্ধ প্রত্যেকটি ঘটনা একথাই প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন রকম ফরমায়েশি কাজের মধ্যে প্রতিদিন এই জাহাজের কোনো-না-কোনো নাবিক, খালাসী মাল্লা বা ক্যাপ্টেন স্বয়ং, শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন—তা সে জ্বরেই হোক আমাশাতেই হোক। প্রচণ্ড ঝড় বা ডুবো পাহাড়ের উপদ্রবের মধ্যেও এমন একটি দিন যায়নি যেদিন জাহাজের প্রত্যেকটি মানুষ সুস্থ সবল হয়ে এসব আপদের সম্মুখীন হতে পেরেছে।

ষোলো

‘জগাখিচুড়ি’ ইংরেজি

সাদা-চামড়ার একদল ব্যবসায়ী, একটা সুবিস্তীর্ণ এলাকা, আর বেশ কিছু আদিম আঞ্চলিক কথ্য ভাষা—এমন কোনো পরিবেশ পেলেই ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ নতুন, অবৈজ্ঞানিক অথচ পুরোদস্তুর প্রয়োজনীয় একটি ব্যবহারিক ভাষা তৈরি করে নেবে।

এভাবেই ব্যবসায়ীরা বৃটিশ কলম্বিয়া, আলাস্কা, আর উত্তর-পশ্চিম উপনিবেশে ব্যবহার্য ‘চিন্‌ক’ ভাষার প্রচলন করে। আফ্রিকার ‘ক্রু’ মানুষদের (লাইবেরিয়া এলাকার) ভাষাও এইভাবে তৈরি হয়। আর গড়ে ওঠে দূর-প্রাচ্যে চালু ‘পিজিয়ন’ ইংরেজিও। একই পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত হয় দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তের কথ্য ভাষা, যার নাম ‘বীচ ডে-মার’ (উচ্চারণ ‘বেশ দ’মার’) ইংরেজি।

‘বেশ দ’মার’ ইংরেজিকে ভুল করে প্রায়ই ‘পিজিয়ন (পিজিন) ইংলিশ’ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মোটেই তা নয়। তার একটা পরিচিত নমুনা চীনাদের ‘পীসী’ (টুকরো) কথাটা—এর কোনো স্থানই এ ভাষায় নেই। একবার এক সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপ্টেনের দরকার হয়ে পড়ে কেষ্ট-বিষ্টু একজন কালো মানুষকে নিচে ডেকে আনার জন্য। লোকটা ছিল জাহাজের ওপর ডেকে। অতএব ক্যাপ্টেন তার চীনা পাচককে আদেশ করল—‘হেই বয়, ইউ গো টপ্‌-সাইড, ক্যাচী ওয়ান পীসী কিং।’ (এই ছোকরা, ওপরে গিয়ে একটা রাজাকে ধরে নিয়ে আয়!) কিন্তু পাচকটি চীনা না হয়ে যদি নিউ-হেব্রাইডস্‌ কিংবা সলোমন-দ্বীপপুঞ্জের লোক হত, তবে আদেশটি হত এই রকম, ‘হেই ইউ ফেলা বয়, গো লুক্‌’ম্‌ আই বিলং ইউ অ্যালং ডেক, ব্রিং’ম্‌ মি ফেলা ওয়ান বিগ্‌ ফেলা মারস্টার বিলং ব্ল্যাক ম্যান।’ (এই ছোকরা, চোখ দিয়ে দেখে ডেক থেকে একটা হোমরাচোমরা কালো মানুষকে ধরে আন্‌।)

প্রথম দিকের ভূপর্যটকদের আবিষ্কারের পর যে শ্বেতকায় মানুষরা মেলানেশিয়ায় অভিযান চালিয়েছিল তারাই এই ‘বেশ্‌ দ’মার’ ইংরেজির জনক! এরা মৎস্য ব্যবসায়ী, চন্দন কাঠের কারবারি, মুক্তো সংগ্রাহক আর মজুর ভাড়া করার ঠিকাদার। যেমন ধরুন এই সলোমন দ্বীপপুঞ্জেই কয়েক কুড়ি ভাষা এবং উপভাষার চল আছে। একটা দ্বীপে ব্যবসায়ীরা হয়তো আদিবাসীদের পুরো ভাষাই শিখে নিল, কিন্তু পরের দ্বীপে গিয়ে বেচারিরা শুনবে সম্পূর্ণ অন্য রকমের ভাষা। তাই একটি সর্বজনগ্রাহ্য ভাষার প্রয়োজন হল—এমন এক সরল ভাষা যা একটি শিশুও শিখে নিতে পারে।

তার শব্দসম্ভারও সীমাবদ্ধ থাকবে সেই আদিম বুনোদের স্বল্প জ্ঞানবুদ্ধির মধ্যেই, যাদের সঙ্গে এই ভাষার ব্যবহার। ব্যবসায়ীরা এগুলো ভেবেচিন্তে স্থির করেনি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির ফসল হিসেবেই জন্ম নিল 'বেশ্ দ'মার' ইংরেজি। নিছক আকস্মিকতার মধ্যে জন্ম নিলেও এই ভাষা প্রত্যয়ের সঙ্গেই ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—যে প্রয়োজনের তাগিদে বেশ্ দ'মার ইংরেজির উদ্ভব, সেই একই প্রয়োজন দেখিয়ে 'এস্পেরাণ্টো' (আন্তর্জাতিক ভাষা) উৎসাহীরা নিজেদের স্বপক্ষে চমৎকার যুক্তি দেখাতে পারেন।

কোনো কথ্য ভাষায় সীমিত শব্দসম্ভার থাকলে প্রত্যেকটি শব্দেরই ব্যবহারে পুনরুক্তি দোষ ঘটবে। বেশ্ দ'মার-এ 'ফেলা' (fella) যে কোনো বস্তু বা মানুষকেই বোঝায় চৈনিক পীসীর মতো। বরং আরো কিছু বেশিই,—যে কোনো সম্ভাব্য প্রসঙ্গেই এ শব্দের অনবরত ব্যবহার। আরেকটা অতি-ব্যবহৃত শব্দ হল বিলং (belong)। কিন্তু একক অর্থে কোনো শব্দই খাটে না। প্রত্যেকটি শব্দই সম্বন্ধবদ্ধ। যে জিনিসটির দরকার, তা জ্ঞাপন করা হবে তার সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয় দ্বারা। একটি আদিম শব্দ দিয়ে আদিম অভিব্যক্তির প্রকাশ হয়ে থাকে। যেমন 'অঝোরে বৃষ্টি (rain) পড়ছে'—এই কথার প্রকাশ হবে এইভাবে—রেন্ হি স্টপ (rain he stop)। সান হি কাম আপ (sun he come up) বাক্যটির অবশ্য ব্যাখ্যার দরকার পড়বে না। কিন্তু এই একই বাক্যাংশটি কোনো মানসিক প্রয়াস না করেই দশ হাজার ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। যেমন, একজন আদিবাসী যদি আপনাকে জানাতে চায় যে জলে মাছ রয়েছে, তবে স্রেফ বলবে, 'ফিশ্ হি স্টপ' (fish he stop)। ইসাবেল দ্বীপে মাল কেনাবেচার সময় এইসব বাক্য ব্যবহারে আমি চমৎকৃত হই। একবার দু'তিন জোড়া বড়ো ক্ল্যাম-মোলাস্কের খোল চেয়েছিলাম, কিন্তু ভেতরের মাংস বাদ দিয়ে। আবার ছোট-ছোট ক্ল্যামও শাঁসসমেত চেয়েছিলাম 'শৌন্ডের' (পূর্ব কানাডীয়) মাছের স্টু বানাবার জন্য। আদিবাসীদের যে নির্দেশ দিলাম তা মোদ্দা কথায় দাঁড়াল এই: 'ইউ ফেলা ব্রিং মি ফেলা বিগ ফেলা ক্ল্যাম—কাই কাই হি নো স্টপ, হি ওয়াক অ্যাবাউট। ইউ ফেলা ব্রিং মি ফেলা স্মল ফেলা ক্ল্যাম—কাই কাই হি স্টপ (you fella bring me fella big fella clam—kaikai he no stop, he walk about. You fella bring me fella small fella clam—kaikai he stop)।'

'কাই কাই' শব্দটি পলিনেশিয়াতে চলে অনেক অর্থে—খাদ্য, মাংস, আহার, খাওয়া ক্রিয়া। কিন্তু বলা মুশকিল 'কাই কাই' শব্দটি মেলানেশিয়াতে কারা আমদানি করে প্রথম—চন্দনকাঠের ব্যবসায়ীরা, না পশ্চিমে ভেসে আসা পলিনেশীয়রা। 'ওয়াক

অ্যাবাউট (walk about) আরেকটি বিচিত্র বাক্যাংশ। একজন সলোমনীয় নাবিককে কেউ যখন হুকুম দেবে বড় পালদণ্ডটিতে রশি বাঁধবার জন্য, তার বাচনভঙ্গি হবে : 'ঘ্যাট ফেলা বুম হি ওয়াক অ্যাবাউট টু মাচ (That fella boom he walk about too much)।' অর্থাৎ পালদণ্ডটা বড় বেশি নড়ছে। সেই নাবিক যদি ডাঙায় নামতে চায় সে বলবে ডাঙায় 'ওয়াক অ্যাবাউট' করতে চায়। অথবা সেই নাবিকটি যদি সমুদ্রপীড়ায় কাতর হয়, তবে সে বক্তব্য প্রকাশ করবে : 'বেলী বিলং মি ওয়াক অ্যাবাউট টু মাচ'। মানে, তার পেট বড় অস্থির হচ্ছে।

অবশ্য, 'টু মাচ' বলতে কোনো কিছুর অতিরিক্ত বাহুল্য বোঝায় না। 'বেশি' বোঝাতে নেহাতই একটি সরল পরিমাণবোধক কথা। একজন আদিবাসীর কাছে কোনো গ্রামের দূরত্ব জানতে চাইলে সে উত্তর দেবে : 'লং ওয়ে টু মাচ'। কিন্তু এই বাক্যদ্বারা এমন কিছু বোঝাবে না যে গ্রামটি অত্যন্ত দূরে, হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। মানে, দূরত্বটা একটু বেশি, কিন্তু হেঁটে যাওয়া সম্ভব।

এমনিভাবে 'গ্যামন' (Gammon) মানে 'মিথ্যা বলা,' 'বাড়িয়ে বলা,' 'মশ্‌করা করা'। 'মেরী' (Mary) হল স্ত্রীলোক—যে কোনো স্ত্রীলোকই মেরী। প্রথম যুগে কোনো শ্বেতকায় অভিযাত্রী হয়তো কোনো দেশীয় মেয়েকে খেয়ালবশে 'মেরী' বলেছিল, সেই থেকে মেয়েমাত্রই মেরী। এমনিভাবে আরো শব্দ এসেছে 'বেশ দ'মার' ইংরেজিতে।

শ্বেতকায় মানুষরা সবাই ছিল নাবিক তাই তাদের 'ক্যাপসাইজ' (capsize) —উল্টে দেওয়া, সিং আউট (sing out) শব্দগুলো ঢুকে পড়ে এই ভাষার মধ্যে। মেলানেশীয় কোনো পাচককে যদি বাসনের জল ফেলতে বলা হয় তবে তাকে 'ক্যাপ-সাইজ' করতে বলা হবে। একই ভাবে, চিৎকার করে বলাকে 'সিং আউট' বলা হয়, আবার শুধু কথা বলাকেও এই শব্দে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু 'সিং সিং' (sing sing) মানে হল 'গান'। (Savvee) 'স্যাভভি' অথবা 'ক্যাচী' (catchee)—এই শব্দ দুটিই একমাত্র 'পিজিন' ইংরেজি থেকে নেওয়া হয়েছে। 'পিকানিনি' (pickaninny) বলতে এমনিতে বোঝায় কালো বাচ্চাকাচ্চাদের, কিন্তু এরও একেক রকমের প্রয়োগ ভারি মজাদার। যেমন, একবার একজন স্থানীয় লোকের কাছ থেকে একটা মোরগ কিনে নেবার পর সে আমাকে জিজ্ঞেস করল : 'পিকানিনি স্টপ। অ্যালং হিম ফেলা।'—আমার তা চাই কি-না। ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগছিল। সে কতকগুলো ডিম দেখাবার পর বুঝলাম তার বক্তব্য। পিকানিনি বলতে ডিমগুলোকেই বুঝিয়েছে।

'বুলামাকাউ' (Bullamacow) বলে একটা শব্দ রয়েছে যার মানে 'টিনে বন্ধ গোমাংস'। ইংরেজি থেকে শব্দটির অপভ্রংশ ঘটিয়েছিল সামোয়াবাসীরা। ওদের

কাছ থেকে ব্যবসায়ীরা শব্দটি নিয়ে যায় মেলানেশীয়দের কাছে। ক্যাপ্টেন কুক ও প্রথম যুগের কিছু নৌ-অভিযাত্রী শস্যবীজ, উদ্ভিদ এবং গৃহপালিত পশু এনে নিয়মিত বিলোতেন আদিম অধিবাসীদের মধ্যে। এই রকমই একজন নৌ-অভিযাত্রী সামোয়াতে এনে হাজির করেছিলেন একটি গরু ও একটি ষাঁড়। সামোয়াবাসীদের বললেন "This is a Bull and a cow"। সেদিন থেকে শব্দ দুটি জোড়া লেগে 'বুলামাকাও' শব্দের প্রচলন হল। আজ অবধি এই শব্দটিই গরুর মাংস বোঝায়, তা সে খুরওয়ালা আস্ত গরুই হোক, কি টিনে বন্ধ করা গরুই হোক!

সলোমন দ্বীপবাসীরা ফেন্স্‌ 'fence' বলতে পারে না, ওদের বেশ্‌ দ'মারে সেটাই হয়ে যায় 'ফেনিস' 'fennis'। স্টোর 'store' হল 'সিট্টো'র 'sittore' এবং বক্স 'box'কে বলা হয় বকিস্‌ 'bokkis'। যে-বাক্সের ডালা খুলতে গেলে ঘণ্টাধ্বনি হয় এহেন বিশেষ ধরনের বাক্স হল—'বকিস্‌ বিলং বেল্‌।'

'হোয়াট নেম' (what name)-এর অনেক অর্থ। কিন্তু কোনো মতেই 'নাম' অর্থে নয়। বেশ্‌ দ'মারে এটা প্রকাণ্ড প্রশ্নবোধক বাক্যাংশ! 'কী কাজে এখানে এসেছ?' 'এই ধরনের অভদ্র ব্যবহারের অর্থ কী?' 'কী চাই তোমার?' 'কৈফিয়ত চাই'—ইত্যাকার অনেক বক্তব্য এদ্বারা প্রকাশ করা যায়। রাত-দুপুরে স্থানীয় কোনো লোককে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙালে সে কৈফিয়ত চাইবে: "হোয়াট নেম ইউ সিং আউট অ্যালং মি?"

সতেরো

একজন শখের ডাক্তার

স্নার্কে চড়ে যেদিন আমরা সানফ্রান্সিসকো থেকে যাত্রা করেছিলাম—সেদিন পর্যন্ত আমার রোগ-পীড়া সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিল না। তাই শুরুতেই বলে রাখি, যারা ক্রান্তীয় অঞ্চলের পাণ্ডববর্জিত জায়গাগুলোয় যাবার কথা চিন্তা করেন তাঁদের জন্য আমার কিছু উপদেশ দেবার আছে।

প্রথমেই একজন প্রথমশ্রেণীর ওষুধবিক্রেতার কাছে যাবেন যাঁদের বেতন-তালিকায় রয়েছেন বিশেষজ্ঞরা—যাঁরা সবকিছুই জানেন। এরকম একজনের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করবেন। মন দিয়ে শুনবেন তিনি কী বলেন। তাঁর সুপারিশ মতো একটা তালিকা প্রস্তুত করবেন। তারপর মোট মূল্য যা হবে সেইমতো একটা চেক লিখে

দিয়ে তালিকাটা ছিঁড়ে ফেলবেন।

আমারও তাই করা উচিত ছিল। এখন আমি জেনে গিয়েছি, বরং যদি একটা 'রেডিমেড' ওষুধের বাক্স কিনে নিতাম সেটা হত আরো বুদ্ধিমানের কাজ। এসব ওষুধ এত সরল যে ভুলভ্রান্তির ভয় নেই, নিজে থেকেই কাজ করে। এই বাক্সগুলো অবশ্য চতুর্থ শ্রেণীর জাহাজকর্তারা বেশি কদর করে। এই সব রেডিমেড ওষুধের বাক্সে প্রত্যেকটা বোতলে আলাদা নম্বর দেওয়া থাকে। বাক্সের ডালার ভেতর দিকে একটা নির্দেশিকায় লেখা থাকে কোন্ বোতলের কী ব্যবহার, যেমন : ১নং বোতলে দাঁত ব্যথা, ২নং বোতলে গুটি-বসন্ত, ৩নং বোতলে পেটের ব্যথা, ৪নং-এ কলেরা, ৫নং-এ গেঁটেবাত, ইত্যাদি—মানুষের হরেকরকম ব্যাধির হরেকরকম ওষুধ।

একজন শ্রদ্ধেয় জাহাজের ক্যাপ্টেনের কথা বলি। তিনি ৩ নম্বর বোতলের ওষুধ ফুরিয়ে গেলে ১নং ও ২নং ওষুধের বোতল থেকে এক ডোজ করে মিশিয়ে নিয়ে ৩নং করেন। অথবা ৭নং বোতল যদি একেবারে শূন্য হয়ে যায় তবে তাঁর অধীনস্থ মাল্লা-দের খাওয়াবেন ৪ ও ৩ নম্বরের বোতল (৩নংও খালি হয়ে গেলে ৫ ও ২ নম্বর) থেকে মেশানো ওষুধ। আমিও হয়তো সে-কায়দাই নিতে পারতাম।

এতদিন পর্যন্ত করোসিভ সাবলিমেট ছাড়া আমার বাক্সের অন্য ওষুধগুলো কোনো কাজেই লাগেনি। অপারেশনের কাজে জীবাণু নিরোধক হিসেবে এটা ব্যবহার করার কথা, কিন্তু সে কাজে এখন অবধি হাত লাগাইনি। বেকার জিনিসটা আমার ওষুধের বাক্সের বড় অংশ দখল করে রয়েছে, অথচ সে-জায়গা আমি অন্য কাজে লাগাতে পারতাম।

অবশ্য আমার অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রপাতির কথা ভিন্ন। এখনো কোনো গুরুতর প্রয়োজন হয়নি এগুলোর, তবু জায়গা জুড়ে আছে বলে আমি দুঃখিতও নই। ওগুলো আছে বলে আমি স্বস্তি অনুভব করি। যন্ত্রপাতিগুলো প্রায় জীবনবীমার মতো। জীবনবীমার চেয়ে বরং ভালই, কারণ এতে 'কিছু পাবার' জন্য মরতে হয় না। অবশ্য এগুলোর ব্যবহার আমি জানি না। অস্ত্রচিকিৎসার জ্ঞানও আমার নেই। আমার অভিজ্ঞতার কথা জেনে আবার না এক ডজন শাঁসালো হাতুড়ে ডাক্তারের জন্ম হয়। কিন্তু এই সবের প্রয়োজন আসতেই বা কতোক্ষণ? শয়তান তো ওৎ পেতেই থাকতে পারে অতর্কিতে আঘাত হানার জন্য—যখন আমরা রয়েছি ডাঙা থেকে হাজার মাইল দূরে, সব থেকে কাছের বন্দর থেকেও কুড়িদিনের পথ এক সমুদ্রের মাঝখানে।

দাঁতের চিকিৎসার ব্যাপারেও আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কিন্তু আমার এক বন্ধু সাঁড়াশি আর ওই জাতীয় সব অস্ত্র দিয়ে আমাকে রীতিমতো সাজিয়ে দেয়। হনলুলুতে আমি

দাঁত সম্পর্কে একটা বই যোগাড় করেছিলাম। ওখানে আমি একটা মানুষের মাথার খুলিও যোগাড় করি। সেই খুলির দাঁতগুলো চটপট বিনা কষ্টে তুলে ফেলি আর এই ভাবে পুরো যোগাড়যন্ত্র করে আমি যে-কোনো লোকের যে-কোনো দাঁত তুলতে প্রস্তুত হলাম—যদিও সে ব্যাপারে খুব উদ্গ্রীব হইনি।

মার্কোয়েসাস দ্বীপপুঞ্জের নুকু হিভাতেই আমার প্রথম হাতে-খড়ি হল ছোটখাটো এক বৃদ্ধ চীনার ওপর দিয়ে। যদিও তখন আমি পাকাপোক্ত ডাক্তার বলে ভান করছি, আমার কিন্তু শুরু হয়ে গেল কম্পজ্বর, সেইসঙ্গে হৃৎকম্প আর হাত কাঁপা। বুড়ো চীনাকে কি বোকা বানাব, সে নিজেই আমার মতো ভয়ে কাঁপছে। ভয় পেয়ে লোকটাই না পালিয়ে যায়, সেই ভেবে আমারই ভয় উপে যায়। তবে হ্যাঁ সেরকম চেষ্টা করলে আমি তাকে ল্যাং মেরে তার ঘাড়ে চেপে বসতাম, যতোক্ষণ না তার জ্ঞানগম্যি ফেরে।

চীনা রুগীর দাঁতটি আমার চাই। আর মার্টিনের ইচ্ছা—আমার কীর্তিকলাপের একটি ফটো সে তুলে রাখে। চার্মিয়ানও তার নিজের ক্যামেরা বের করল। এ সময়টা আমরা স্টীভেনসনের ক্লাব হাউসে থাকতাম। বারান্দাটায় আলো বড় কম, ছবি তোলা যাবে না। এক হাতে একটা চেয়ার, অন্য হাতে দাঁত-তোলা নানা আকারের সাঁড়াশি নিয়ে আমি বাগানে এলাম। আমার হাঁটু দুটো বিশ্রীভাবে কাঁপছিল তখন। পিছন পিছন এল বেচারা বুড়ো চীনাম্যান, সেও কাঁপছে। আমাদের পেছনে চার্মিয়ান ও মার্টিন কোডাক ক্যামেরা নিয়ে তৈরি। নাসপাতি গাছের ফাঁক দিয়ে নারকেল গাছের সারি পার হয়ে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম যেটা মার্টিনের ছবি তোলার চোখে বেশ পছন্দসই। চীনাম্যানটির দাঁতের দিকে নজর করে আবিষ্কার করলাম সেই পাঁচ মাস আগে মাথার খুলির কোন্ কোন্ দাঁত কেমনভাবে তুলেছি তার কিছুই আর মনে পড়ছে না। সে দাঁতের কি একটা শির ছিল? না দুটো বা তিনটে? চীনা রুগীর দাঁতটি আগে থেকেই ভাঙা। যে-নড়বড়ে টুকরোটা নজরে পড়ছে ওটি পাকড়াতে হলে মাড়ির গভীরে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে আমার জানা উচিত দাঁতটির ক'টি শির আছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে দন্ত-বিজ্ঞানের বইটা নিয়ে এলাম। বেচারা খুড়োকে বেমালুম তার দেশের অপরাধীগুলোর মতোই দেখাচ্ছে—তেমনি হাঁটু গেড়ে অপেক্ষা করছে কখন তলোয়ারের কোপে তার মুণ্ডু আলাদা হয়! যেমন ফটোগুলোতে দেখতে পাই।

মার্টিনকে সতর্ক করে দিই: 'লোকটা যেন পালিয়ে না যায়। ওর দাঁত আমার চাই।' ক্যামেরার আড়াল থেকে উৎসাহের সঙ্গে জবাব দেয় মার্টিন, 'পালাতে দিলে তো! আমারও যে ছবিটা নেওয়া দরকার।' এই প্রথম চীনাম্যানটির জন্য আমার দুঃখ হলো।

দন্তবিজ্ঞানের বইটাতে দাঁত তোলবার ব্যাপারে কিছু বলেনি। তবে প্রত্যেকটা দাঁতের আঁকা ছবি আছে শির-টির সমেত মার্জিত তাদের অবস্থান দেখিয়ে। এবার শুধু সাঁড়াশিগুলোর ব্যাপার। আমার বাক্সে সাঁড়াশি আছে সাতটি। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে কোন্‌টি আমি ব্যবহার করব তাই নিয়ে। কোনো ভুলচুক করতে আমি রাজি নই। যন্ত্রপাতিগুলো সাজাবার সময় খুটুং খাটুং শব্দ হচ্ছে, আর বেচারা রুগী সে শব্দ শুনেই ঝিমিয়ে পড়েছে, হয়ে উঠেছে হলদেটে সবুজ। জানালো, রোদে কষ্ট হচ্ছে তার, কিন্তু এই রোদটাই যে ফটো তোলবার জন্য দরকার আমাদের, তা এ তো তাকে সইতেই হবে। সাঁড়াশি চেপে ধরলাম আমি। সে কাঁপতে কাঁপতে এলিয়ে পড়তে থাকে।

'প্রস্তুত ?' মার্টিনকে হাঁক দিলাম আমি।

'প্রস্তুত।' মার্টিন সায় দেয়।

সাঁড়াশি দিয়ে মারলাম জোরে এক টান। হে ভগবান, দাঁতটা যে গোড়া থেকেই আলগা! বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে আমি দাঁত সমেত সাঁড়াশিটা উঁচু করে ধরি। মার্টিন কঁকিয়ে ওঠে—'আ-হা। করলেন কি, ফের বসিয়ে দিন! দাঁতটা আবার মাড়িতে বসান। এত তাড়াতাড়িতে ছবি তোলা যায় ?'

বেচারা বুড়ো চীনাম্যানকে বসেই থাকতে হল যতোক্ষণে দাঁতটা আবার মাড়িতে বসিয়ে ফের সাঁড়াশি ঢুকিয়ে টেনে বের করা হল। ক্যামেরা টিপল মার্টিন। যাক, কাজটা শেষ হল। উল্লাস ? গর্ব ? কোনো শিকারী তার প্রথম শিঙ্‌ওয়ালা হরিণ শিকার করেও বোধহয় এত গর্ব বোধ করেনি যতোটা গর্ব আমার হল এই তিন শিঙ্‌ওয়ালা দাঁতটা তুলে।

আমার দাঁত তোলার দ্বিতীয় শিকার হল একজন তাহিতীয় নাবিক। ছোট্টখাট্টো মানুষটি, অনেকদিন ধরে দফায়-দফায় দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে ভীষণ। প্রথমেই তার মাড়িতে ছুরি চালালাম। কীভাবে ছুরি চালাতে হয় সে-জ্ঞান আমার নেই, কিন্তু চালিয়ে দিলাম ছুরি। অনেকক্ষণ ধরে জোর খাটিয়ে দাঁতে টান লাগাতে হল। লোকটা বাহাদুর বটে। গোঙালো, কাতরালো, সবই করল, একবার ভাবলাম বুঝি মূর্ছাই যাবে লোকটা। কিন্তু সে সমানেই মুখ হাঁ করে রেখে আমাকে দাঁত টানতে দিয়েছে। অবশেষে বেরিয়েও এল দাঁতটা।

এরপর থেকে আমার ভয় ভেঙে যায়। যে আসছে তারই দাঁত তুলে দিচ্ছি।··· এই তো সেদিন এক মিশনারী মহিলার দাঁত তোলবার জন্য আমি তিনদিনের পথ ধেয়ে গেছি। আশা করছি, স্নার্কের সমুদ্রযাত্রা শেষ হবার আগে নতুন দাঁত বসানো, সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো, সবই আমার আয়ত্ত হয়ে যাবে।

তাহিতিতে আমাদের জাহাজে এক ফরাসী নাবিককে আশ্রয় দিতে হয়েছিল। জাহাজ যখন সমুদ্রে, তখন দেখা গেল লোকটি জঘন্য চর্মরোগে ভুগছে। 'স্নার্ক' ছোট জাহাজ, এখানে সবাইকে এক পরিবারের মতো থাকতে হয়, তাই এমন লোককে জাহাজে রাখা মুশকিল। কিন্তু পরবর্তী কোনো বন্দরে পৌঁছে তাকে নামিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাকেই তার ডাক্তারী করতে হলো। জাহাজের যত ডাক্তারী বই পড়ে শুরু করলাম চিকিৎসা। যতোবারই তার শুশ্রূষা করি, বীজাণুরোধক লোশনে আগাগোড়া ধুয়ে ফেলি নিজেকে।

টুটুইলা বন্দরে পৌঁছে তাকে বিদায় করে রেহাই পাওয়া তো দূরের কথা, বন্দরের ডাক্তার তাকে ডাঙাতেই নামতে দিল না। শেষ পর্যন্ত সামোয়ার আপিয়া বন্দরে নিউজীলাণ্ডগামী একটা জাহাজে তাকে তুলে দিতে সক্ষম হলাম। আপিয়াতেই আমার পায়ের গাঁটে বিশ্রীভাবে মশা কামড়ালো। আগে যেমন হাজারোবার করেছি, তেমনি-ভাবে চুলকে দিয়েছি জায়গাটা, তাও স্বীকার করি। কিন্তু সাভাঈ দ্বীপে পৌঁছনোর আগেই দেখা গেল পায়ের গাঁটের ভেতরদিকে ছোট্ট একটি ঘা হয়েছে। প্রথমে ভেবে-ছিলাম ও ঘা ঘষাঘষি খেয়ে, আর সম্ভবত দ্বীপের গরম লাভামাটিতে হেঁটে বেড়াবার ফলে অ্যাসিডে খেয়ে গিয়ে হয়েছে—মলম লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে। এই ছিল আমার ধারণা। মলমে সেরে গেল ঠিকই, কিন্তু জায়গাটা অদ্ভুতভাবে ফুলে উঠল। পরে নতুন চামড়া উঠে গিয়ে বেরিয়ে এল আরো বড় একটা ক্ষত। মলম প্রয়োগে বারবার সেই একই জিনিস হচ্ছে। নতুন খোসা উঠে গিয়ে প্রত্যেকবারই ঘা আরো বড় আকার ধারণ করছে। আমি ধাঁধার মধ্যে পড়ি, ভয়ও পেয়ে যাই। সারা জীবনে বরাবরই আমার চামড়ার একটা গুণ যে তাতে ঘা হতে দেখিনি। কিন্তু এ ঘা তো শুকোচ্ছেই না, বরং আরো বেশি জায়গা জুড়ে বেড়েই যাচ্ছে—আগে চামড়াটি খেয়ে এখন মাংস-পেশীতেও দাঁত বসিয়েছে।

এ সময় স্নার্ক চলছিল ফিজির পথে। সেই ফরাসী নাবিকটির কথা মনে পড়াতে এই প্রথম বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। আরও চারটে ঘা (বা আল্সার যাই বলুন) বেরিয়েছে। যন্ত্রণায় সারারাত্তির ঘুমোতে পারি না। স্নার্ককে ফিজিতে রেখে প্রথম যে স্টীমার পাব তাতেই চেপে অস্ট্রেলিয়া চলে যাব এই মতলব করে রাখা হল। সেখানে কোনো পেশাদার ডাক্তার দেখাব। তার আগে নিজের শখের চিকিৎসাতেই যতটুকু সাধ্য, করলাম। জাহাজের সমস্ত ডাক্তারী বই আগাগোড়া পড়লাম, কিন্তু আমার ব্যাধিটার বর্ণনা করে একটি শব্দ বা একটি লাইনও খুঁজে পেলাম না। সাধারণ বাস্তব জ্ঞান খাটিয়েই সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে বসলাম আমি। অতি সক্রিয় বিষাক্ত ঘা

আমাকে আক্রমণ করেছে। জৈব এবং ক্ষয়কারী কোনো বিষ কুরে-কুরে খাবে আমার শরীর। সিদ্ধান্ত করলাম দু'টি কাজ করতেই হবে আমাকে। প্রথমত এমন কিছু খুঁজে বের করতে হবে যা বিষটাকে ধ্বংস করবে। দ্বিতীয়ত এই আল্‌সার শুধু বাইরে থেকেই সম্ভবত সেরে উঠবে না, ভেতর থেকেও সারিয়ে তুলতে হবে। 'করোসিভ সাবলিমেট' দিয়েই বিষটার সঙ্গে লড়ব ঠিক করলাম। এ যেন আগুন দিয়ে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা। ক্ষয়কারী বিষের বিরুদ্ধে ক্ষয়কারী বিষ। বেশ কয়েকদিন পর পালাক্রমে এল 'করোসিভ সাবলিমেট' আর 'হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড'—দুটো দিয়েই ড্রেসিং চালালাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, ফিজি পৌছবার আগেই পাঁচটির মধ্যে চারটি ঘা সেরে গেল। বাকিটাও কমে গিয়ে একটা মটর দানার মতো হয়েছে।

যাক, এবারে বুঝি 'ইয়' জাতীয় কুৎসিত চর্মরোগ সারাবারও ক্ষমতা আমি রাখি। এই ঘাগুলোর ওপর আমার একধরনের সম্ভ্রমবোধও জাগে। কিন্তু 'স্নার্কে'র বাকি আরোহীরা অন্য রকম চিন্তা করে। ওদের ব্যাপার হল, চোখে দেখেও ওদের বিশ্বাস হয় না। আমার কঠিন যন্ত্রণা ওরা দেখেছে প্রত্যেকেই, কিন্তু আমার পরিষ্কার ধারণা ওদের মনের গোপনে নিজেদের শরীরের চমৎকারিত্ব সম্পর্কে দারুণ নিশ্চয়তাবোধ রয়েছে। আমার মতো নিকৃষ্ট রক্তশূন্য শরীরে যে বিশ্রী বিষ স্থান নিতে পারে, ওদের দেবদুর্লভ শরীরে তা ঢুকতেই পারে না।

নিউ হেব্রাইডিসের 'পোর্ট রেজল্যুশন'-এ মার্টিন খালি পায়ে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকেছিল। জাহাজে ফিরে এল শরীরের নানান জায়গায় কাটা-ছড়া নিয়ে। 'সাবধানে থেকো হে।' আমি বলি ওকে, 'করোসিভ সাবলিমেট তৈরি করে দিচ্ছি। এ দিয়ে কাটা-ছেঁড়াগুলো ধুয়ে ফেল। না হলেও প্রতিষেধক তো বটেই।'

মার্টিন কিন্তু একটা হামবড়া গোছের হাসি হাসলো। যদিও সে খোলসা করে কিছু বলেনি—তবু আমাকে বোঝাতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি যে সে অন্য লোকদের মতো নয় (অন্য লোক? আপাত-দৃষ্টিতে আমি ছাড়া সেই 'লোক' আর কে হতে পারে?) এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ওর এই কাঁটা-ছেঁড়াগুলো লুকিয়ে যাবে। এক তাত্ত্বিক ভাষণে সে জানালো তার রক্ত বিশেষ রকম শুদ্ধ, আর তার সেরে ওঠার ক্ষমতাও অসাধারণ। ওর কথায় নিজেকে বড়ই ক্ষুদ্র বলে মনে হতে লাগল আমার। সত্যিই তো, রক্তের বিশুদ্ধতায় আমি হয়তো অন্যান্য সকলের থেকে আলাদাই।

কেবিন-বয় নাকাতা কাপড় ইস্ত্রি করতে গিয়ে পায়ের ডিমে ছ্যাঁকা লাগিয়ে ফেলল। তিন ইঞ্চি লম্বা, আট ইঞ্চি চওড়া ফোস্কা। সেও একটা সগর্ব হাসি হাসলো যখন আমার কঠিন অভিজ্ঞতার কথা বলে ওকে আমি করোসিভ সাবলিমেট লাগাতে বললাম।

ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করে সে জবাব দিলে, আমার রক্তের ব্যাপারে যাই হয়ে থাক, তার এক নম্বরী জাপানী খাঁটি রক্তের কাছে বীজাণুদের নতনকুর্দন পাত্তা পাবে না।

রাঁধুনি ওয়াডা একবার লঞ্চ থেকে ডাঙায় পড়ে গিয়েছিল। ঝিনুকের খোলে আর প্রবালে তার পা দুটো চমৎকারভাবে কেটে জখম হয়েছিল। যথারীতি আমি করোসিভ সাবলিমেটের বোতল হাজির করলাম। আবার সেই হামবড়া হাসিই ছিল আমার কপালে, এও জানতে পারলাম যে ওর শরীরে সেই জাপানী রক্ত বইছে যা রাশিয়াকে জব্দ করেছিল, কোনো আগামী দিনে আমেরিকাকেও পর্যুদস্ত করবে। এই সামান্য কাটা-ছড়া যদি তার রক্তের গুণে না সারে, তাহলে স্রেফ লজ্জায় সে 'হারা-কিরি' করবে।

এই সমস্ত ব্যাপার থেকে আমার সিদ্ধান্ত হল—একজন শখের চিকিৎসক নিজের রোগ নিরাময় করলেও নিজের জাহাজে তার কোনো ইজ্জত নেই। জাহাজের মাল্লারা পর্যন্ত তাচ্ছিল্য করে ঘা এবং প্রতিষেধকের ব্যাপারে আমাকে 'ছিটগ্রস্ত আধপাগলা' গোছের লোক মনে করছে। আমার নিজের রক্তের বিশুদ্ধতা নেই বলে অন্য লোকেরও রক্ত শুদ্ধ নয় মনে করার কোনো কারণ আমার নেই—সত্যি কথা! তাই আর কোনো ব্যাপারে এগোই না। সময় এবং জীবাণুরা তো মরে যায়নি, এখন শুধু আমার অপেক্ষায় থাকা—দেখাই যাক্।

'বুঝলেন, মনে হয় কাটা-ছেড়াগুলোতে কিছু ময়লা জমেছে।' বেশ কয়েকদিন পর একদিন যেন কথায়-কথায় মার্টিন জানালো। ওর টোপ আমি গিললাম না বলে সে আরেকটু জুড়লে, 'একটু পরিষ্কার করে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে, ব্যস্।'

দু'দিন পার হয়ে গেল তবু তার ঘা শুকোয়নি। একদিন আমি মার্টিনকে ধরে ফেললাম হাতেনাতে। এক বালতি গরম জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে সে।

'গরম জলের মতো ওষুধ আর নেই।' প্রবল উৎসাহে ঘোষণা করলে সে, 'ডাক্তারদের হাজারো দাওয়াই গরম জলের কাছে কিছু নয়। দেখুন না—কাল সকালেই ঘাগুলো ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু সকালবেলায় তার চোখ দেখে বুঝলাম যে সে বিপদে পড়েছে। এবার আমার জয়ের পালা এগিয়ে আসছে।

বিকেলের দিকে সে বলল, 'ওই ওষুধটা একটু পরখ করতেই বা দোষ কি? জানি, ওতে এমন কিছু উপকার হবে না। তবু একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক।'

তারপর ওষুধ চাইতে এল জাপানের সেই গর্বিত রক্তের মালিকটি। তার ঘা এখন বেশ দর্শনীয় ভাবে উজ্জ্বল। শোধ তোলার উৎসাহে ওষুধ কী ভাবে লাগাবে তা বিশদ

ভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করে দিলাম ওদের কাছে। নাকাতা নির্দেশগুলো মেনেছে অক্ষরে-অক্ষরেই। ফলে দিনে-দিনে তার ঘা ছোট হয়ে এল। ওয়াডা নির্দেশ মানলো উদাসীনভাবে, তাই তার ঘাও সারলো দেরিতে। কিন্তু মার্টিনের মনে এখনো সন্দেহ যেহেতু তার ঘা সঙ্গে সঙ্গে সারেনি, তাই এ ব্যাপারে সে একটা তত্ত্বও আবিষ্কার করে ফেলল—ডাক্তারের দাওয়াই ভালই, কিন্তু একই ওষুধ সকলের সমান উপকার করে না। তার নিজের বেলায় করোসিভ সাবলিমেটে কাজই হচ্ছে না। তাছাড়া, আমি কী করে জানলাম যে এটাই ঠিক ওষুধ? আমার তো অভিজ্ঞতা নেই। যেহেতু একই ওষুধ লাগাবার সময় আমার ঘা সেরেছে, তা থেকে প্রমাণ হয় না যে এই ওষুধটাই ঘা সারাবার মূলে। এমনও হতে পারে যে ব্যাপারটাই কাকতালীয়। নিঃসন্দেহে ঘা সারাবার ভাল ওষুধ নিশ্চয়ই আছে। পরে যখন একজন খাঁটি ডাক্তারের দেখা পাবে তখন সেই ভালো ওষুধ সে যোগাড় করে লাগাবে।

এই সময়ের কাছাকাছিই আমরা এসেছিলাম সলোমন দ্বীপপুঞ্জে। এখানে অবশ্য বেশি সময় দেওয়া হয়নি। কিন্তু তার মধ্যেই বাস্তব জীবনে এই প্রথম আমি অনুভব করেছি—মানুষের স্নায়ুতন্ত্রগুলো কতো দুর্বল আর অস্থির। সান্টা অ্যানা'র পোর্ট মেরীতে আমরা প্রথম নোঙর ফেলি। এখানে টম বাটলার একমাত্র সাদা মানুষ, ব্যবসাদার। সেই-ই এল আমাদের সঙ্গে পরিচয় করতে। একজন শক্তসমর্থ মানুষকে সলোমনের আবহাওয়া যে কী করে দিতে পারে, টম বাটলার হলো তারই জলজ্যান্ত নিদর্শন। অসহায় মুমূর্ষু মানুষের মত নিজের তিমি-নৌকোটিতে পড়ে থাকে। মুখে একটু হাসি বা বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য নেই। ম্রিয়মান কঙ্কাল-মুখে কাষ্ঠ হাসিও ফোটে না। টম বাটলারেরও অনেকগুলো বড়ো বড়ো 'ইয়' ঘা হয়েছে। ওকে জাহাজের রেলিঙের ওপর দিয়ে টেনে-হিঁচড়েই তুলে নিতে বাধ্য হলাম।

সে বলল, স্বাস্থ্য তার নাকি ভালই, অনেক দিন জ্বরজারি হয়নি। হাতের গণ্ড-গোল ছাড়া সে এমনিতে সুস্থই। দেখলাম, ওর হাতে পক্ষাঘাত। পাত্তাই দেয় না সে তার হাতের পক্ষাঘাতকে, আগেও কতোবার হয়েছে। সেরেও গেছে। এখানকার স্থানীয় লোকেদেরও এই অসুখ আকছার হয়ে থাকে। তারপর যা অবস্থা তার দেখলাম, আমাদের জাহাজে টম বাটলারের মতো বীভৎস আগন্তুক কখনো অতিথি হয়ে আসেনি। এর আগে আমাদের জাহাজে খুব কম কুষ্ঠ রোগী অথবা গোদে আক্রান্ত মানুষ তো ওঠেনি!

টম বাটলারের কাছে মার্টিন জানতে চায় 'ইয়' ঘা সম্পর্কে। সে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। তার হাতে-পায়ে অজস্র ঘায়ের চিহ্ন। 'আরে, এগুলো সব

সয়ে গেছে।' টম বাটলার জানায়। যতক্ষণ না ঘাগুলো মাংসের ভেতর অবধি ঢুকছে ততোক্ষণ তেমন সাংঘাতিক তো নয়। তবে ঘায়ের জীবাণুগুলো যখন রক্তবহা ধমনীর ওপর হামড়ে পড়ে তখন ধমনীগুলো ফাটতে শুরু করে আর শুরু হয়ে যায় মরণযাত্রা। দ্বীপের অনেক স্থানীয় মানুষ সম্প্রতি এ ভাবেই মারা গেছে। কিন্তু তাতে কার কী আসে যায়? যদি 'ইয়' না হয় তো নাই হল, অন্য কিছু তো হবেই—এর নাম হল সলোমন দ্বীপ!

লক্ষ্য করি এই সময়টা থেকেই মার্টিন তার নিজের ঘাগুলো নিয়ে আচমকা বড়ো বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মনোযোগ দিয়ে করোসিভ সাবলিমেট লাগাচ্ছে ঘন-ঘন। আর ক্রমেই যেন বেশি উৎসাহের সঙ্গে তার স্বদেশ ক্যানসাসের কথা বলতে শুরু করেছে। ক্যানসাসের নির্মল জলবায়ু, ক্যানসাস নিয়ে আরো নানা কথা। চার্মিয়ান আর আমি জানতাম আমাদের দেশ ক্যালিফোর্নিয়া মোটামুটি সব থেকে ভালো। হেনরী তার দেশ রাপা আর তেহেঈ নিজের বোরা-বোরা'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এদিকে ওয়াডা ও নাকাতা জাপানের অপূর্ব স্বাস্থ্য নিয়ে গৌরবগানে মত্ত।

এক সন্ধ্যায় উগীর দক্ষিণে একটা খাস জায়গায় নোঙর করবার সুযোগ খুঁজছে স্নার্ক। এমন সময় মিস্টার ড্রু নামে 'চার্চ অব্ ইংলণ্ডে'র একজন মিশনারী আমাদের জাহাজের পাশে তাঁর তিমিশিকারী নৌকো ভেড়ালেন। তাঁকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানানো হলো। খেতে বসে তাঁর সঙ্গে 'ইয়' নিয়েই আলোচনা শুরু করল মার্টিন। 'হ্যাঁ।' মিস্টার ড্রু বললেন, 'সলোমন দ্বীপপুঞ্জে এটা এক অতি সাধারণ ব্যাধি। সমস্ত সাদা মানুষেরই এ ব্যারাম হয়েছে।'

'আপনারও কি এই ঘা আছে?' মার্টিন প্রশ্ন করে। চার্চ অব ইংলণ্ডের মিশনারীর এ রকম কুৎসিত ঘা থাকতে পারে একথা ভাবতেই তার মনে ধাক্কা লাগে। মিঃ ড্রু ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে জানান, তাঁর এ ঘাটা তো আছেই, অনেকগুলোর আবার চিকিৎসাও চলছে এই মুহূর্তে।

চকিতে মার্টিন প্রশ্ন করে, 'ওতে কী ওষুধ লাগাচ্ছেন?' উত্তরের জন্য আমিও রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করি। এই জবাবটার ওপরেই আমার ডাক্তারী বিদ্যার সম্মান থাকবে, অথবা তা ধুলোয় লুটোবে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, মার্টিন ধরেই নিয়েছে এবার আমার পতন অনিবার্য। এবং সেই মুহূর্তে উত্তরটা এল। আঃ, স্বর্গীয় আশীর্বাদের মতো সেই জবাব!

'করোসিভ সাবলিমেট।' বললেন মিঃ ড্রু।

মার্টিন শোভনীয়ভাবেই মেনে নিল কথাটা, তা অস্বীকার করা যায় না। আমার

ধারণা সে সময় মার্টিনের একটা দাঁত তোলবার অনুমতি চাইলেও সে তাতে মোটেই আপত্তি করতো না।

সলোমনের সব শ্বেতকায় বাসিন্দাদেরই 'ইয়' ঘা হয়। কাটা-ছড়া হওয়া মানেই সে জায়গায় একখানা ঘা গজিয়ে ওঠা। যতো লোকের সঙ্গে মিলেছি দশজনের মধ্যে নজনের দেহেই রয়েছে এই ঘা—চালু তাজা ঘা। ব্যতিক্রম দেখলাম একটি। এক তরুণ, মাত্র পাঁচ মাস হলো দ্বীপপুঞ্জে এসেছে। এখানে পৌছবার দশদিনের মধ্যে সে জ্বরে আক্রান্ত হয়। সেই থেকে এত ঘন ঘন জ্বরে পড়ছে সে যে তার 'ইয়' ধরবার সময় আর সুযোগই হয়নি এখনো।

এক চার্মিয়ান ছাড়া স্নার্কের বাকি সকলেরই হয়েছে এই 'ইয়' ঘা। ক্যানসাস এবং জাপান যে খাঁটি রক্তের অহঙ্কার দেখিয়েছে, চার্মিয়ানের মনেও সেই একই দেমাক। রক্তের বিশুদ্ধতাই সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই দিচ্ছে তাকে—যতো দিন যায় ততোই তার এই বক্তব্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। ওর অব্যাহতির আসল কারণটা আমি আড়ালে নিজের কাছেই ব্যাখ্যা করি : মহিলা হিসেবে আমাদের মতো কঠোর দৈহিক পরিশ্রম, বা স্নার্ক নিয়ে পৃথিবী ঘোরার কাজে কাটা-জখমের সঙ্গে তেমন পরিচয় তার হতেই পারেনি।

কিন্তু এ কথা তো খোলাখুলি বলতে পারি না তাকে। কঠিন সত্যি কথা বলে তার অহঙ্কারে আঘাত দেবার বাসনা আমার নেই। একজন ডাক্তার হিসেবে (না হয় শখের ডাক্তারই হলাম) এ-অসুখ সম্পর্কে ওর থেকে আমার জ্ঞান বেশি, আর এও জানি যে সময় আমারই সপক্ষে। কিন্তু হায়! সময়কে বাড়বার সুযোগ দিলাম কই? যখনই দেখলাম তার হাঁটুর নিচে ছোট্ট একটি সুন্দর 'ইয়' উঁকি দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে এত দ্রুত অ্যান্টিসেপ্‌টিক প্রয়োগ করে বসলাম যে তার সত্যি ঘা হয়েছিল কিনা ভালো করে বুঝবার আগেই চার্মিয়ান সেরে গেল। দেখুন একবার নিজের জাহাজে আমার মতো ডাক্তারের ইজ্জত কী রইল! উলটে সে আমাকেই দোষ দিল আমি নাকি তাকে জোর করে বিশ্বাস করাতে চেয়েছি যে তার 'ইয়' হয়েছিল! নিজের রক্তের বিশুদ্ধতা নিয়ে সে আগের চেয়েও বেশি গর্বস্ফীত হয়ে উঠল। আর আমি নীরবে ঘাড় গুঁজলাম আমার নৌবিজ্ঞানের বইগুলোতে।

কিন্তু তারপর একদিন সময় আসে। তখন আমরা মালাইটার উপকূল ধরে চলেছি।

'এ কী! তোমার পায়ের গাঁটের ওপরে ওখানটায় কী হয়েছে?' আমি প্রশ্ন করি।

'কই, কিছু না তো।' চার্মিয়ান বলে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাই হয়ে থাক, এখুনি একটু করোসিভ সাবলিমেট লাগাও। দু'তিন সপ্তাহ পরে সেবে গেলেও চামড়ার ওপর যে দাগটি থাকবে, তাই নিয়ে একদিন কবরে যেতে হবে তোমাকে। তখন ভুলে যেও তোমার রক্তের বিশুদ্ধতা আর তোমার পূর্বপুরুষের ইতিহাস। তখন বোলো 'ইয়' হলে কেমন লাগে।'

চার্মিয়ানের 'ইয়'-টার আকার একটা রুপোর ডলারের মতো, সারতেও লাগল তিন সপ্তাহ পুরো। এমনও দিন গেছে ঘায়ের ব্যথায় চার্মিয়ান হাঁটতে পারেনি। একবার নয়, বারবার বলেছে, পায়ের গাঁটে 'ইয়' ঘা হবার মতো কষ্টকর আর কিছু নেই। ওখানে ঘা হবার অভিজ্ঞতা নেই আমার। তাই আমার নিজস্ব অনুমান, সবচেয়ে যন্ত্রণা হয় পায়ের পাতার ভেতরভাগে 'ইয়' ঘাঁটি করে বসলে। সেটাই ব্যাখ্যা করে তাকে বলি। অবশেষে মার্টিনকে ডাকা হল সাব্যস্ত করতে। সে আমাদের দুজনের বক্তব্যকেই নস্যাৎ করে আবেগভরে ঘোষণা করল—'ইয়' ঘা যখন হাঁটুর নিচে হয় (মার্টিনের যা হয়েছে), তখন বোঝা যায় সত্যিকার যন্ত্রণা কাকে বলে।

কিন্তু 'ইয়' বুঝি এক সময় গা-সহা হয়ে যায়। এই লেখা যখন লিখছি, আমার হাতে পাঁচটা এবং হাঁটুর নিচে তিনটে 'ইয়'। চার্মিয়ানের ডান পায়ের গাঁটের ভেতরের দুটি দিকেই একটি করে ঘা। তেহেঈ তার ঘা নিয়ে পাগলের মতো হয়ে গেছে। মার্টিনের হাঁটুর নিচের ঘায়ের ওপর আবার নতুন ঘা দেখা দিয়েছে। নাকাতার যে কতোগুলো হয়েছে বলা মুশকিল, মাংসতন্তু পর্যন্ত খেতে শুরু করেছে। কিন্তু শুধু স্নার্কের ভাগ্যেই যে এসব ঘটেছে এমন নয়। প্রথম অভিযাত্রীদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সলোমন দ্বীপে আসা প্রত্যেকটি জাহাজেরই এক ইতিহাস।

প্রথমে জ্বরের কবলে পড়ে নাকাতা। পেণ্ডুফ্রীনে থাকতেই ঘটে ব্যাপারটা। ওয়াডা আর হেনরী ওর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তারপর চার্মিয়ানের পালা। দুটি মাস কোনো-ক্রমে আমি জ্বরকে এড়িয়েছি, কিন্তু আমিও যখন কাত হলাম সমব্যথী হয়ে কদিন পরেই যোগ দিল মার্টিন। আমাদের সাতজনের মধ্যে তেহেঈ একাই শুধু বাদ ছিল, কিন্তু ওর ঘরমুখো জীবনের জন্য আক্ষেপ—সে যে জ্বরের চেয়েও খারাপ। নাকাতারও জ্বর হয়েছিল। কিন্তু নির্দেশ ঠিকমতো মেনে চলবার ফলে তৃতীয় বারের জ্বরের ধাক্কার পর ত্রিশ চল্লিশ গ্রেন কুইনিন খেয়ে সে মোটামুটি ভালই থাকে, যদিও যথেষ্ট দুর্বল।

ওয়াডা ও হেনরী কিন্তু হয়ে দাঁড়ালো বেয়াড়া রুগী। ওয়াডা গেল ভীষণ ঘাবড়ে। সে একেবারে ধরেই নিয়েছিল যে তার ভাগ্যতারা ডুবেছে, এই সলোমনেই তার হাড়

ক'খানি রেখে যেতে হবে। সে দেখেছে আশেপাশের জীবন কতো মূল্যহীন। পেগু-ক্রীনে সে আমাশা রোগের ধ্বংসলীলা দেখেছে। দুর্ভাগ্যের ফেরেই একটা দৃশ্য তার চোখে পড়েছিল।

আমাশায় মরা একটি লোককে স্রেফ একটা টিনের ওপর চাপিয়ে মাটির গর্তে ফেলে দেওরা হয়েছে—না কফিন, না শেষকৃত্যের ব্যবস্থা। প্রত্যেকেরই রোগ আর রোগ। জ্বর, আমাশা, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু। মৃত্যু তো ডালভাত। আজ যে আছে, কাল সে নেই। এবং ওয়াডা আজ সবকিছু ভুলে গিয়ে মনে ভেবে নিয়েছে আগামী কাল তো এসেই গেল।

ওয়াডা তাই ঘাগুলোর যত্ন তো করেই না, বেধড়ক চুলকে সারা শরীরেই ছড়িয়ে দেয়। জ্বরের ব্যাপারেও সে বিধিনিষেধ মানে না। ফলে একদিনের জায়গায় পাঁচদিন বিছানায় পড়ে থাকে। হেনরী অমন দৈত্যের মতো চেহারা নিয়ে একই কাণ্ড করে যাচ্ছে—কুইনিন গিলতে একেবারে গররাজি। কারণটা নাকি কয়েক বছর আগে সে জ্বরে পড়ে ডাক্তারের দেওয়া যে বড়িগুলো খেয়েছিল সেগুলো আমার বড়ি থেকে রঙে আর আকারে একেবারেই আলাদা। তাই হেনরীও ওয়াডার দলে জুটেছে।

কিন্তু ওদের দুজনকেই বোকা বানালাম আমি। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ওদের মৃত্যু আসন্ন। তাই প্রয়োগ করলাম ওদেরই নিজস্ব ওষুধ—ঠিক আছে ওদের 'বিশ্বাসে'ই ওদের ব্যারাম সারবে। একগাদা কুইনিন ওদের গলায় ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর দেখলাম ওদের জ্বরের তাপ। এই প্রথম আমার ওষুধের বাক্সের থার্মোমিটার ব্যবহার করেছি। কিন্তু অচিরেই আবিষ্কার করলাম ওটি একটি বাজে মাল, মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা করার জন্য বানানো। এখন যদি হেনরী আর ওয়াডাকে বলি থার্মোমিটারটায় কাজ হয় না, তাহলে তো পর পর দুটো শবযাত্রার ব্যবস্থা করতে হবে! আমার পরিষ্কার আন্দাজ দুজনেরই জ্বর ১০৫ ডিগ্রি। কিন্তু মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটিয়ে তুললাম এমন ভাব যেন কতো স্বস্তি পেয়েছি আমি। খুশি-খুশি গলায় জানালাম, ওদের জ্বর এখন মাত্র ৯৪ ডিগ্রি। তারপর আরো কিছু কুইনিন খাইয়ে দিলাম দুজনকেই। বললাম, যদি পরে কোনো অসুস্থতা বা দুর্বলতা বোধ করে, সেটা নেহাতই কুইনিনের জন্য। এখন তো ভালো হয়ে উঠুক। আর সত্যিই সেরে উঠল দু'জন, ওয়াডা সেটা হয়তো না চাইলেও। কেউ যদি একটা ভুল ধারণার বশে মরতে যায়, তাহলে তাকে ভুল ধারণা দিয়ে বাঁচানোটাই বা অন্যায় হবে কেন?

মনের সাহস আর বাঁচার ইচ্ছে কিন্তু সাদা চামড়াদেরই বেশি, তা মানতে হবে। জাপানী ও তাহিতিবাসীদের পিঠ চাপড়ে, উৎসাহ দিয়ে,

রীতিমতো শক্তি প্রয়োগ করে তাদের ভয় কাটিয়ে তবে জীবনের পথে আনতে হয়েছে। এদিকে চার্মিয়ান ও মার্টিন তাদের সব যন্ত্রণা হাসিমুখেই মেনে নিয়েছে, তেমন মাথাই ঘামায়নি। ওয়াডা আর হেনরী যখন ধরেই নিয়েছিল যে তারা নির্ঘাত মরতে চলেছে, তখন জাহাজের মৃত্যু-পরিবেশ সহ্য করতে পারেনি তেহেট। করুণভাবে প্রার্থনা জানিয়েছে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেঁদে চলেছে সে। এদিকে মার্টিন শাপমন্যি করতে করতেই সুস্থ হয়ে উঠল। চার্মিয়ানও যন্ত্রণায় কাতরায় কিন্তু সেরে উঠে কী করবে সে-পরিকল্পনাও করতে ভোলে না।

নিরামিষ আহার আর পরিচ্ছন্ন জীবনের মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই বড় হয়েছে চার্মিয়ান। ওর পিসি নেটা (মিসেস্ নিনেটা ঈম্স্-পেইন) ওকে মানুষ করেছেন এবং বরাবরই থেকেছেন স্বাস্থ্যকর জায়গায়। রোগ সারাতে বাজারের ওষুধের ওপর বিশ্বাস করতেন না তিনি। চার্মিয়ানও ওসব ওষুধে বিশ্বাসী নয়। তাছাড়া ওষুধপত্র ওর শরীরে সহ্যও হয় না। অসুখ-বিসুখ সারাবার বদলে ওসব শরীরের ক্ষতিই করে বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কুইনিন খেতে আপত্তি করেনি, মন্দের ভাল হিসেবে মেনে নিয়েছে। তার ফলে কষ্ট পেয়েছে কম, বারে বারে তাকে জ্বর আক্রমণও করেনি।

গোড়াতে মিশনারী মিঃ কলফিল্ডেরও অগাধ বিশ্বাস ছিল হোমিওপ্যাথির ওপর। দ্বিতীয়বার জ্বরে আক্রান্ত হবার পরই তিনি অ্যালোপ্যাথি ও কুইনিনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জ্বর আসে, ওষুধ খান, সেরে ওঠেন। আবার ধর্মের কাজও চালিয়ে যান। কিন্তু বেচারি ওয়াডা। বোঝার ওপর শাকের আঁটি হল যখন আমরা ওকে সেই মানুষ-খেকো মালাইটা দ্বীপে ঘুরতে নিয়ে গেলাম। এমন একটা ছোট জাহাজে চড়িয়ে ওকে ঘোরালাম যার ক্যাপ্টেন ছ' মাস আগেই খুন হয়েছে। সেখানে ওয়াডার মনে হয়েছিল বুনো মানুষখেকোরা ওকে 'কাই-কাই' করবে। মালাইটার নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা ও হজম করতে পারেনি। ইসাবেল দ্বীপে পৌঁছুতেই সে একদিন প্রচণ্ড ঝড়-জলের মধ্যে ডাঙায় নেমে চিরকালের মতো চলে যায়। দু'বার জ্বরের মাঝে তখন তার নিমোনিয়া হবার মতো। ডাঙায় যদি আরো দুরন্ত 'কাই কাই' আর ফোঁড়া জ্বর থেকে কোনোক্রমে বাঁচেও, তবু তার অন্তত ৬/৭ সপ্তাহ লাগবে কাছাকাছি কোনো দ্বীপে গিয়ে উঠতে। আমার ওষুধ সম্পর্কে তার খুব একটা আস্থা কোনো-কালেও ছিল না। তবুও প্রথম সুযোগেই তার দাঁত ব্যথা সারিয়ে দিয়েছিলাম দুটো দাঁত তুলে।

কয়েক মাস ধরে স্নার্ক একটা 'হাসপাতাল' হয়ে রইল। বলতে দ্বিধা নেই, এই পরিবেশে আমরা অভ্যস্তই হয়ে গিয়েছি। স্নার্কের ধোয়ামোছার কাজ চলছিল মেরিঞ্জ

লেণ্ডনে। আমাদের মধ্যে মাত্র একজনই চলাফেরা করতে সক্ষম ছিল। আমাদের তিন শ্বেতকায় কর্মীই জ্বরে শয্যাশায়ী।

এই লেখা আমি লিখছি যখন স্নার্ক ইসাবেল দ্বীপের উত্তর-পূর্বে কোথাও পথ হারিয়ে সমুদ্রে ঘুরছে, আর আমরা বৃথাই খুঁজছি 'লর্ড হাউ' দ্বীপটাকে। 'লর্ড হাউ' হ্রদে ঘেরা বলয়াকার একটা প্রবাল দ্বীপ, যাকে বলে 'অ্যাটল'।

একেবারে হ্রদে না গেলে এই ধরনের প্রবালদ্বীপ ঠাহর করা মুশকিল। এদিকে আমাদের ক্রোনোমিটারটি খারাপ হয়ে গেছে। দিনের বেলা সূর্যের দেখা নেই, রাতেও তারা দেখে ঠিক দিক করার উপায় নেই। দিনের পর দিন শুধু ঝড় আর বাদল।

রাঁধুনি চলে গেছে আগেই। নাকাতা রাঁধুনি আর কেবিনবয়ের কাজ একাই চালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেও জ্বরে শয্যাশায়ী। মার্টিন সবে জ্বর থেকে উঠেছিল কিন্তু আবার পড়েছে বিছানায়। চার্মিয়ানের হয়েছে পালা-জ্বর, সে এখন ডাইরি খুলে দেখতে বসেছে পরবর্তী কোন্ তারিখে আবার জ্বর আসবে। হেনরী মনে প্রত্যাশা নিয়ে কুইনিন খেতে শুরু করেছে। আমার জ্বর আসে আচমকা মুগুর-পেটার মতো, কখন আমাকে পেড়ে ফেলবে বলতে পারি না।

আমাদের ভাণ্ডারে এখন ময়দার বড় অভাব। ভুল করে আমাদের শেষ ময়দাটুকু কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ময়দার অভাবে তারা মুশকিলে পড়েছিল: জানি না আবার কবে ডাঙা দেখব। আমাদের সলোমন ঘাগুলো আগের চেয়েও সংখ্যায় বেড়েছে, আগের চাইতেও খারাপ। ভুলক্রমে করোসিভ সাবলিমেট ফেলে আসা হয়েছে পেণ্ডুফ্রীনে। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডও নিঃশেষিত। এখন পরীক্ষা চালাচ্ছি বোরিক অ্যাসিড, লাইসল, আর অ্যান্টিফ্লোজিস্টিন দিয়ে। মোটের ওপর, নামী ডাক্তার যদি নাও হই, কেউ বলবে না প্র্যাকটিসের অভাবে তা হতে পারিনি।

পুনশ্চ: আমার আগেকার লেখার পর আরো দু' হপ্তা কেটে গেছে। জাহাজে একমাত্র সুস্থ লোক ছিল তেহেই, তা সেও এখন ভীষণ জ্বরে শয্যাশায়ী। এমন জ্বর আমাদের কারুরই হয়নি। ওর জ্বর ক্রমাগত ১০৪ ডিগ্রিই যাচ্ছে, নাড়ির গতি ১১৫।

এখনো সমুদ্রেই আছি। জায়গাটা টাস্‌মান প্রবাল দ্বীপ আর ম্যানিং প্রণালীর মাঝামাঝি।

তেহেইর জ্বর 'ব্ল্যাক ওয়াটার' জ্বরে মোড় নিয়েছে—ম্যালেরিয়া জ্বরের সবচেয়ে

উগ্র রূপ। আমার ডাক্তারী বইগুলো বলছে—এ জ্বরের কারণ কোনো বাইরের বীজাণুর সংক্রমণও বটে। ওর জ্বরের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে এখন আমিই যেন খেই হারাচ্ছি, কারণ তেহেঈর বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে। আমি তো এমনিতেই কাঁচা, তারপর এখন পাগলের চিকিৎসাও করতে হচ্ছে। আমার সংক্ষিপ্ত যাত্রাপথে এই হল দ্বিতীয় পাগলামির ঘটনা।

পুনশ্চ: কোনোদিন আমি হয়তো একটা বই লিখব যার নাম হবে 'হাসপাতাল-জাহাজ স্নার্কে পৃথিবী পরিক্রমা'। আমাদের পোষা জন্তুগুলো পর্যন্ত রেহাই পায়নি। মেরিঙ্গ লেগুন থেকে আমরা সঙ্গে এনেছিলাম দুটি প্রাণী—একটি আইরিশ টেরিয়ার কুকুর আর একটি সাদা কাকাতুয়া। কুকুরটি দুবার পড়ে গিয়ে প্রথমে সামনের একটা, পরে পেছনের একটা পা ভেঙে বসে রইল। এখন চলাফেরার জন্য ওটার সম্বল মাত্র দুটি পা। কাকাতুয়াটি কেবিনের ওপর ঘুলঘুলিতে ধাক্কা খেয়ে এমন আহত হল যে তাকে মেরে যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হল। কয়েকটা মুরগি অবশিষ্ট ছিল জাহাজে। অসুখ থেকে উঠলে মুরগির ঝোল ভাল পথ্যই হতে পারত, কিন্তু ওগুলোও একদিন কী ভাবে উড়ে গিয়ে পড়ল জলে। ডুবেই মরল তারা। একমাত্র আরশোলারা বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। ওদের অসুখ-বিসুখও হয় না, দুর্ঘটনা ঘটে না ওদের, দিনের পর দিন কেবল আকারে বাড়ে, আর মাংসাশী হয়ে ওঠে। রাতে আমাদের ঘুমের মধ্যে শুধু পা আর হাতের নখ ঠোকরায়।

পুনশ্চ: চার্মিয়ানের আবার জ্বর এসেছে। হতাশাগ্রস্ত মার্টিন শেষ পর্যন্ত 'ইয়'-গুলোতে তুঁতে লাগিয়ে 'ঘোড়া-ডাক্তারী' করছে। সঙ্গে সঙ্গে সলোমন দ্বীপপুঞ্জকে জানাচ্ছে অভিশাপ। আর আমার কথা? জাহাজ চালাচ্ছি, ডাক্তারী করছি এবং গল্প লিখছি। এর পরেও কিন্তু মোটেই ভাল নেই। একেবারে উন্মাদদের কথা বাদ দিলে জাহাজে আমার অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। পরবর্তী কোনো স্টীমার ধরে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছেই আমাকে অপারেশন টেবিলে শুতে হবে। আমার ছোটখাটো কষ্টগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেক নতুন রহস্যময় অসুখ। গত হপ্তা থেকে আমার দুটো হাতই শোথ রোগের মতো ফুলে গেছে। খুব কষ্ট করে হাতের মুঠো বন্ধ করতে হয়। দড়ি ধরে টানতে গেলে তো যন্ত্রণায় মরে যাই। ভয়ানক তুষারক্ষতের সঙ্গে যেমন ধারার অনুভূতি হয়, তেমনি। তা ছাড়া, হাতের চামড়া এমনভাবে খসে পড়ছে যে ভয় হয়। তার জায়গায় গজানো নতুন চামড়া শক্ত ও পুরু হয়ে দেখা দিচ্ছে। ডাক্তারী বইগুলো এই রোগের কোনো হদিশ দিতে পারে না। কেউ জানে না এটা কী ব্যারাম।

পুনশ্চ : যা হোক, শেষ পর্যন্ত ক্রোনোমিটার তো সারিয়েছি। ক্রমাগত আট দিন রাতের টানা ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চুঁড়ে বেরিয়ে অবশেষে এক দুপুরে মেঘের ফাঁকে সূর্যের আংশিক দেখা পাওয়া গেল। এবারে আমাদের অক্ষাংশের অবস্থিতি হিসেব কষে বের করি। তারপর জাহাজের গতিবেগ অনুসরণ করে 'লর্ড হাউ' দ্বীপের অক্ষাংশের সন্ধান পেলাম। দ্বীপের দ্রাঘিমা থেকে আমাদের ক্রোনোমিটারে তিন মিনিটের পার্থক্য দেখা গেল। প্রতি মিনিটে পনের মাইলের পার্থক্য হলে ভুলের বহরটা বুঝুন। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে যাত্রা করার সময় যন্ত্রটিতে এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের সাত ভাগ ভুল ছিল। ওটাই বাড়তে বাড়তে এখন তিন মিনিটে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই ভুল হবে কেন? ক্রোনোমিটার যাঁরা তৈরি করেন, যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁরা বলবেন এমনটা হতেই পারে না। কিন্তু হওয়া অসম্ভবও নয়। সলোমনের আবহাওয়াই এর জন্য দায়ী বলে আমার ধারণা।

যাই হোক, পাগলদের পাগলামি আর মার্টিনের 'ইয়' সারাতে ব্যর্থ হলেও ক্রোনোমিটারটা তো ঠিকমতো সারাতে পেরেছি আমি!

পুনশ্চ : 'ইয়'তে মার্টিন এবার লাগাচ্ছে পোড়া ফিটকিরি। আর সেই সঙ্গে শাপান্ত করছে সলোমন দ্বীপের। আগের চেয়েও আবেগ দিয়ে।

ম্যানিং প্রণালী আর পাভুভু দ্বীপের মধ্যবর্তী জায়গায়।...

হেনরীর পিঠে বাত হয়েছে। আমার হাতের দশ পরতা চামড়া খসে গিয়ে এখন এগারো পরতা খসছে। তেহেঈর পাগলামি আরো বেড়েছে। দিনরাত সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে তিনি যেন ওকে না মারেন। নাকাতা আর আমি আবার জ্বরের সঙ্গে লড়ছি। তারপর সর্বশেষ খবরে, গত সন্ধ্যায় পচা খাবারের বিষক্রিয়ায় নাকাতা অসুস্থ হয়ে পড়ে। অর্ধেক রাত আমাদের কেটেছে ওকে সুস্থ করে তুলতে।